প্রতিপদ

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য



অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

প্রতিপদ

প্রতিপদ

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য
অনুবাদ
ক্ষিতীশ রায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

Original title : PRATIPAD *(Assamese)*
Bengali translation : PRATIPAD

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিউটি প্রিণ্ট, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি-110055 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

বর্তমানকালের অসমীয়া সাহিত্যে বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (জন্ম 1927) একটি বিশিষ্ট নাম। কেবল কবি বা প্রবন্ধকার রূপে নয়, অসমীয়া কথাসাহিত্যের প্রগতিতেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁর সাহিত্য কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁর উপন্যাস রচনার সূচনা হয় পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে। 1955 সালে প্রকাশিত হয় 'রাজপথে রিঙ্গিয়ায়' (রাজপথ ডাকছে)। প্রথম থেকেই তাঁর উপন্যাসে একটা রাজনৈতিক প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে সোস্যালিষ্ট পার্টির সদস্য এবং রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতাদের অনুগামী, তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। একটা দিনের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে স্বাধীন ভারতের সদ্যোজাত কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অসন্তোষ প্রকট করেছেন। একবছর বাদে 1956 সালে, প্রকাশিত তাঁর 'শতঘ্নী' নামক উপন্যাসে তিনি সংগ্রামী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে। কাহিনী রচিত হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো মারফত খণ্ডাংশ প্রচারের জন্য। সম্ভবত সেই কারণে গল্পাংশ অবিচ্ছেদ ধারায় প্রবাহিত হতে পারেনি, কোথাও কোথাও গতি যেন মন্থর হয়ে পড়েছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর ফিজোর নেতৃত্বে নাগা পাহাড়ের (এখন নাগাল্যাণ্ড) কতিপয় নাগা বাক্যে ও কর্মে ভারত সরকারের বিরুদ্ধতা করতে প্রবৃত্ত হয়। সেই বৈরী নাগাদের দ্বারা অধ্যুষিত নাগাপাহাড় হ'ল বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' (জনগণের রাষ্ট্র) উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। এই উপন্যাসের জন্য লেখক সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার লাভ করেন। কাহিনী ও সেই সঙ্গে চরিত্রের ক্রমবিকাশের দিক থেকে উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ। 1960 সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে লেখকের রচনাশৈলী বহুলাংশে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। গল্পাংশের গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এগিয়ে গেছে ঘটনা ও চরিত্রের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে। অমসৃণ ও খটখটে ভাষার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি পাহাড়ী রুক্ষতার আভাস দিয়েছেন। কিছুকালের জন্য লেখক স্কুলমাস্টার হয়ে বসবাস করেছিলেন মণিপুর রাজ্যের উখরুল অঞ্চলের তাংখুল নাগাদের মধ্যে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ও নাগাদের জীবনযাত্রা বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সর্বোপরি এই গিরিজনদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মমতা, এই উপন্যাসটিকে প্রায় সত্য ঘটনার মর্যাদা দান করেছে।

1970 সালে প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের জন্য বীরেন্দ্র কুমার পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল দ্বন্দ্ব—বাহিরের ও অন্তরের। একদিকে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচণ্ড স্পৃহা নিষ্পেসিত হচ্ছে নির্দয় বিদেশী প্রভুশক্তির বুটজুতোর তলায়, অপর

পক্ষে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার স্বাভাবিক আবেগ অবদমিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির নিয়ন্ত্রণে। ইতিপূর্বে 'কলং আজিও বয়' শীর্ষক একটি গল্পে লেখক স্বাধীনতা-যুদ্ধের একটি সংগ্রামী পরিবারের কথা লিখেছিলেন। গল্প ও উপন্যাসের বিষয় বস্তু এক; ঘটনাবলীর মধ্যেও প্রচুর মিল। এইসব দেখে মনে হয় দুটি রচনার একই প্রেরণা এবং তারা পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের ভাষাই সহজ ও সাবলীল। কেবল প্রভেদ আয়তনের—গল্পটি মিনিয়েচর, উপন্যাসের ক্যানভাস প্রশস্ত।

1970 সালেই প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান উপন্যাস 'প্রতিপদ'। অধিকাংশ পাঠকের বহু-পরিচিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে লেখক তাঁর গল্পবস্তু দাঁড় করিয়েছেন। চিত্তাকর্ষী আখ্যায়িকা মন নাড়া দেবার মতো মহৎ প্রেরণা থেকে লেখা। কিন্তু কোথায় যেন 'ইয়ারুইঙ্গম' এই উপন্যাসকে ছাড়িয়ে অনেক ঊর্ধে উঠে গেছে। নিছক বাস্তবতার দিক থেকে 'মৃত্যুঞ্জয়'-ও যেন এর চেয়ে অনেক বেশি সত্যসন্ধ। গল্পবস্তু ও গল্পের চরিত্রাবলীর মূল উৎস থেকে পাঠকদের দূরে রাখার জন্যই যেন লেখক তাঁর মুখবন্ধে বলেছেন, 'এই উপন্যাসটি কাল্পনিক'। ডিগবয়ে 1939 সালে আসাম অয়েল কোম্পানীতে মজুরদের যে ধর্মঘট হয়েছিল, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিপূর্বে লীগ-কংগ্রেস সম্মিলিত সরকারের আমলে (1938-39), সেটা তো আর কাল্পনিক ঘটনা নয়। উপন্যাসের গল্পবস্তু এবং সেই বাস্তব ঘটনার সাদৃশ্য এতই প্রকট যে 'কাল্পনিক' বলে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডিগবয় ধর্মঘটের কথা বলতে গিয়ে *Landmarks of the Freedom Struggle in Assam* (1958) বইয়ে K. N. Dutt লিখেছেন: "An event of considerable importance which drew the attention not only of the Coalition Government but also of the Congress High Command was the Digboi Labour Strike of 1939 involving nearly 10,000 labourers. The difficulties of the situation were immense as the existing laws for the settlement of industrial disputes were inadequate. The Government appointed a Conciliation Board to settle the disputes between the Assam Oil Company and the A. O. C. Labour Union. But before the recommendations of the Board could be implemented and the striking labourers numbering about 3,000 could be reinstated, the Second World War began and Digboi and Tinsukia were immediately made a 'protected area' under the War Ordinance. The labourers got no redress ; appeals to the Governor of Assam and the Viceroy were of no avail. Taking advantage of the semi-military regime enforced by the Ordinance, the A. O. C. authorities with the help of the civil authorities evicted from Digboi those 3,000 labourers, whose distress knew no bounds. The labour leaders were

either put under arrest or forcibly evicted from Digboi and escorted by the police outside Assam."

মজুরদের ধর্মঘট ছড়িয়েছিল প্রচণ্ড গতিতে, প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ; দমন করাও হয়েছিল ততোধিক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায়। যুদ্ধজনিত শান্তি ও শৃঙ্খলার অজুহাতে, ডিগবয় ও তিনসুকিয়া থেকে যেরকম কঠোরভাবে ধর্মঘট নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়, তেমন অত্যাচার ও অবিচার সচরাচর দেখা যায় না। বিলাতী মূলধনের বিরুদ্ধে এই ট্রেড য়ুনিয়ন গঠন-প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন কত যে হৃদয় বিদারক ঘটনা, সে আমরা অনেকে মনে রাখি না।

লেখক বলেছেন, তাঁর উপন্যাস কাহিনীমাত্র, সমাজমানসের প্রতিচ্ছবি নয়, ইতিহাসও নয়। অন্তত কিছুকালের জন্য ধর্মঘটীরা যে সত্যাগ্রহের পথকে শ্রেয়জ্ঞান করেছিল, সেকথা স্বীকার করে নিতে তাঁর হয়তো কিছু অনীহা আছে, ব্যক্তিগত কারণে। তিনি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করুন বা নাই করুন, ঘটনাবলীর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে 1939 সালে ডিগবয়ের শ্রমিক বিপর্যয় এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এই বিপর্যয় দেশের সামূহিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, হয়তো দেশের লোকের মনকে তা স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারেনি। অবশ্য একথাও সত্য, উপন্যাসের ঘটনাস্থল ডিগবয়ে না হয়ে ভারতের অন্য যে কোনো শ্রমিক-অধ্যুষিত এলাকায় হতে পারত।

লেখক বলেছেন, তাঁর এই কাহিনী গতানুগতিক নয়। তাঁর এ দাবী এই অর্থে হয়তো সংগত যে এ উপন্যাসের ঘটনাবলীতে দৃঢ়সম্বদ্ধ প্লট-এর আভাস মেলে না। পর পর অনেকগুলি চরিত্রের অবতারণা করে তিনি কাহিনীকে গতিশীল রেখেছেন—যদিচ তাদের মধ্যে কেউই নায়ক-নায়িকা পদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন যে লেখকের হৃদয়বত্তা কিঞ্চিৎ গভীরতর যদি হত, যদি একরঙা একঘেয়ে ভাষা ব্যবহার না করে তিনি বর্ণাঢ্য ভাষার প্রয়োগ করতেন, তাহলে এ উপন্যাস হয়তো এপিক পর্যায়ের ট্রাজেডি বলে পরিগণিত হতে পারত। এ বইয়ের ভাষা নিতান্তই সাদামাটা ও নিরাভরণ। তত্রাচ 'প্রতিপদ' পাঠ্যবস্তুরূপে আগ্রহ উদ্রেক করে। অকস্মাৎ যুদ্ধ আসার ফলে বিদেশী শিল্পপতিরা অব্যাহতি পেল ও শ্রমিকেরা বিপর্যস্ত হল বটে—তৎসত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় এ বইয়ে শ্রমিক-আন্দোলনকে একটি সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উপন্যাসের শেষ অংশে তাই একটি আশাবাদী সুর ধ্বনিত হয়েছে—হোক না সে আশা আজকের দিনেও সুদূর পরাহত।

কথা সাহিত্যে যাঁদের অনুরাগ আছে, অর্থবিত্তের সমবন্টন ঘটিয়ে যাঁরা দেশের অর্থনীতিক স্বাধীনতা কায়েম করতে চান, তাঁরা অনুবাদে বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের এই উপন্যাস পড়তে আগ্রহী হবেন বলে আমার আশা ও বিশ্বাস।

—মহেশ্বর নেওগ

প্রাসঙ্গিক

এই উপন্যাসখানি কাল্পনিক। এই কাহিনীর চিত্রণপদ্ধতিও গতানুগতিক নয়। উপন্যাসের ঘটনাবলী অগ্রসর হচ্ছে একটা গতির মধ্যে দিয়ে। সেখানে উচ্চনীচ আছে, হ্রাসবৃদ্ধিও আছে—এই সমস্তকেই সেই গতির অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এ বই একটা যুগের এবং একটা শ্রেণী মানসের প্রতিফলন। সেই সঙ্গে এর মধ্যে সার্বজনীন মানবত্তার ভাবও পরিস্ফুট। ঘটনার কাল হল প্রাক-স্বাধীনতা যুগ। সেই সময়কার অবস্থা ও পরিবেশ দেখা যাবে এ বইয়ে।...এ উপন্যাসের এমন কোনো চরিত্র নেই যাকে বিশেষভাবে নায়ক বা নায়িকা বলে চিহ্নিত করা যায়। সকল চরিত্রই যেন জীবনের অনিবার্য গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। শ্রমিকদের ব্যক্তি জীবনকে দেখানো হয়েছে শ্রেণী জীবনের সামূহিক ব্যষ্টির অঙ্গরূপে। উপন্যাস রচনায় লেখক তাঁর নিজের চেতনা, কল্পনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাবার প্রয়াস করেছেন।...এ উপন্যাস কাহিনীমাত্র, সমাজ মানসের প্রতিচ্ছবি নয়, ইতিহাসও নয়। এইটুকু মাত্র দাবী হয়তো করা যায় যে সমাজের যে শ্রেণীর মানুষের কথা আজো অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত, যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্যভাবে ও যত্ন সহকারে লেখক তাদের কথা লোকগোচর করতে চেয়েছেন।

'আর পারি না।' কারখানার বাইরে বেরিয়ে এল চণ্ডী আহির। উঠি-না-উঠি করে সূর্যও বেরিয়ে এল আকাশে। আকাশের গায়ে নবোদিত সূর্যের পাণ্ডুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে, চণ্ডী নিজেকেই নিজে বলল, 'আট আনা মজুরীর জন্যে এ-ভাবে হাড় কালি ও রক্ত জল করব কত দিন।' তখনো কানে বাজছে কারখানায় ইঞ্জিনের শব্দ। একটা বিড়ি বের করে জ্বালাল, আপন মনে বলল, 'জানি না ঘরের লোকটাই বা এখন কেমন আছে।'

চণ্ডীর দু-পাশ দিয়ে একাধিক মজুর বেরিয়ে গেল। রিফাইনারীর গেট পেরিয়ে মেঠো রাস্তায় পা না-দেওয়া পর্যন্ত চণ্ডী তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। ওর সারা দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথা। খাকী হাফপ্যান্ট-এর উপর সাদা লংক্লথের সার্টটা যেন বোঝা স্বরূপ।

পিছনে দাঁড়িয়ে ইসমাইল শুনছিল চণ্ডীর কথাগুলো। আহিরের মুখখানা লম্বাটে ধাঁচের, কুচকুচে কালো চামড়া যেন আগুনে পোড়া, গলার পেশীগুলো দড়ি-পাকানো। বিড়ি ধরাতে গিয়ে মুখমণ্ডলের উপর আলো পড়ল। সসম্ভ্রমে তার দিকে ইসমাইল একবার তাকাল। তারপর তার শীর্ণ শুকনো পায়ের দিকে নজর রেখে, গভীর সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা চণ্ডীদাদা, বৌদিদিকে ডাক্তার এখনো দেখেন নি নাকি?'

'ডাক্তার?' ইসমাইলের দিকে মুখ ফিরিয়ে আহির জবাব দিল, 'তোর বৌদি কি মেমসায়েব? বাবুদের গিন্নী? ডাক্তারের সময় নেই।'

চণ্ডীর বিড়ির মুখখানা আগুনে লাল। এবার পুবদিকের আকাশখানা আরো রাঙা হয়ে উঠল। ইসমাইল বলল, 'কেন? ডাক্তারও তো তোমার আমার মতো কোম্পানীর চাকরী করে।'

বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চণ্ডী বলল, 'চাকরী! ...ইসমাইল, দেশগ্রাম ছেড়ে এসে বড্ড ভুল করেছি। তোর বৌদি তো হরদম বলে—'চলো, ফিরে যাই। সেখানে আত্মীয়স্বজন আছে, বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াবার মতো মানুষ আছে, মরলে তারা নিশ্চয় চিতায় তুলে দেবে।' চণ্ডী আরেকবার কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'জানিস ইসমাইল, চাষবাস করায় অনেক বেশি আনন্দ। এরকম বর্ষাবাদলের দিনে মাঠে বাস করার অনেক মজা। দেশের মাটির গন্ধই আলাদা। এ-দেশের প্যাচপেচে কাদায় কোথায় সেই সোঁদা গন্ধ!'

ইসমাইল বলল, 'হ্যাঁ, মজা না আরো কিছু! নিজের বাড়ির উঠোন থেকে

জোতদার যখন গোলার ধান দেনার দায়ে কেড়ে নিয়ে যায়, মজা কোথায় থাকে শুনি? কলজেটা তখন পুড়ে খাক হয়ে যায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইসমাইল আবার বলল, 'আমি কিন্তু আর ফিরছি না গাঁয়ে। বাকি জীবনটা এখানেই কাজ করে কাটিয়ে দেব।'

চণ্ডী ইসমাইলের কথার কোনো প্রতিবাদ করল না'

দু'জনেই এবার 'লাইনে' যাবার রাস্তা ধরল। ফরফর করে চলতে গিয়ে কাদায় চণ্ডীর পা পিছলে যাবার যোগাড় হয়েছিল। ইসমাইল খপ করে ধরে তাকে বলল, 'কী এত ভাবছো বলো তো? আরেকটু হলেই তো পিছলে পড়তে।'

হাঁটুর উপর হাত দিয়ে চণ্ডী ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিছলে পড়তাম যদি প্যান্টটা কাদামাখা হয়ে যেত। কাল তাহলে আর কাজে বেরোতে হত না। প্যান্ট না পরে গেলে কোম্পানী ঢুকতে দেয় না, অথচ দুটো প্যান্ট কেনার মতো পয়সাও দেয় না। তোর ক'টা আছে?'

ইসমাইল বলল, 'দু'টো'।

গম্ভীর হয়ে চণ্ডী দুয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোর আর কি? একা মানুষ, মাইনের পয়সাতে কী করিস?'

ইসমাইলের কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। চণ্ডী হাসতে হাসতে বলল 'বিয়ে করতে চাস বুঝি? এই তো বিয়ের বয়েস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইসমাইল চুপ করে রইল।

চণ্ডী জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম বিয়ে করতে চাস?'

ইসমাইল বলল, 'কই, না তো। ...যেমন আছি তাই ভালো। ঝঞ্ঝাট নেই। খাই দাই, মজা করি। যদি...' •

'হ্যাঁ কি বলছিল? যদি...'

'যদি প্রোমোশন হয়...শুনছি ফোরম্যান হবার কথা আছে...'

চণ্ডী হেসে বলল, 'ওসব যুক্তির কোনো মানে হয় না। স্রেফ ফাঁকা কথা। এত ভেবে চিন্তে আঁটঘাট বেঁধে কি বিয়ে হয় রে?'

ইসমাইল কিছু আর বলল না।

প্রকাণ্ড একটা অশথ গাছের উপর দিয়ে কা কা করে একটা কাক উড়ে গেল। গাছের তলার কুষ্ঠ রোগীটা কাতরে উঠল, 'মাগো, মাগো!' ইসমাইল দু'টো পয়সা ছুড়ে দিল ওর দিকে। অদূরে দেখা গেল চণ্ডীদের কোয়ার্টার-এর লাইন।

পাড়াটায় থাকে ঘরসংসারী শ্রমিকেরা। চণ্ডীদের কোঠাগুলোর মাপজোক পর্যন্ত ইসমাইলের জানা। লম্বায় বারো, প্রস্থে আট ফুট—এই রকম দু'টো কোঠা। কাছে পিঠে একটা ছোট রান্নাঘর—দৈর্ঘে আট, প্রস্থে ছয় ফুট। রান্নাঘরের থেকে তিন ফুট দূরে সকলের ব্যবহারের সাধারণ পায়খানা। গ্রীষ্মকালে, কেবল রান্নাঘরে নয় অপর দুটো ঘরেও দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না। অসহ্য যদি হয়, চণ্ডীর বৌ বমি করে। গাঁজায় দম দিয়ে চণ্ডী কোনো প্রকারে প্রকৃতিস্থ থাকে। আর একটা কথা চিন্তা

করলে ইসমাইলের হাসি পায় আবার লজ্জাও লাগে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চণ্ডী ও তার স্ত্রী একই ঘরে কী করে ঘুমোয় ? সেই জন্যই চণ্ডী নাইট ডিউটি করে। যে রাতে ছুটি থাকে, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজির সঙ্গে ধর্মচর্চা করে কাটায়। ওর ঘরের কোঠার তুলনায় মিশনের কোঠাটা ভালো—যদিচ ঘরটা সরু মতন এবং চাল নিচু। বাঁশের ফোকরে পাখি ঢুকে যেমন রাত কাটায়, তেমনি মিশনে কোনো প্রকারে ওর রাতটুকু মাথা গুঁজে কেটে যায়।

চণ্ডীর ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে জেবউন্নিসাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ইসমাইল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছে জেবউন্নিসা ?'

চণ্ডী বলল, 'কিন্তু ও দৌড়োচ্ছে কেন ?'

ইসমাইল বলল, 'চণ্ডীদাদা, এই মেয়েটা কিন্তু ডাইনী।'

চণ্ডী হেসে বলল, 'শুনলাম ওকেই তুই বিয়ে করতে চাস।'

ইসমাইল গম্ভীর হয়ে বলল, 'এ সব তুমি ভুল কথা শুনেছো।'

হঠাৎ ওদের দুজনের সামনে অমাবস্যার অন্ধকার থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ শিখার মতো বেরিয়ে এল জেবউন্নিসা। চণ্ডী তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একনজর দেখে নিল, শেষে নজর পড়ল ওর খোঁপায় জড়ানো বকুল ফুলের মালার উপর। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে জেবউন্নিসা ?'

জেবউন্নিসা তিরস্কারের সুরে বলল, 'মামা, প্রাণে কি তোমার মায়া দয়া বলে কিছু নেই। মামী কতক্ষণ ধরে তোমার খোঁজ করছে, যাও তো তাঁর কাছে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।'

চণ্ডীর বুকে ছুঁচ ফুটল যেন। জেবউন্নিসা ওকে মামা বলে ডাকলে একটা যেন লাঞ্ছনার জ্বালায় বুকটা জ্বলে পুড়ে যায়। তার কারণ, জেবউন্নিসার মা ছিল দূর সম্পর্কে ওর বোন। ডিগবয়ে আসার পর বিধবা হয়। বিধবা হয়ে চলে যায় ফিলিপস সায়েবের খানসামার আশ্রয়ে। পরমা সুন্দরী ছিল, বাংলোয় যাবার পর রূপই হল ওর কাল। সায়েবের দৃষ্টি পড়ল ওর উপর, ফলে সায়েবের ঔরসে ওর গর্ভে জন্ম নিল পরীর মতো দিব্যকান্তি এই মেয়ে—জেবউন্নিসা। কিছুকাল আগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তারপর সম্প্রতি ওর উপরেও এক সায়েবের নজর পড়েছে।

জেবউন্নিসাকে দেখলে চণ্ডীর রাগ হয়, মমতাও হয়, মাঝে মাঝে ঘৃণাও জন্মে। সে যাই হোক, আপাতত ওর তিরস্কারটা চণ্ডীর বুকে যেন বাজল। আর এক মুহূর্তও দেরী না করে ও দ্রুত পা চালাল নিজের বাসার দিকে।

জেবউন্নিসা তখনো হাঁপাচ্ছে। মেমসায়েবদের মতো ফরসা ওর দেহের রঙ। স্বাস্থ্য ও যৌবন দেহটিকে যেন তুলে ধরেছে। সায়েবের বাগানে প্রস্ফুটিত ডালিয়া-গুচ্ছের মতো ওর মুখখানি। বুক দু'টো ওঠানামা করছে এমনভাবে যে দেখে মনে হয় বুকের ভিতর কী-একটা যেন অনুভূতি ড্রিলিং মেশিনের মতো চলছে। ইসমাইল জিজ্ঞেস করল : 'চণ্ডীর স্ত্রীর অবস্থাটা কেমন এখন ?'

জেবউন্নিসা ঠোঁট উলটিয়ে বিষন্নভাবে বলল, 'বাঁচবে বলে মনে হয়না'। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখে মনে হল বড় জোর এই সকাল বেলাটা পর্যন্ত টিঁকে থাকবে।'

সত্যি, বেঁচে থাকার কথাও নয়। সুচিকিৎসা তো দূরের কথা, কোনো প্রকার চিকিৎসা না হয়েই মানুষটা আজ এক বছর ধরে ভুগছে। প্রথম প্রথম ম্যালেরিয়া বলে ডাক্তার খুব খানিকটা কুইনিন গেলাল। শেষে বলল, লিভার খারাপ এবং সেইমতো চিকিৎসা চালাল। সম্প্রতি রায় দিয়েছে টি. বি. এবং সেই সঙ্গে ওষুধও চলছে সেইমতো। চণ্ডী এখন স্ত্রীর মরণের দিন গুনছে। সে বুঝেছে সেইটাই ভগবানের ইচ্ছা, সুতরাং মানুষ তা খণ্ডাতে পারবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি বাড়ি বয়ে এসে ওকে বলে গেছেন, 'কে কার জীবনের মালিক, চণ্ডী। কেউ কারো নয়। জীবন-মৃত্যুর কর্মকার যিনি, সেই ভগবান তাঁর ইচ্ছামতো ভাঙছেন, গড়ছেন। মরবার যদি হয় মরবেই। শোক করা বৃথা।' কিন্তু চণ্ডীর আর সহ্য হচ্ছে না।

স্ত্রী তার খোঁজ করছিল। বাসায় ঢুকে চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল স্ত্রীর কাছে। দেখল, কোটরগত দুটি চোখ থেকে জল ঝরছে। হাত দিয়ে মুছে দিয়ে চণ্ডী বলল, 'কোনো ভাবনা নেই। ভগবান তোকে ভালো করে তুলবেন। জেবউন্নিসা গেছে ডাক্তারকে ডাকতে।'

লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে স্ত্রী জবাবে বলল, 'রান্নাঘরের চালে একটা গঙ্গাজলের বোতল গুঁজে রেখেছিলাম। তা থেকে এক ফোঁটা দাও তো আমাকে। ডাক্তারের ওষুধে আর কোনো কাজ হবে না।'

চণ্ডী গঙ্গাজলের খোঁজে রান্নাঘরে গেল। এবার স্ত্রী বড়ো মেয়ে পান্নুকে ডেকে বলল, 'এ-দিকে আয় তো পান্নু।'

পান্নু এসে সামনে দাঁড়াল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'পান্নু, সোনাদের দেখবি। আর...' চোখ ছেপে জল এল, কোনো প্রকারে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'বাবাকে নিয়মমতো চা দিবি, ভাত দিবি।'

দুর্গা বাড়ির বড়ো ছেলে। তাকে দেখতে পেয়ে মা বললেন, 'আমি আর বাঁচবো না রে দুর্গা। তুই কাজ পেলি ? ডাক্তারবাবু কিছু কি বলেছেন ?'

দুর্গা কাছে এসে বিষণ্ণভাবে জবাব দিল, 'আজ কথা বলবেন বলেছেন।'

চোখ বুজে মা বলল, 'কাজে তুই যাবি। আমি আশীর্বাদ করছি। ডাক্তারবাবু মানুষ ভালো।'

দুর্গার মুখে আর কথা সরল না।

ততক্ষণে গঙ্গাজলের বোতলটা এনে চণ্ডী দুয়েক ফোঁটা মুখের কাছে ধরল। অতিকষ্টে একটা ঢোক নিল, সঙ্গে সঙ্গে গলার ভিতরটা ঘড় ঘড় করে উঠল। অস্থিচর্মসার দেহখানা নির্বাপিত প্রায় প্রদীপের শেষ শিখার মতো ছটফট করতে লাগল। খুব কষ্টে মিনুবাই বলল, 'আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি, সে প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল। না গো ?'

'হ্যাঁ'। চণ্ডীর বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। আগেকার দিনে হলে প্রশ্ন শুনে রাগ করত, ঝগড়াঝাঁটি হত। কিন্তু এখন সমস্ত হৃদয় ছাপিয়ে উঠছে অনুতাপের ঢেউ, তোলপাড় হচ্ছে বুকখানা। আসবার পর থেকে চণ্ডী তাদের দেশের বাড়িতে একটি বারের জন্য ফিরে যায়নি। ভিটেবাড়ি ধানজমি নিয়ে একদিন দাদা ও ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে, পৈতৃক সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে চণ্ডী—এই অভিশপ্ত শহরে এসেছিল। পিছনে ফেলে আসা দেশ বা গ্রামের কথা সে মন থেকে মুছেই ফেলেছিল। কিন্তু মিনুবাই পারেনি—সর্বদা দেশে ফিরে যাবার জন্য আকুল হত আর বলত, 'এদেশে মরলে চিতায় কাঠ সাজাবার মতো আপনজন কোথায়? আর ছেলেমেয়েগুলোকে দেখছো তো—দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, লঘুগুরু জ্ঞান নেই, কিছু মানেনা, কাউকে মানেনা।' সেই সব কথাবার্তা চণ্ডীর মনে পড়তে লাগল। আবার সে মিনুবাইকে প্রবোধ দিয়ে বলল, 'কোনো ভাবনা ক'রো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চণ্ডীর স্ত্রী ম্লানভাবে হাসল। হাসি দেখে চণ্ডী বুঝল মিনুবাইকে সে যে ঘরছাড়া ভিটেছাড়া করে একাকিনী করেছে, তার সে অপরাধ এই অন্তিম সময়ে স্ত্রী মার্জনা করে গেলেন। নিশ্বাস টেনে টেনে মিনুবাই বলল, 'চলে যাবার জন্যে বেরিয়েছি যখন, মনটা হালকা করে যাওয়াই ভালো।' আবার সেই কথা—চণ্ডীর অসহ্য মনে হল, সে আমতাআমতি করে বলল, 'আ-হ', আসল কথাটা কি সে কি তুমি আর জানতে না! ভায়ে ভায়ে ঝগড়াঝাঁটি ভারি খারাপ। তাছাড়া কতটুকুই বা ছিল চাষের জমি? ওদিকে বাড়ি ভর্তি লোকজন। জমিদারের পেয়াদারা তো...'

'ওসব কথা আর নয়, বাদ দিন। মানুষ যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে।' খুব কষ্টে এই কটা কথা বলে মিনুবাই বলল, 'একবার ভগবানকে ডাকতে দিন।'

মুখে ভগবানের নাম নিয়ে এবার সে চোখ বুজল। ধীরে ধীরে মুখের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। চণ্ডীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফুলশয্যার রাত্রিশেষে ওদের সেই গাঁয়ের বাড়ির কোঠায় একটি জানালা ও খুলে দিয়েছিল। দু'জনে দেখেছিল দেশের সেই নির্মেঘ নীল আকাশ। ভোর রাত্রির অনেকখানি সময় নূতন প্রণয়ী দু'জন কাটিয়েছিল সেই নীল আকাশের তলায়—সেদিন আকাশ ছিল তাদের মিলনের সাথী। কী মনে করে চণ্ডী মিনুবাইয়ের শিয়রের জানালাটা খুলে দিল। কিন্তু সেই অতীতের নির্মেঘ নীল আকাশ দেখা গেলনা। আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। সঞ্চরমান মেঘ যেন আভাস দিচ্ছে মানুষের অগোচর অন্য কোনো জগতের। মিনু কি আজ সেই অচেনা অজানা জগতে পাড়ি দেবার জন্য বেরিয়েছে? ফুলশয্যার স্মৃতি ও আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের শূন্যতা এই দুটি পরস্পরবিরোধী ভাব চণ্ডীর সমস্ত মনকে যেন বিকল করে দিল।

দুর্গা ও পান্নুর মানুষ মরতে দেখা এই প্রথম। উপরন্তু—উভয়ের কেউই এযাবৎ ভাবতে পারেনি মাকে তারা চিরকালের মতো হারাতে পারে। দুর্গারই হঠাৎ মনে

হল মা যেন অনেকক্ষণ ধরে মুখে কোনো রা করেনি, চোখও মেলেনি। সে বলল পান্নুকে, 'মার ঘুম এসেছে। যা তুই সোনাদের দেখাশোনা কর গিয়ে।'

পান্নু ঘর থেকে বেরোবে এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল রানু ও শামারী। কার কাছ থেকে খবর পেয়ে দু'জনেই নিজেদের ডিউটি বাদ দিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে এসেছে। এসেই রামু রোগিনীর নাড়ী টিপে বলল. মিনুবাইকে আর ঘরের মধ্যে রাখা চলেনা। ধর, শামরী, তুই পায়ের দিকটা ধর দেখি।' দু'জনে মিনুবাইকে তুলে নিচ্ছে দেখে দুর্গা জিজ্ঞেস করল, 'কি কোরছো তোমরা ?'

রামু বলল, 'কিছু না দুর্গা। মা মরে ভূত হয়েছে। এখন একটা তুলসীর চারা আন দেখি। আর পান্নুকে বল একটা প্রদীপ নিয়ে আসতে।'

বাপ ও ছেলেদের এই নিদারুণ খবর দেবার পর ওরা দু'জনে ধরাধরি করে মিনুবাইয়ের শবদেহ বাইরের বারান্দার উপর শুইয়ে দিল। দুর্গা আর পান্নু তো বটেই, ওদের বাবাও যেন বজ্রাহতের মতো চলৎশক্তি হারিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক বাদে রামু কোথা থেকে যেন ঘুরে এল। এসে দেখে চণ্ডী, দুর্গা, পান্নু— তিনজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই, দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। রামু পান্নুকে বলল, 'মাটির প্রদীপ কোথায় আছে দেখিয়ে দে তো পান্নু।'

পান্নু রামুর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল 'তুমি কি মানুষ না পাষান রামুদা, প্রাণ বেরোবার আগেই মাকে এখানে এনে শুইয়ে দিলে কেন ?'

পান্নুর কথা শুনে আধবয়সী রামু স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে গলাটা যথা-সম্ভব মোলায়েম করে বলল, 'না রে, মিনুবাই স্বর্গে গেছেন। কাঁদিস না তুই।

চণ্ডী রামুকে বলল, 'তুই যা রামু। রান্নাঘরখানা এত ছোট, একটু চোখ বুলিয়ে নিলে মাটির প্রদীপটা ঠিক পেয়ে যাবি। মরবেন জেনে উনি সকল রকম প্রয়োজনীয় জিনিস ওই রান্নাঘরে জড়ো করে রেখেছেন।'

রামু রান্নাঘরে চলে গেল। এতক্ষণে দুর্গা বুঝতে পারল ওর চোখের সামনের খালি বিছানাটাতে আর মা কখনো শোবে না। তবু সে কাঁদতে পারল না। কেবল অনুতাপে তার বুকখানা বয়লারের মতো তপ্ত হয়ে উঠল। 'মা, মা, কোথায় চলে গেলি তুই ?' অস্ফুট স্বরে সে যেন নিজেকেই নিজে বলল।

রামু মাটির প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখে দেবার পর চণ্ডী কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। তখনো তার গায়ে নাইট ডিউটির পোশাক। পাশের কোঠায় সোনা তখনো শুয়ে, তাকে কোলে তুলে বলল, 'সোনা, যাবি না মাকে একবার শেষ দেখা দেখতে।'

চেয়ে তাকিয়ে বাপকে দেখে সোনা খুব কাঁদতে লাগল। চোখে তখনো তার ঘুম আছে। সোনাকে কোলে করে চণ্ডী সোজা বেরিয়ে গেল বাইরের বারান্দায়। সোনার কান্না শুনে ওর চার বছর বয়সের দাদা শেখরেরও ঘুম ছুটে গেল—কীসের কান্না ? হঠাৎ পান্নু এসে ঢুকল আর শেখরকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শেখর জিজ্ঞেস করল, 'কীসের কান্না দিদি ?' পান্নু বলল, 'জানিনা কেঁদে কী হবে, মাকে আমরা

খেয়েছি রে, এখন কেঁদে কী হবে?' দিদির হাবভাব দেখে শেখর বুঝতে পারল, মায়ের কিছু একটা অঘটন ঘটে থাকবে। পান্নু ওকে তুলে নিয়ে বাইরের বারান্দায় গেলে পর সেখানে মাকে শায়িত অবস্থায় দেখে, শেখর অবাক হয়ে শুধোল, 'তোমরা কেন মাকে মাটির ওপর শুইয়ে রেখেছো? মায়ের কষ্ট হবে।'

মিনুবাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বহু লোক এল চণ্ডীর বাড়ির বাইরের বারান্দায়। শেখরের কথা শুনে সবার চোখে জল। মহেন্দ্র বরুয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা, আহা, বাছারে। কিছু বুঝতে পারেনি।' রামু বলল, 'বরুয়াবাবু, সংসারে সন্তানের চোখে মায়ের বড়ো আর কিছু নেই।' অন্যেরাও হাহুতাশ করতে লাগল। রামু চণ্ডীকে বলল, 'দুর্গাকে ডাকুন। ওকে শ্মশানে যেতে হবে। মুখাগ্নি করতে হবে।' চণ্ডী জবাব দিল, 'তুই বল্ ওকে, রামু। আমি কিছু পারব না বলতে।' কিন্তু দুর্গা নিজের থেকেই এগিয়ে এল। রামুর নির্দেশ মতো সে ভিতর বাড়ি গিয়ে ধুতি পরে খালি গায়ে বেরিয়ে এল।

ইতিমধ্যে দু'জন লোক বাঁশ জোগার করে একখানা চ্যাং তৈরী করতে লেগেছে। তৈরী হলে পর মিনুবাইয়ের দেহখানা তুলসীতলা থেকে ধরাধরি করে তুলে এনে রামু ও শামরী চ্যাং-এর উপর শুইয়ে দিল। তারপর দেহের উপর কিছু কাপড়চোপড় ঢেকে দিয়ে চ্যাং-এর সঙ্গে বেঁধে নিল।

এবার রামু পান্নুকে বলল, 'এবার তোরা প্রণাম সেরে নে, মাকে এ-জন্মে আর তো পাবিনা।'

চাতালে সেই তুলসীচারাটার সামনে মাটির প্রদীপটা নিবু নিবু হয়েও তখনো জ্বলছে। পান্নু ও শেখর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। শেখর দুই হাতে মায়ের দেহ জড়িয়ে ধরে বুকফাটা কান্নায় সারা পাড়া মুখর করে তুলল। দুর্গা বোনকে বলল, প্রণাম কর, পান্নু। শেখরকে কোলে তুলে, তাকে দিয়ে দুর্গা প্রণাম করাল, নিজেও প্রণাম করল হাঁটু গেড়ে। পান্নু মায়ের পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল, 'মা, মা-গো!'

মেঘ ঘনিয়ে এল। রামু বলল, 'নে, শামারী, এইবার চ্যাংখানা কাঁধে তোল। কীরকম মেঘের ঘটা দেখেছিস, বিষ্টি এসে যেতে পারে।'

রানু আরো দু'জন জাতভাই ডেকে, চ্যাংখানা কাঁধে তুলল। পান্নুরা কেঁদে ভাসাল। কিন্তু রামুর দল ততক্ষণে 'রামনাম সৎ হ্যায়।' বলতে বলতে এগিয়ে গেল। উপস্থিত দর্শক যারা ছিল তারাও বলল, 'রাম বোল হরি বোল।'

বরুয়া এগিয়ে গেলেন, দুর্গাকে বললেন পিছু পিছু আসতে। এতক্ষণে দুর্গার দু'-চোখ উপচে জল এল। কাছেই একটি লোক একখণ্ড বাঁশ চেঁচে ছুলে পরিষ্কার করছিল। সেই কাঠিটা দুর্গার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই কাঠিটা নিয়ে যা, মুখাগ্নি করার সময় লাগবে।'

ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে হাতে সেই কাঠিটা নিয়ে দুর্গা শ্মশানের পথে চলতে লাগল। যেতে যেতে তার মনে হল সমস্ত সংসারটাই যেন অন্ধকার হয়ে গেছে।

চণ্ডীর হঠাৎ মনে পড়ল, তখনো পর্যন্ত পুরুতকে খবর পাঠানো হয়নি। বরুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বরুয়া বাবু, একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই এক পুরুত বামুন থাকে, তাকে একটু ডেকে দিতে হবে। আসল কথাটাই মনে ছিল না। পুরুতকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। কিছু কিছু জিনিস যদি কেনাকাটা করতে হয় তো দোকান থেকে কিনে দেবেন। একটা লোক দিচ্ছি আপনার সঙ্গে, সে জিনিস বয়ে নিয়ে যাবে শ্মশানে। মনে কিছু করবেন না। আমি বড্ড একা পড়ে গেছি।'

বরুয়া বললেন, 'ভাবনা চিন্তা কোরো না। আমি এখুনি সব ঠিক ঠাক করে দিচ্ছি।'

দোহারা গঠনের মানুষ বরুয়া, সর্বদা খুবই কর্তব্যপরায়ণ। তিনি বড় বড় পা ফেলে পুরুতের ঘরের দিকে চললেন। চণ্ডী একজন লোককে ডেকে বলল সঙ্গে সঙ্গে যেতে। লোকটাও বরুয়ার পিছু নিল।

এবার চণ্ডী পরম স্নেহে সোনাকে নিজের বুকের মধ্যে সাপটে ধরল। বড় খালি খালি লাগছিল বুকটা।

□

খানিকক্ষণ বাদে আরো কেউ কেউ এল খবর নিতে। সকলেরই হাতে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য। কেউ এনেছে ফল, কেউ বিস্কুটের প্যাকেট, কারো হাতে নারকেল, কেউবা ঠোঙা ভরে এনেছে ছোলাভাজা, ডালভাজা। সকলেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। জিনিস নেবার কেউ নেই। ইতিমধ্যে এসে পড়লেন চ্যাটার্জি ও ডিম্বেশ্বর এবং তাদের পিছু পিছু জেবউন্নিসা ও ডাক্তার। তাঁরা এসেই বুঝলেন চণ্ডীর সংসারের এখন হতবুদ্ধি অবস্থা। ডিম্বেশ্বর সবাইকে বললেন, 'কিসের অপেক্ষা করছেন আপনারা? জিনিসপত্র এনেছেন, ভিতরে নিয়ে যান, চলুন আমিও যাচ্ছি। এ বাড়িতে এখন কি আর দেখাশোনা করার মতো কেউ আছে?'

ডিম্বেশ্বর গটগট করে ভিতরে চলে গেলেন। যারা হাতে করে জিনিসপত্র এনেছিল, তারাও পিছু পিছু ঢুকল। ডাক্তারকে দেখে চণ্ডী বলল, 'সব তো শেষ! এত দেরি করে এলেন, ডাক্তারবাবু?'

আত্মগ্লানিতে ডাক্তার হাজারিকার মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "ছোটসায়েবের মেয়ের ছেলে হবার কথা। তাই ওখানেই রাত কাটাতে হল। মিনুবাইকে দেখতে আসতে পারলাম না।

ডাক্তারের মুখের দিকে চণ্ডী মুখ তুলে চাইতেও পারল না। নিজের মনে বলল, 'সায়েবের ওখানে অসুখ বিসুখ হলে, আমাদের রুগীর দিকে কে আর নজর দেয়?'

গলার স্টেথিসকোপটা দুলিয়ে ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার স্ত্রীর যে অসুখ করেছিল, তাতে মানুষ বাঁচতে পারে না, চণ্ডী। তবু আমার ত্রুটি তো হয়েইছে, মনে কিছু কোরোনা।' কিছুক্ষণ পরে গলাটা খুব মোলায়েম করে ডাক্তার বললেন, 'একটা কথা ছিল চণ্ডী। দুর্গা গিয়েছিল আমার ওখানে। একটা ড্রাইভারের কাজ

খালি আছে—এম্বুলেন্স ভ্যান-এর জন্য একজন ড্রাইভার দরকার। ওকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। হয়তো কাজটা ওর করে দিতে পারব। ওর তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়া আছে—না?'

চতুর ডাক্তার চণ্ডীর মনের ক্ষোভটুকু পাতলা করে দেবার জন্য অসময়ে হলেও প্রসঙ্গটা পাড়ল। চণ্ডী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আছে। আপনার দয়া। কথাটা শুনে গেলে বেচারী কত খুশি হত। মৃত্যুশয্যায় বলে গেছে—'তুই কাজ পাবি, দুর্গা। ডাক্তারবাবু মানুষটা ভালো।'

ডাক্তার কব্জির ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'কাজকর্ম শ্রাদ্ধশান্তি সব হয়ে যাক। কিছু তাড়া নেই, সুবিধেমতো একদিন পাঠিয়ে দিলেই চলবে। বুঝেছো চণ্ডী? আবার আমায় ছোটসায়েবের মেমকে দেখতে যেতে হবে।' ডাক্তার উঠে পড়লেন। রাস্তায় ছোট সায়েবের গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে—ড্রাইভার ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছিল ডাক্তারের উদ্দেশে। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার।

যারা এসেছিল এক-একজন করে তারা সবাই ফিরে যেতে লাগল। থাকল কেবল ডিম্বেশ্বর, চ্যাটার্জি ও জেবউন্নিসা। আকাশে তখনো মেঘের গর্জন।

ডিম্বেশ্বর ডাকল, 'পান্নু!'

পান্নু দাঁড়াল ওঁর সামনে। ডিম্বেশ্বর ডাকলে সাড়া না দিয়ে পারে না পান্নু। লোকটা পৌরুষের প্রতীক। — 'কিছু বলবেন?'

'সোনাকে, শেখরকে কিছু খেতে দাও। কারখানা থেকে ফিরে এসে তোমার বাবাও এখনো কিছু খাননি। তাঁকেও দাও।' —ডিম্বেশ্বর গম্ভীরভাবে বললেন।

চণ্ডী আপত্তি করল, 'আমি কিছু খাবো না পান্নু। সোনাদের দে। একে নে তো।' চণ্ডী সোনাকে এগিয়ে দিল। পান্নু তখন আঁচলে চোখের জল মুছতে লেগেছে। তার দেরি দেখে জেবউন্নিসা বলল, 'আমায় দাও মামা।' এত শোকের মধ্যেও চণ্ডী বিরক্তভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে কোলে করতে হবে না, জেবউন্নিসা। পান্নুই নিক ওকে। পান্নু!'

এরকম লাঞ্ছনা জেবউন্নিসার পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু আজকের এই অপমান তার কাছে বজ্রঘাততুল্য মনে হল। জেবউন্নিসাকে অধিকাংশ লোকই মনে করে অস্পৃশ্য, অপবিত্র। কেবল মিনুবাই তাকে ছেলেপুলে কোলে নেবার অধিকার দিয়েছিল। আজকের বিশেষ দিনে সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবার দরুণ সে দস্তুর মতো ক্ষুণ্ণ হল।

ক্ষুব্ধ স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এতই অস্পৃশ্য, মামা?'

সোনাকে কোলে নিয়ে, শেখরের হাত ধরে পান্নু ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল। ডিম্বেশ্বর জেবউন্নিসার কথায় ব্যথিত হয়ে বলল, 'হিন্দু জাতটা এইসব কারণেই মরছে।'

চণ্ডী বলল, 'এগুলো ধর্মের কথা, আচারের কথা। আপনি না মানতে পারেন। শুনছি আপনি নাকি...।' চ্যাটার্জি চোখের ইশারায় চণ্ডীকে চুপ করে যেতে বলল। কিন্তু সকলেই জানে নিজের বিয়ে-করা বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে, ডিম্বেশ্বর

বিয়ে করতে চায় আহমদ সাহেবের ভাগনী জাহানারাকে। জাহানারার প্রেমে পড়েছে ডিম্বেশ্বর।

ডিম্বেশ্বর এবার হো হো করে হেসে বললেন, 'কথাটা কে না জানে? আমি না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান। আমার কাছে সব ধর্মই এক। লোকে প্রতি বছর যেমন জামা কাপড় বদলে নতুন জামা কাপড় পরে, আমি তেমন এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। এই সোজা কথাটা বুঝলে না?'

জেবউন্নিসা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ডিম্বেশ্বরের দিকে। চ্যাটার্জি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ইউ আর ফার ইন এড্ভান্স অব দি টাইম্স, ডিম্বেশ্বরবাবু। কিন্তু আপনি আপনার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।'

ডিম্বেশ্বর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আমার জীবন কীভাবে চলবে, সে আমিই ব্যবস্থা করি। সুতরাং আপনাদের মতামতে আমার দরকার নেই। জানেন তো আমার কাজকর্ম নিয়ে সায়েবরাও উচ্চবাচ্য করে না।' সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ডিম্বেশ্বর আরো বললেন, 'ভগবানও আমায় ভয় পান।'

চণ্ডী বেজার হয়ে বলল, 'ঘোর কলি কাল। তা না হলে আপনার মুখ থেকে এইরকম কথা বেরোয়? আপনার মত মানুষের স্থান রৌরব নরকে।'

ডিম্বেশ্বর বললেন, 'নরক জিনিসটা কী? নিছক কল্পনা। নরকের ভয় আমার নেই।'

চণ্ডীর অসহ্য মনে হল। সে উঠে গেল। ডিম্বেশ্বর নির্বিকারভাবে—সিগারেট টানতে টানতে জেবউন্নিসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুড়ো নাসিরুদ্দীন সাহেব কেমন আছেন?'

'আছেন ভালোই।' জেবউন্নিসা বলল। কিন্তু ওর মনটা এখনো দুঃখে অপমানে ভারাক্রান্ত। 'এই বাড়িতে আসার আর উপায় রইল না। আর আমার কোথাও যাওয়া হবে না।' অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হাসতে হাসতে বলল, 'ডিম্বেশ্বরবাবু, নাসিরুদ্দীন সাহেবের মতো মানুষ যদি না থাকতেন, তাহলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। একমাত্র মিনুবাই আমায় মানুষ বলে জ্ঞান করতেন। নাসিরুদ্দীন সাহেব আমায় ডাকেন নাতনী বলে।'

ডিম্বেশ্বর জেবউন্নিসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালোবাসা কুড়োবার জন্য যতই ঘুরে বেড়াবি, ততই মরবি। মারো পৃথিবীর নাকে ঘুঁষি, দেখবি পৃথিবী তোকে মাথায় করে নাচবে।'

জেবউন্নিসা কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ডিম্বেশ্বর হেসে হেসে চ্যাটার্জিকে বললেন, 'কি হে বিপ্লবী, বেশ্যা দেখে মুখে বুঝি আর কথা ফুটছে না?' চ্যাটার্জিও হেসে হেসে জবাব দিলেন, 'কথাটা নিতান্ত মিছে নয়। আমি যে আমি, আমিও বেশ্যাকে মানুষ বলে গণ্য করতে শিখিনি। মনের ভিতর থেকে কী একটা যেন বাধা আসে। বোধ করি বিবেকের দংশন।' ডিম্বেশ্বর ঠাট্টা করে বললেন, 'মার্কস-এর বইগুলো আজই আগুনে পুড়িয়ে দাও। তোমরা করবে বিপ্লব? ডিগবয়ে বিপ্লবী বলতে কেউ যদি থাকে, সে আমি।'

চণ্ডী রান্নাঘরের দিকে যাবার জন্য বেরোল। ডিম্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথাটায় খুব ব্যথা করছে, হাজারিকা বাবু। আমি ছেলেদের একটু সামলাই। শুনছেন তো, ওরা কান্নাকাটি করছে। একটা ভীষণ ভয় ভাবনা জাগছে মনে।' এই বলে চণ্ডী চুপ করে রইল। ডিম্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ভয় ভাবনা, কিছু বললে না যে।' চণ্ডী নীচু গলায় বলল, 'মিনুবাইয়ের তো টি. বি. হয়েছিল। এখন ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ভয় ঢুকেছে মনে। বাসাটা বদলাতে হবে।'

ডিম্বেশ্বর বললেন, 'ঠিকই বলেছো। কিন্তু কোয়ার্টার-এর খুবই অভাব—জানো তো? লেবার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর কাছে দিস্তা দিস্তা দরখাস্ত আসছে। বিবাহিতদের ব্যারাকে কোনো ঘর খালি নেই, অবিবাহিতদের ওখানেও তথৈবচ। কিছু কিছু লোক দেখি দোকান কিম্বা গ্যারেজ-এর বারান্দায় পড়ে থাকে। ঘর ছাড়তে পারো, কিন্তু ঘর পাওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে বরঞ্চ এই ঘরটাকেই ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে বীজাণুমুক্ত করে নাও। আমি ডাক্তারকে এ বিষয়ে বলব।'

চণ্ডী জবাবে বলল, 'লাইসল দিয়ে ধুলেই অসুখ বুঝি করবে না। তৎসত্ত্বেও অসুখ হতে পারে। ডাক্তার কি বলেছেন—জানেন?

'কি?'

'পুষ্টি ঠিকমতো যদি না হয়...' কথাটা সম্পূর্ণ না করেই চণ্ডী ভিতর বাড়িতে চলে গেল। হাজারিকার মুখ বিষাদে ভরে গেল। সিগারেটে টান দিতেও তিনি ভুলে গেলেন। হঠাৎ চ্যাটার্জি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছুটির কি করলে, চণ্ডী?'

'ও তাই তো।' বলে চণ্ডী ফিরে এল। বলল, 'আমার তো এগারো দিন ছুটি নিতে হবে।'

'অসম্ভব! তোমার ছুটি বোধহয় বছরে চোদ্দ দিন মাত্র। চৌদ্দ দিন থেকে চার দিন এখনো বাকি—পেলে চার দিনের মাত্র ছুটি পাবে।' চ্যাটার্জির এই কথা শুনে চণ্ডী বলল, 'পুজোপরবে, কাজেকর্মে, শ্রাদ্ধশান্তিতে—কোনো কিছুতেই ছুটি নেই। সায়েবরা কেবল ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কাজ আদায় করে। মিনু তো সেইজন্যই বলত এই রাক্ষসের দেশ ছেড়ে, নিজেদের দেশ গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি আর ভালো হত? ওই একই কথা। ...সায়েবরা কিন্তু অনেক বেশি ছুটি পায়।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেবল ছুটি কেন? চিকিৎসা, আরাম, মোটা মাইনে...'

বিরক্তিভরে ডিম্বেশ্বর মুখের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'তবুও তো মানুষ সব সহ্য করে থাকে এখানে। এইসব মূঢ় মূক মানুষগুলো এল কোত্থেকে?'

বাইরের দিকে নজর পড়াতে দেখা গেল জলের কলের সামনে নারীপুরুষের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। কে আগে জল নেবে, কে পরে—এই নিয়ে কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি। দুটো ব্যারাক-এর মধ্যে একটিই মাত্র জলের কল। সকাল সন্ধ্যায়

প্রতিদিনই এই রকম চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি হয়। এই দৃশ্য দেখে তিনজনই চুপ। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল আকাশ থেকে।

দুই

দোলযাত্রার আর বেশি দিন নেই। মজুরেরা একজোট হয়ে আলোচনা করতে লাগল উৎসবের কী আয়োজন করবে, কেমন করে করবে। ইতিমধ্যে আর একটা সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। কোম্পানীর বিদেশী ও ভিন্ন ধর্মীয় সায়েবরা হিন্দু-মুসলমানদের কোনো স্থানীয় ধর্মানুষ্ঠানে বা পালপার্বণে মজুরদের ছুটি মঞ্জুর করে না। কাজে না গেলে মাইনে কাটা যায়। হিন্দু দোলযাত্রায় ছুটি পায় না, মুসলমানেরা ঈদে। সায়েবদের নিজেদের পর্ব বলে খৃষ্টানেরা বড়দিনের ছুটি পায়। কিন্তু কোম্পানীতে যে ক'জন খৃষ্টান কাজ করে তাদের আঙ্গুলে গোনা যায়। চণ্ডী আহিরের কোয়ার্টার-এর সামনে একটা প্রশস্ত ময়দান। সেখানেই মজুরদের সভা। দূরে সেই অশত্থ গাছটার তলায় ঝরাপাতায় ভরা একটুকরো জায়গায় পড়ে আছে সেই কুষ্ঠরোগীটা· তার প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। সভায় অনেকে আছে—চণ্ডী, চ্যাটার্জি, বরুয়া ও আরো অনেকে।

মিনুবাইয়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। দুর্গাও হাসপাতালে কাজ পেয়েছে—এম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ। সুতরাং শোকদুঃখ সত্ত্বেও চণ্ডী অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাহলে কি হবে? শ্রাদ্ধশান্তির সময় ও যে ছুটি নিয়েছিল, এখন পর্যন্ত তা মঞ্জুর হয়নি। সেইসব দিনের মাইনে ও পাবে কি না সন্দেহ। বরুয়াকে চণ্ডী কানে কানে বলছিল, 'দুপুরবেলা কী হয়েছিল, শুনেছেন তো?'

'কী হয়েছিল?' বরুয়া জিজ্ঞেস করলেন।

'মেথর, ঝাড়ুদার ও খনি-মজুরদের দরখাস্ত টাওলার সায়েব নামঞ্জুর করেছে। বলেছে কোয়ার্টার দিতে পারবে না।'

বরুয়া হাসলেন, 'শুনেছি। এ আবার নতুন কথা কি? নতুন কিছু খবর থাকে তো বলো।'

চণ্ডী ফিসফিস করে বলল, 'আছে।'

'কি?'

'সায়েব বলেছে—মজুরদের উসকিয়ে দিয়ে কারা নাকি নিজেদের পাতে ঝোল টানতে চাইছে।' চণ্ডী গম্ভীরভাবে জবাব দিল। কথা বলতে বলতে বরুয়ার দিকে তাকাল চণ্ডী। বরুয়া হৃষ্টপুষ্ট লোকটা—পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে লাল, মুখে সবসময় একটা সন্তোষের হাসি। একটা খাকি ট্রাউজার ও হাফসার্ট পরনে, পায়ে

একজোড়া কালো রঙের ডার্বি জুতো। কাজের জায়গা থেকে সোজা এসেছেন মীটিং-এ। চণ্ডীর কথা শুনে বরুয়া উঠে পড়লেন। ট্রাউজারের পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে একখানা পান মুখে পুরলেন। তারপর চলে গেলেন মাঠের এক ধারে। সেখানে আসনপিঁড়ি বসে চণ্ডীকে ডাকলেন, 'চণ্ডী, এখানে এসো। এখানেই কথাবার্তা হোক।'

বেশ সাফসুতরো জায়গাটা, ফুঁ দিয়ে নিলে ভাত খাওয়া যায়। চণ্ডী বরুয়ার কাছে বসে বলল, 'এখানে কথা বলাই ভালো, অন্য জায়গায় কে না কে শুনতে পাবে! শুনেছেন, সায়েব না কি বলেছে মজুরদের মধ্যে য়ুনিয়নওয়ালা কেউ ঢুকে তাদের উশকানি দিচ্ছে '

বরুয়া চণ্ডীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। সূর্যাস্তের শেষ আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবুজ মাঠটা। সেই স্নিগ্ধ শোভা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মাঠের উত্তর দিকে, নূতন করে সাজানো একটা বাগানের শান্ত পরিবেশে ছোট্ট একটি বাসা। সেই বাসাতে থাকে তার নূতন বিয়ে করা বৌ—ধীর শান্ত। বৌ তাকে ভালোবাসে খুব—এখন হয়তো তার আসা-পথের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে আছে। হরি-সংকীর্তনের চত্বরে এখন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবার সময় হল। দুর্গাবাড়ীর সার্বজনীন নামঘরটায় কীর্তনমণ্ডপের দেখাশোনার ভার বরুয়ার উপর।

বরুয়া চুপ করে আছেন দেখে চণ্ডী জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছেন বরুয়াবাবু?'

'না কিছু না।' এই বলে পান চিবোতে চিবোতে বরুয়া বললেন, 'এইসব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। স্বাধীনতার জন্যে দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে। সেই জন্যেই সায়েবরা আজকাল খুব সাবধান। ওরা বললেই হল? কে এসেছে মজুর ক্ষেপাতে?

ওদিকে সভার কাজ শুরু হল। সকলে আসছেন সভাস্থলে—মালা সিং, প্রধান, ডিম্বেশ্বর, ইসমাইল, অ্যাইমা, বোধন আরো অনেকে। এদের সকলেরই যে দোলযাত্রার ছুটি দরকার এমন নয়। প্রত্যেকেই চায় আপন আপন পালা পরবে ছুটি পেতে। ঈদ, পূজা, নানকের জন্মদিন, বুদ্ধের জন্মতিথি—কোনো উপলক্ষেই ছুটি মেলেনা। যদি কেউ কাজে না আসে তাহলে মাইনে কাটা যায়। শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়াকর্মেই ছুটি নেই। দিন মজুর হিসাবে কাজ করে যারা, তাদের বছরে মাত্র চোদ্দ দিন ছুটি আর মাস হিসেবের যারা, তারা পায় ত্রিশ দিন। এই ছুটির সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ পালাপরবের ছুটি যোগ করে নিতে চায়। ছুটি চাইলে সায়েব বলে বার মাসে তেরো পার্বন উপলক্ষে লোকে যদি ছুটি নেয় তো কাজের ক্ষতি হবে, কোম্পানীরও তাতে লোকসান। লোকে সে কথা মানবে কেন? তারা বলে—সায়েবরা খৃষ্টান, বড়দিন যখন আসে উৎসব নিয়ে তারা পাগল হয়ে যায়। ছুটি সায়েবদেরই বেশি। মজুরদের বেলাই আলাদা নিয়ম হবে কেন? আবার কেউ কেউ বলে—সায়েবরা ভিনদেশী, তাদের ধর্মও ভিন্ন, তারা কেমন করে এই

দেশের লোকেদের ভালোমন্দ বুঝবে ? ওদের আছে রাজ্য, তাই ওরা চায় শাসন করতে, ওরা চায় টাকা পয়সা, ধন দৌলত, নাম যশ।

দোলের ছুটি উপলক্ষ মাত্র—সভার আসল লক্ষ হল মজুরদের পালাপরবে ছুটির জন্য দাবী করা। কিন্তু আলোচনা শুরু হল যখন, দেখা গেল ওই একটি বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা গেল না। নিজেদের মনের কথা বলবার সুযোগ মজুরদের এই প্রথম। কেউ বলল ঘরবাড়ির কথা, কেউ জল-কলের, কেউ ছাঁটাইয়ের কথা। অনেক উড়ো খবর মজুরদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে—কে যেন বলেছে, ময়লা তেল পরিষ্কার করার জন্য শক্তিশালী রিফাইনারী যন্ত্র আমদানী করবে কোম্পানী। সে-যন্ত্র বসালে কম সময়ে বেশি তেল পরিষ্কার করা যাবে—কিন্তু তার ফলে বহু লোক বরখাস্ত হবে। খনির মজুরেরা শুনেছে বিলেত থেকে নূতন ধরণের কী যেন ড্রিলিং মেশিন আনবে। তখন অনেকে ছাঁটাই হবে। এই সব কথা ছাড়াও অন্য অনেক জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে, যেমন রিফাইনারীর উদ্‌বৃত্ত গ্যাস সায়েবরা নাকি পাইপের ভিতর দিয়ে নিজের নিজের রান্নাঘরে নিয়ে যাবে এবং রান্নাবান্না হবে গ্যাসের আগুনে। এই খবর শুনে মজুরেরা বলেছে, 'যত সব সুখসুবিধা কেবল সায়েবদের জন্য, আর আমাদের কপালে কেবল দুঃখ দারিদ্র্য।'

সভার কথাগুলি গুঞ্জনধ্বনির মতো বরুয়াদের কানে আসছিল। চণ্ডী বলল, 'শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারে ছুটি চাইবার জন্যে আমি টাওলার সায়েবের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু মঞ্জুর করল না। আহমদ সাহেব পরে আমায় ডেকে বলেছিলেন, সায়েবের সঙ্গে কথা বলতে কেন এসেছিলি ? সায়েব খুশী হননি। সায়েবের খুশি আর মুসলমানের মুরগী পোষা—একই কথা। খুশি-অখুশির কোনো মানে আছে ? সায়েবের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিফাইনারীর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলাম। লেবার অফিসে যেতে তাই আমার একটু দেরি হল। দেখলাম, জিলাপসী সাহেব অপেক্ষা করছে! বাঘের মতো চাউনি। হাজিরা রেজিস্টারে একবার চোখ বুলাল। এক বেলার হাজিরা কাটা গেল। আসবার সময় ইসমাইল বলল, সায়েব নাকি রাগে জ্বলছে—আমার ওপর রাগ।'

চণ্ডী একটু সহানুভূতি পাবার জন্য বরুয়ার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু দেখল বরুয়া এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। চণ্ডীও তাকাল। দেখল সায়েবরা কয়েকজন তাদের ঘোড়া থামিয়ে মীটিং-এর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। মীটিং-এর আসরটা বসেছে চণ্ডীর বাসার ঠিক সামনে। আলোচনার গুঞ্জন যেন হঠাৎ কমে গেল। তেজী ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সায়েবরা লাগাম টেনে আরো কিছুক্ষণ নজর রাখল মজুরদের সভাটার উপর। কিছুক্ষণ সেইভাবে কাটল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে সায়েবরা চলে গেল। ঘোড়াগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জনের আওয়াজটাও বৃদ্ধি পেল।

চণ্ডী জিজ্ঞেস করল, 'সায়েবরা কি দেখছিল ?'

বরুয়া জবাব দিলেন না। তাঁর চোখেও কৌতূহল।

চণ্ডী বলল, 'এর চেয়ে পূপরীর দেশগাঁয়ের বাড়িতে বেশি সুখে ছিলাম। আমাদের গাঁয়ের জমিদার ছিলেন এলাহাবাদের লোক। কদাচিৎ কখনো আসতেন জমিদারী দেখতে। তদারকী করত স্থানীয় জোতদারেরা। তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু এখানে সায়েবের সঙ্গে কথাটাও বলা যায় না। জমিদার পালাপার্বন মানে, সায়েব মানে না।'

বরুয়া চণ্ডীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে গাঁয়ের সুখ নেই বটে, কিন্তু ইঞ্জিন চালানোর সুখটা আছে।'

'সে কথা সত্যি।' চণ্ডী বলল, 'রিফাইনারীতে একবার ঢুকলে পর আর সব কিছু ভুলে যাই। মনে হয় আশ্চর্য এই যন্ত্র।' তার পরেই বলল, 'এখানে যন্ত্র আছে, বিজলী বাতি আছে, দোকান আছে, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের মমতা নেই। ধর্ম নেই। দুর্গা চাকরী করছে কিন্তু সেই সঙ্গে মদ মুরগী খেতে শুরু করেছে। আর প্রধানের মেয়েটির সঙ্গে...শুনেছেন নিশ্চয় ?'

মুচকি হেসে বরুয়া বললেন. 'সে আবার শুনব না ? হেন কাজ নেই যা দুর্গার অসাধ্য, অবশ্য ওদের দু'জনের জাত আলাদা।'

'খুব যে তফাত আছে—তা কিন্তু নয়। আমরা কায়স্থ আর প্রধানেরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু ওরা নেপালী আর আমরা মজঃফরপুরী।'

বরুয়া হাসতে লাগলেন। চণ্ডী ক্ষুন্ন হল। বরুয়া বললেন, 'শুনলাম পান্নুর বিয়ে দিতে চাও ?'

'হাঁ। সময়কালে বিয়ে যদি না দিই, ভয় হয় পাছে বোধনের মেয়ের দশা হয়। কিন্তু পান্নুর বিয়ে নিয়েও অনেক বাধা। ও চায় না রামুকে বিয়ে করতে।' ঝোড়ো বাতাস লাগছে ওর গায়ে। হাফ প্যান্ট্-এর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে চণ্ডী বলল, 'রামু না কি আধ-বয়সী। লেখাপড়া বেশি করেনি। পান্নু তো আহমদ সাহেবের ভাগ্নীর কাছে পড়াশুনো করে। মেয়েছেলের পড়াশুনো করে কি হবে ? সোনা আর শেখরকে সামলাবার কেউ নেই। রাত্তিরে ওদের নিয়ে আমার মুশকিল হয়। দুটোই রোগা হয়ে যাচ্ছে। পান্নু দুপুরে বাড়ি থাকেনা, আধ ঘন্টার জন্যে ও পড়তে যায়।'

'সে তো ভালো কথা।' বরুয়া বললেন, 'আমার ঘরের লোকটি তো পড়ব পড়ব বলেও পড়তে পারেনা। পান্নুর সাহস আছে।'

চণ্ডী বিষন্ন হয়ে বলল, 'পড়ে পড়ে যদি বাড়ী বসেই বুড়ী হয়।'

বরুয়া বললেন, 'সে ওর কল্পনার কথা। বিয়ের যোগ্য ছেলে কি একটা মিলবেনা ?'

চণ্ডী বিড়িতে টান দিয়ে জবাব দিল, 'কপালের কথা বলছেন, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। ভগবান তাতে একটা সই দেন মাত্র। যেমন সই দেন সায়েবরা। পান্নুর যা বয়েস, এখন ওর পুরুষ মানুষ দরকার। সেই জন্যেই বলেছিলাম রামুকেই বিয়ে কর। কিন্তু বাপের কথা কোন্ মেয়ে শোনে আজকাল ? মাঝে

মাঝে দেখি ইসমাইলের সঙ্গে একটু বেশি যেন ভাব। দেখে খুব সন্দেহ হয়। ইসমাইল আমাদেরই দেশগাঁয়ের লোক। সেই সূত্রে ওর পান্নুর সঙ্গে ভাব। এতে অবশ্য ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ নেই। ইসমাইল ছেলেটা খুব ভালো।'

বরুয়া বললেন, 'পান্নুর জন্যে এত মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? কিছু একটা নিশ্চয় হবে।'

ইতিমধ্যে মীটিং শেষ হল। মজুরেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। ফুটবল খেলার শেষে দর্শকেরা যখন দলে দলে চলে যায়—দৃশ্যটা অনেকটা সেই রকম। সভায় যারা এসেছিল তাদের দিকে ওরা দু'জন সাগ্রহে তাকিয়ে রইল। ওদের সুমুখ দিয়ে যে-সব লোক চলে গেল, তাদের সকলের শেষে চলছিলেন চ্যাটার্জি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাথরের মূর্তি—মুখে কথা নেই।

বরুয়া ডাকলেন, 'চ্যাটার্জি! এদিকে চলে আসুন।'

ট্রাউজার, কাবুলী চপ্পল ও মার্কিন কাপড়ের একটি শাদা সার্ট, চোয়ালের হাড় দেখা যায়—চোখে চশমা। বরুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জি অভিযোগের সুরে বললেন, 'আপনারা এখানে বসে থেকে বড়ো অন্যায় করেছেন। সভায় কথা বলার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। একমাত্র ডিম্বেশ্বরবাবুকে দেখলাম খাঁটি মানুষ—মানুষের মতো মানুষ। যা ভালো বোঝেন তাই করেন। তিনি ছিলেন বলেই কোনো প্রকারে একটা প্রস্তাব পাশ করানো গেল।'

চণ্ডী জিজ্ঞেস করল, 'প্রস্তাবটা কী?'

চ্যাটার্জি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'বিশেষ বড়ো কোনো প্রস্তাব নয়। পালাপার্বনে ছুটি চাই।' চ্যাটার্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজকের মতো এইটুকুই যথেষ্ট।'

বরুয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, শুধোলেন, 'এর পর আরো কিছু হবে নাকি, চ্যাটার্জি।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'হওয়া তো উচিত। আশা করি য়ুনিয়ন হবে। তারপর আমাদের মজুরদের প্রাথমিক দাবীগুলো আদায় করার জন্য সায়েবদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এইসব কথাগুলো আপাতত আমার মাথার মধ্যেই আছে। শুনছি, খনি মজুরেরা বরখাস্ত হতে পারে।'

কথাটা সবাই শুনেছে। সুতরাং কোনো জবাব দেবার দরকার ছিল না। সভাতেও কথাটা কেউ ওঠায় নি। যে-কোনো মুহূর্তে খনি মজুরেরা কাজ বন্ধ করতে পারে। তাদের অভিযোগ অনেক। সপ্তাহান্তে ছুটি নেই, শিফট্-এর কিছু ঠিক নেই, কোয়ার্টার নেই। উপরন্তু খনিতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো বরাদ্দ করেনা। আজ ওরা সদলবলে টাওলার সায়েবের কাছে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁইয়ের কথা বলতে গিয়েছিল। সায়েব বলেছে, কোম্পানীর টাকা নেই, ঘর দিতে পারবেনা। দেরি করে কাজে যাবার দরুণ ওদের হাজিরাও কাটা

গেল। ফলে ওদের মনের মধ্যে চাপা অসন্তোষ, যে-কোন সময়ে কাজ বন্ধ করতে পারে।

সর্বনেশে খবর। ওরই মধ্যে আশার বাণী শোনালেন একমাত্র ডিম্বেশ্বর। চ্যাটার্জি বললেন, 'ডিম্বেশ্বরবাবুই বললেন খনি মজুরদের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হয়েছে। লোকে ছেড়ে কথা কইবে কেন? কথা না বলে উপায় কি? কিন্তু আপাতত সব যেন অন্ধকার দেখছি। কাল ঠিক বুঝতে পারা যাবে।'

এক নজর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চ্যাটার্জি বললেন, 'সন্ধ্যায় গোস্বামীদের আসার কথা আছে। তাঁদের সঙ্গে কথাটা ভালো করে আলোচনা করা দরকার।'

গোস্বামীর নাম শুনে বরুয়া বললেন, 'হাঁা, তিনি সুপরামর্শ দিতে পারবেন। আমার শ্বশুর তো বলেন যে গোস্বামীর মতো গুণী মানুষ এ পর্যন্ত এ দেশে জন্মায়নি।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ, গোস্বামী বলছিলেন বটে আপনার পরিবারকে চেনেন। আপনার শ্বশুর কি জেল থেকে বেরিয়েছেন?'

বরুয়া বললেন, 'হাঁা, অসুখের জন্য খালাস করে দিয়েছে।'

চণ্ডী বিষণ্নভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কি এখানে য়ুনিয়ন গঠন করার লোক সত্যিই আসবে?'

চ্যাটার্জি বললেন 'হ্যাঁ'। একটু পরে বললেন, 'গোস্বামীর সঙ্গে বাইরের কোন্ একজনের যেন আসবার কথা। য়ুনিয়ন করার জন্য নয়। য়ুনিয়ন করতে হবে আমাদের নিজেদেরই। তা না হলে আপন খুশিতে সায়েবরা কিছুই দেবে না। শুনলাম চণ্ডীকে না কি ছুটি দেয়নি?'

'ঠিকই শুনেছেন।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চণ্ডী বলল, 'মরা মানুষের শ্রাদ্ধশান্তিতেও ছুটি দেয় না। এরকম বিধর্মী মালিক আর কোথাও দেখা যায় না।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেবল কি তাই। কেরানীরা বছরে ছুটি পায় ত্রিশ দিন, আর মজুরেরা মাত্র চোদ্দ দিন। ন্যায্যত আমাদের যে ছুটি পাবার কথা, আমরা পাই না। আমাদেরও ত্রিশ দিন ছুটি হওয়া উচিত। সায়েবরা ফার্লো পায়, অসুখবিসুখে সিক্ লিভ্ পায়, বড়দিনের ছুটি পায়। কেবল আমাদের বেলা কিছু নেই।'

বরুয়া বললেন, 'কিছু একটা না করলেই নয়। তা না হলে ভুগতে হবে।'

তারপর সবাই চুপ—কারো মুখে কথা নেই। সেই অশত্থ গাছের তলার অচেনা অজানা কুষ্ঠরোগীটার কাতরানি ভেসে এল ওদের কানে। ওর কান্না শুনে মনে হল যন্ত্রণাজর্জর বহু লোকের বেদনা গুমরে উঠছে ওর কাতরানিতে। লোকটা কেবলি কেঁদে চলেছে, 'মাগো, মাগো, মাগো, মা—গো, মা—গো, মা—গো!'

তিন

জেবউন্নিসা স্নান প্রসাধন সেরে বাংলো বাড়ির পিছন দিকের টিলার তলায় পুকুরের পারের ছোট্ট তার 'একঘরে' বাসা থেকে বেরোল। বিষণ্ণ মনে একটু একটু করে টিলার গায়ে খাঁজকাটা সিঁড়ি একটা একটা করে পেরিয়ে, উঠল গিয়ে বাংলো বাড়িতে। এই সিঁড়ির রাস্তা বেয়ে, আগেকার কালে একাধিক অভিসারিকা এমনি করে রাত হবার আগে থাকতে উঠে যেত আর নেমে আসত রাত কাবার করে সকাল বেলা। কিন্তু জেবউন্নিসার পায়ে পায়ে যেমন অনিচ্ছা ও অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছিল তেমনটা তাদের বেলা ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। অন্য রাতের মতো আজো জেবউন্নিসার পরণে ঝিলমিলে রেশমের শাড়ি, গায়ে টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ, অমাবস্যার অন্ধকারের মতো একমাথা চুলের খোঁপায় বাংলোর বাগান থেকে তোলা সদ্য প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ ফুল। চোখের কাজলে চোখের বিষাদ ঢাকা পড়েনি, মনের বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত কপালের রেখায়, অন্তরের বেদনা যেন বেরোতে চায় দীর্ঘশ্বাসে।

বাংলোর পিছন দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি পেরোলেই খিড়কি দরজা। দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটা প্রকাণ্ড আলসেশিয়ান্ এগিয়ে এসে নীরবে লেজ নাড়িয়ে ওকে অভ্যর্থনা করল। ভিতরে কেমন যেন শুনশান। অন্যদিন এ সময়ে জিলাপসী সায়েব মদের বোতল নিয়ে জেবউন্নিসার অপেক্ষায় ড্রইংরুমে বসে থাকে। ও এলে পর ওকে কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ড্রইংরুমে ঢোকে। ডিনার সারতে লাগে কমসে কম ঘণ্টাখানেক। ততক্ষণ কুকুরটার সামনে ও চুপ করে বসে থাকে। তারপর সায়েবের বাবুর্চি নাসিরুদ্দীন ওকে ডেকে নিয়ে যায় নিঃশব্দ শয়নকক্ষে। ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে চলে যায়। তখন ও কাছের থেকে দেখতে পায় সায়েবকে। অন্য সময়ে ও বাবুর্চি খানসামা ঝি-চাকরদের একজন।

সায়েব ওকে ভালোবাসে বলে অন্যেরা ওকে খারাপ চোখে দেখে। সেদিন চণ্ডী তার প্রতি যেরকম ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, তাই থেকে ও বুঝতে পেরেছিল সমাজ ওকে কি মনে করে। তার পর থেকেই এই অভিসারের প্রতি ওর এত অনিচ্ছা ও অসন্তোষ। ওর ইচ্ছা হয়েছে এই ঘৃণ্য জীবন পরিহার করে কোনো প্রকারে একটা পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করা। এই জন্য সে বড় সায়েবের বাংলোয় বড় সায়েবের ছেলেমেয়েদের গভর্নেস একজনের কাছ থেকে লুকিয়ে একটু একটু ইংরাজী শিখতে শুরু করেছিল। মা বেঁচে থাকতে ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিল। সায়েবদের সংস্পর্শে আসার ফলে ইংরাজীতে সে বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। সরল ভাষায় লেখা ইংরাজী বই বেশ গড় গড় করে পড়তেও শিখেছিল।

সায়েবের দেখা না পেয়ে খুব খুশি হল জেবউন্নিসা। বারান্দা থেকে ডাকল বুড়ো নাসিরুদ্দীনকে, 'দাদাজান, কোথায় তুমি... ?'

বাবুর্চিখানা থেকে বুড়ো জবাব দিল, 'এই যে এখানে। চলে আয়...'

এক দৌড়ে জেবউন্নিসা সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে, ঢুকল গিয়ে বাবুর্চিখানায়। সেখানে গিয়ে দেখল একটা ছোট টেবিলে নাসিরুদ্দীন ভাত বেড়ে খেতে বসেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খাবি না কি ?'

জেবউন্নিসা বাড়ি থেকে আজ কিছু খেয়ে আসেনি। খিদে তার পেয়েছিল, বলল, 'হ্যাঁ খাবো।' নাসিরুদ্দীন বলল, 'তাহলে ওই মিটসেফ্-এর ওপর থেকে থালা একখানা নিয়ে আয়। খাবার জিনিস সব রয়েছে ওই টেবিলটার ওপর। আজ কিছুর অভাব নেই। সায়েব ফোন করে জানিয়েছে আজ রাতে আসবে না।'

জেবউন্নিসা খবর শুনে খুব খুশি হল। থালা একখানা নিয়ে টেবিলের পাত্র থেকে তুলে নিল ভাত, মাংস। তারপর নাসিরুদ্দীনের ছোট টেবিলের এক পাশে বসে খেতে লাগল। শুধোল, 'সায়েব আজ তা হলে ফিরছে না তো ?'

'না, ফিরছে না।'

'কেন ?'

'হাজার খানেক খনিমজুর হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বাজারে ইসমাইলের সঙ্গে দেখা—সে-ই খবরটা দিল। সায়েবরা সারা রাত ধরে এই কথা আলোচনা করবে। ওখানেই খাবে—অফিসে।' নাসিরুদ্দীন খুশি হয়ে বলল, 'আজ রাতটা অন্তত মনের সুখে ঘুমোতে পারব। তুই থাকবি, না যাবি ?'

জেবউন্নিসা জবাব দিল, 'দাদাজান, আজ আর তোমায় ঘুমোতে দেব না। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

নাসিরুদ্দীন বাঁ হাতে গোঁফে তা দিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'তুই আজ দেখছি ভারি বেজার। কী হয়েছে তোর ? চণ্ডীর বৌ মারা গেছে বলে কি ? মানুষটা তোকে খুব ভালোবাসত।'

এক গ্রাস ভাত হাতে তুলে জেবউন্নিসা বলল, 'মিনুমামীর কথা আলাদা। চণ্ডীমামা কিন্তু আমায় সোনাকে কোলে নিতে পর্যন্ত দিলেন না। এত ঘেন্না! সকলের চোখের সামনে আমায় অপমান করলেন। হাজার হোক আমি তো ওঁর ভাগনী হই।'

নাসিরুদ্দীন একদৃষ্টে জেবউন্নিসার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর দুঃখ আমি বুঝি।' সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর বলল, 'নে, এখন খেয়ে দেয়ে নে। বাইরে ঘরে বসে তোকে তোর জন্মের কথা বলব—সে এক বিচিত্র কাহিনী।'

নাসিরুদ্দীন আঁচিয়ে বলে গেল জেবউন্নিসা যেন বাসনকোষন সব মেজে ধুয়ে রাখে। তারপর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল ড্রইংরুমে। সেখানে মেঝের উপর লাল রঙের পুরু কার্পেটের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল জেবউন্নিসার। একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখল শূন্য সোফা চেয়ারগুলো, দেয়ালের গায়ে একটা হরিণের মাথা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। এবার চোখ পড়ল

মেহগনি কাঠের একটা সূক্ষ্ম কারুকার্যযুক্ত রিভলভিং টেবিলের ওপর রাখা একটা পিতলের থালার ওপর। থালায় নানা রঙের খাবার। খাওয়া দাওয়া শেষ করে জেবউন্নিসা ওকে এই অবস্থায় দেখে, জিজ্ঞেস করল, 'পাথরের মধ্যে কী দেখছো, দাদাজান?'

নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই পাথরগুলো এখানে রয়েছে সেই প্রথম যখন বাংলো বাড়ি তৈরি হল তখন থেকে। জিলাপসী সায়েবের আগেও যেসব সায়েব এ বাংলোয় ছিল, কেউ ওই থালাখানা সরায়নি। পাথরগুলো জড়ো করেছিল ফিলিপস সায়েব। অদ্ভুত ছিল সায়েবটা। সারাদিন টোঁ টোঁ করে ঘুরত পাহাড়ে জঙ্গলে, সন্ধ্যেবেলা বাংলোয় ঢুকত শিকার করা পাখ-পাখালি হরিণ-টরিণ নিয়ে। তখন আনত এইসব নানা রঙের পাথর। শিকারের মাংস দিয়ে আমি খাজা তৈরি করে দি, তারপর জিলাপসী সায়েবের মতো চাইত মদ ও মেয়েমানুষ। তখন ওকে মনে হত শয়তান।'

এইসব কথা শুনে জেবউন্নিসার ভালো লাগছিল না। ড্রইংরুমের মাঝখানের টেবিলের ওপর মদের বোতল ও গেলাস। সোফা, কার্পেট, আর কাছেই পুরু পর্দাটা সরিয়ে দিলেই শোবার ঘর। দেখে ওর সমস্ত শরীর যেন ছাঁৎ করে উঠল। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিহি নেট-এর মশারী আর বকের পালকের মতো ধবধবে শাদা বিছানার চাদরখানা। জেবউন্নিসা চোখে যেন অন্ধকার দেখল, নাসিরুদ্দীনকে বলল, 'দাদাজান, চলো বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসি। সেখানে বেশি ভালো লাগবে। এতক্ষণে হয়তো চাঁদ উঠেছে—আজ তো পূর্ণিমা।

নাসিরুদ্দীনের ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, বরঞ্চ বলল. 'আয়, এখানেই বসি। পাখার বাতাস আছে।- এখানেই কথা হোক। বাইরের বাতাস ঠাণ্ডা হলে তখন বারান্দায় গিয়ে বসব।'

'কী কথা?' নাসিরুদ্দীনের সামনে একটা চেয়ারে বসে, পায়ের দিকে শাড়িটা সাপের মতো মেলে দিয়ে, জেবউন্নিসা বলল, 'বলো'।

নাসিরুদ্দীন বলল, 'ফিলিপস সায়েব রেখেছিল তোর মাকে। এই রূপে সেও আসত রাত্তিরে। অপূর্ব সুন্দরী ছিল তোর মা। কিন্তু...'

এসব জেবউন্নিসার জানা কথা। কিন্তু আজ মায়ের নির্যাতনের কথা শুনে ওর সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলেপুড়ে উঠল, বলল 'এ আর আমার সহ্য হয় না দাদাজান। মায়ের সঙ্গে সায়েবরা যা করেছিল, আমার সঙ্গেও তাই করছে, আমার মেয়ে হলে হয়তো তার সঙ্গে এই রকমই করবে। তাকেও সমাজের লোক ঘৃণা করবে—ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয়।'

নাসিরুদ্দীন অভ্যেস মতো গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'তোর রাগ দেখে আমার ভালোই লাগছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সায়েবদের ব্যবহারে কখনো কি প্রতিবাদ করেছিস?'

'না, করিনি। আমি প্রতিবাদ করব কী করে?' জেবউন্নিসা দু'হাতে মুখ ঢেকে



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'চণ্ডীমামা আমায় ছুঁতে পর্যন্ত দিলেন না সোনাকে, আমি এতই ঘৃণার পাত্রী। অথচ মিনুমামী বেঁচে থাকতে কখনো তো আমায় ওভাবে বলেনি।'

'কাঁদিসনা। ক্ষান্ত দে। দুঃখ করে লাভ নেই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ তোর সাথী। ফিলিপস সাহেব তোর মাকে একটুও সুখ দেয়নি। কেবল তোর মুখ চেয়ে মা তোর বেঁচে ছিল।... তারপর একদিন আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে বেচারা বেহেস্ত চলে গেল...।' নাসিরুদ্দীন বলল।

জেবউন্নিসা চোখের জল মুছে রাগতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তবে—তাহলে কী করে তুমি আমায় এই লোকটার হাতে তুলে দিলে?'

নাসিরুদ্দীন অবাক বিস্ময়ে—জেবউন্নিসার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ক্ষুণ্ন হয়ে বলল, 'দেখ, আমি তো সায়েবের বাবুর্চি। তোর রূপ যখন আর ঢাকা গেল না, তোর দেহ যখন শিকারের হরিণের মতো সুন্দর সুঠাম হল, তখন আমার কী সাধ্য সায়েবকে বাধা দি। উপরন্তু ফিলাপসী সায়েবটা একটা জানোয়ার। তা না হলে আমার ইচ্ছা ছিল...।' নাসিরুদ্দীনের চোখে জল এল। পাছে জেবউন্নিসা দেখতে পায় সেইজন্য সে চট করে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। সেখান থেকে ডাকল, 'জেবু। এখানে চলে আয়। চাঁদ উঠেছে। এমন সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ বহুকাল দেখিনি। বাতাসও দিচ্ছে .।'

জেবউন্নিসা বাইরের বারান্দায় নাসিরুদ্দীনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুড়ো বলল, 'এই শহর থেকে ধর্ম কবে যে পালিয়েছে তার ঠিক নেই। লখনউ শহরে যখন ছিলাম তখন পুরাতন নবাব পরিবারের কারো কারো বাড়িতে যাওয়া আসা করতাম। একদিন ওঁরাও ছিলেন এই হিন্দুস্থানের রাজা-বাদশাদের একজন। ওঁরাও নারী সম্ভোগ করতেন। কিন্তু এদের মতো ছিলেন না। ওঁরা রক্ষিতাকে অনাথিনী করে পালিয়ে যেতেন না বিদেশে। তোর মায়ের কী যেন একটা বদনাম রটেছিল। চণ্ডী ঘর থেকে দূর করে দিলে পর আমার ঘরে এসেছিল আশ্রয় নিতে। সেই হল ওর কাল। ওঁর আগে মেহেরবিবি ছিল সায়েবের রক্ষিতা। মেহেরবিবি কে জানিস?'

জেবউন্নিসা জানে মেহেরবিবি ছিলেন নাসিরুদ্দীনের ধর্মপত্নী। তার পরে ফিলিপস সায়েবের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আত্মঘাতী হয়। তারপরে ফিলিপস-এর হাতে পড়ে ওর মা...। সেই সব জঘন্য কাহিনী শোনবার মতো ধৈর্য তার ছিল না। কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'দাদাজান, সেইসব কথা আর কেন? আমার সহ্য হয় না। পৃথিবী এত দুঃখ সহ্য করতে পারে না।'

নাসিরুদ্দীন নীচু গলায় বলল, 'পারবে না কেন সইতে? পৃথিবীটা হাতীর মতো। যতই বোঝা চাপাও, ঠিক বয়ে যাবে।'. হঠাৎ নাসিরুদ্দীনের গলাটা কর্কশ হয়ে উঠল, 'এই পৃথিবীটাকে দেখে দেখে বিরক্ত লাগে। ভেবেছিলাম...' নাসিরুদ্দীন অস্থির

হয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম তোর বিয়েটা দিয়ে যাব। ইসমাইলের কানেও তুলেছিলাম। কিন্তু...'

জেবউন্নিসা এবার উৎসুক হ'য়ে রেলিঙে হাত দিয়ে বেশ সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তা কি বলল ইসমাইল?' দাদাজান কী জবাব দেয় শোনবার জন্য তার বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপুনী।

'সেই একই জবাব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেবউন্নিসা বলল, 'ইসমাইলও ..?'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'আমায় আর কিছু তোকে বলতে হবে না রে। আমি তো জানি ইসমাইলকে তুই ভালোবাসিস। এই জিলাপসী সায়েব তোর কপাল পুড়িয়েছে।'

জেবউন্নিসা চুপ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাসিরুদ্দীন বলে চলল, 'তো'কে কী করে দোষ দেব? তুই যে জন্ম অপরাধী।'

জেবউন্নিসা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি এখানে আর থাকব না, দাদাজান।'

'কোথায় যাবি?' নাসিরুদ্দীন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'জানিনা। তুমিই বলে দাও কোথায় যাব। তুমি আমার দাদাজান।' জেবউন্নিসা হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আদ্র' হয়ে উঠল, চাঁদ যেন কাঁপতে লাগল আকাশে। নাসিরুদ্দীন অনেকক্ষণ চুপ করে ওর কান্না শুনল, তারপর ভেবেচিন্তে বলল, 'তোর জন্যে কেউ যদি কিছু করতে পারেন, তো তিনি হলেন ডাক্তারবাবু। হাসপাতালে নার্স-এর খুব অভাব। একবার তোর কথা বলে দেখব।' জেবউন্নিসা বলল, আমারো খুব ইচ্ছা নার্স হবার, কিন্তু আমি তো কোনো স্কুলে লেখাপড়া করিনি। ডাক্তার যদি সাহায্য করেন তাহ'লে অবশ্য হয়। কিন্তু আজ তোমাকে বলে যাচ্ছি, আমি আর এখানে আসবনা, মরে গেলেও না। এখানে এলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব। এই বাংলো বাড়িটার প্রতি আমার ঘেন্না হয়।'

চাঁদের আলোয় তার গায়ের রঙটা দেখাচ্ছিল ধুতুরা ফুলের মতো। নাসিরুদ্দীন তাকে বলল, 'তোর শরীরে আছে খৃষ্টানের রক্ত, হিন্দুর মাংস আর মুসলমানের পরিচর্যা। বিচিত্র তোর এই শরীর। তাকে অপবিত্র বলতে মন চায়না। কাল সকালেই যাব ডাক্তারবাবুর কাছে।'

জেবউন্নিসা যেন একটা আশার আলো দেখতে পেল। বলল, 'শুনেছি ডাক্তারবাবু মানুষটা খুব দয়ালু। সম্ভব হলে অন্যদের সাহায্য করেন। মিনুবাইয়ের অনুরোধে দুর্গাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন, দেখেছো তো? স্কুলে না পড়লেও আমার যথেষ্ট শিক্ষা আছে। ডাক্তার যদি দয়া করেন আমার উপকার করতে পারেন নিশ্চয়। আমার খুব ইচ্ছা আমি ভালো হব। দাদাজান, পারো তো আমার জন্যে কিছু করো।

জেবউন্নিসার খোঁপাটা খুলে গেল। কালো নদী একখানা যেন বয়ে গেল তার পিঠের উপর দিয়ে। সায়েবের বাগানে নিমগাছের পাতা বাতাসে নড়ছে। একটা কাঞ্চন গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। নাসিরুদ্দীনের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, কানে বেজে উঠল কোন্ এক দুর্ভাগিনীর কাতর ক্রন্দন। অস্ফুটস্বরে সে বলে উঠল, 'মেহের, মেহের, মেহের।'

জেবউনিন্নসা বলল, 'দিদিমার নাম ধরে ডাকছো কেন, দাদাজান? কী হল?'

'এমনিই।' নাসিরুদ্দীন যন্ত্রচালিতের মতো জবাব দিল।

তার পরে আবার নিস্তব্ধতা।

জেবউন্নিসা খুলে-পড়া খোঁপাটা আবার বাঁধতে লাগল। আকাশের চাঁদটাকে দেখে মনে হল যেন একটা প্রজ্জ্বলন্ত মশাল। নির্যাতিতা নারীর অন্তরে যেন সেই অগ্নিশিখা জ্বলছে। রিফাইনারীর আগুনের আগে যেমন ময়লা তেলকে শোধন করা যায়, তেমনি যেন অনুতাপের আগুনে তার মধ্যে যা-কিছু মলিন সব শোধন হয়ে যাবে, নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। জেবউন্নিসা চায় তাই হোক, দাদাজানও। যেমন করেই হোক তাকে শুদ্ধ হতে হবে, পবিত্র হতে হবে। তা না হলে ইসমাইলের সঙ্গে ঘর বাঁধবে কী করে—ইসমাইলকে সে যে সত্যিই ভালোবাসে।

চার

ভোর হতেই বুড়ো নাসিরুদ্দীন ডাক্তারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির। ডক্টর হাজারিকা বয়োঃবৃদ্ধ বাবুর্চিকে দেখে পরিহাস-রসিকতা করে তাকে সম্ভাষণ করলেন জনাব সাহেব বলে। তার কাছে আদ্যোপান্ত সব কথা শুনে প্রথমে নাক সিঁটকালেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই সদয় হয়ে জেবউন্নিসাকে শিক্ষার্থী নার্স হিসাবে নিতে সম্মত হলেন—অবশ্য ডাক্তার সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষ। জেবউন্নিসা স্কুলে যে পড়াশোনা করেনি তাতে একটু যে বাধার সৃষ্টি না হয়েছিল এমন নয়, তবে সে গভর্নেস্-এর কাছে পড়েছে এই কথাটা তার ভর্তি হবার পথ প্রশস্ত করে দিল। ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সাহেবকে ফোনে পাওয়া গেল এবং ডিব্রুগড়ের মেডিকেল স্কুলে শিক্ষার্থী নার্স-এর জন্য একটা স্থানও পাওয়া গেল। নাসিরুদ্দীন খুশি হয়ে ফিরে যাবে এমন সময় ডাক্তারবাবু বললেন, 'জনাব সাহেব, আরো একটা বিপদ আছে। জিলাপসী সায়েবটা বড় প্রতিশোধপ্রিয় মানুষ, তাকে সামলাবে কে?'

নিরুপায় নাসিরুদ্দীন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে। বাবুর্চি কী করে সায়েবকে সামাল দেবে? 'আমি তো পারবনা, বাবু।'

ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, 'ডিম্বেশ্বরকে বোলো। ওর কথা জিলাপসী শোনে।'

নাসিরুদ্দীন এবার যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বলল, 'এ শহরে কেউ যদি সায়েবকে সামলাতে পারে, তিনি হলেন ডিম্বেশ্বরবাবু।'

নাসিরুদ্দীন বেরোবে, তখন ডাক্তারবাবু আবার একবার তাকে ডেকে বললেন, 'শুনেছো নিশ্চয়, খনিমজুরদের মধ্যে থেকে এক হাজার লোককে ছাঁটাই করেছে। টাওলার সায়েব তাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।'

নাসিরুদ্দীন অবাক হয়ে জবাব দিল, 'আমি তো কিছুই শুনিনি।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'শহরময় হুলুস্থুল লেগে গেছে, এক কেবল তুমিই খবর রাখো না। আশ্চর্য লোক তুমি।' এই কথা বলে ডাক্তারবাবু নিজের কাজে বেরিয়ে গেলেন।

নাসিরুদ্দিনের মনে হল খবর না রাখাটা তার পক্ষে মস্ত অপরাধ। সে অনুতপ্ত চিত্তে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুবই মনমরা ভাব। সোজা গিয়ে মজুর বস্তিতে খোঁজ নিল। যাবার পথে দেখল একটা পুলিশের গাড়ি ছুটে চলেছে। বস্তিতে পোঁছে ইসমাইলকে খুঁজে বের করবে ঠিক করল। নাইট ডিউটি সেরে ইসমাইল তার নিজের ঘরেই ঘুমোচ্ছিল। তাকে জাগিয়ে নাসিরুদ্দীন জিজ্ঞেস করল, 'খনিমজুর কজন ছাঁটাই হল?'

ইসমাইল জবাবে বলল, 'মুসলমান একজনাকেও তাড়ায়নি, অসমীয়াদেরও নয়।' ক'জন ছাঁটাই হল সংখ্যাটা বলতে পারল না। নাসিরুদ্দীন হাসতে হাসতে বলল, 'তোর দেখছি কোনো চিন্তাভাবনা নেই। মুসলমান আর অসমীয়া কাউকে ছাঁটাই করেনি বলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি। ছাঁটাই করা হল যাদের, তারা বুঝি তোর আমার মতো রক্তমাংসের মানুষ নয়। সায়েবদের জাঁতাকলে পড়েছিস। যা ওদের একবার খবর নিয়ে আয়।'

ইসমাইল মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমি যাব না নাসিরুদ্দীন সাহেব। আমি একটু ঘুমোব।'

'তোর দিল না পাথর, ইসমাইল? জেবউন্নিসাকে তোর হাতে সঁপে দিতে চাইলাম, তুই বললি ও নাকি নষ্ট মেয়ে। এখন তোর সঙ্গে কাজ যারা করত, তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে, তুই একটা কথা বলবি না তাদের হয়ে। শুনেছি ফোরম্যান হয়ে তোর নাকি খুব ডাঁট হয়েছে।' এই কথাটুকু বলে নাসিরুদ্দীন দ্রুতপদে ডিম্বেশ্বরের কোয়ার্টারের দিকে চলতে লাগল।

ইসমাইল চোখ দুটো ঘষে আবার সটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ফোরম্যান হয়েছে মাত্র পক্ষকাল হল। পদোন্নতির আনন্দে ও গর্বে মন তার তখনো ভরপুর।

পদোন্নতি হবার পর নাসিরুদ্দীন জেবউন্নিসার কথাটা ওকে বলেছিল, কিন্তু ইসমাইল প্রত্যাখ্যান করল ওর প্রস্তাব।

ডিম্বেশ্বরবাবুর কোয়ার্টার পর্যন্ত সারাটা রাস্তা নাসিরুদ্দীন আপনমনে ইসমাইলকে

কি যেন সব বকাঝকা করছিল। বিছানা থেকে ইসমাইল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বুড়োর দিকে। ওর ঘরের জানালা দিয়ে ডিম্বেশ্বরের কোয়ার্টারটা দেখা যায়।

ডিম্বেশ্বরের কোয়ার্টারে সোজা ঢুকে পড়ল নাসিরুদ্দীন। দেখল, বসবার ঘরে ডিম্বেশ্বর চা খেতে খেতে জেবউন্নিসাকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে আর জেবউন্নিসা জবাবে কি সব যেন বলছে। 'নাতনী যে, তুই কখন এলি ? নাসিরুদ্দীনের মুখখানা আনন্দে উদ্‌ভাসিত।

'আমি বাংলোবাড়ি একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।' জেবউন্নিসা বলল, 'ডাক্তারবাবু কিছু কি বললেন ?' ওর মুখের ভাবে উৎকণ্ঠা, চোখের চাহনিতে আগ্রহ।

নাসিরুদ্দীন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার হুবহু বর্ণনা করলে পর, জেবউন্নিসা ডিম্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল। ডিম্বেশ্বর বললেন, 'ডাক্তারের মাথায় কিছু নেই, তা না হলে এত ভয় করত না। সায়েব আমায় ঘাঁটাবে না। ওকে আমি হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি। সে তোর সঙ্গে ওরকম আর করতে পারবে না। নাসিরুদ্দীন সাহেব, আমার কোয়ার্টারের পিছন দিকে একটা ছোট ঘর আছে, সেখানে ও যতদিন থাকতে চায় থাকুক!' ডিম্বেশ্বরবাবুর কথা মেনে নিতে নাসিরুদ্দীন বাধ্য হল, কেননা তাঁর যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু জেবউন্নিসাকে আশ্রয় দেবার কথা শুনে নাসিরুদ্দীন অবাক, বলল 'ওকে আপনার ঘরে ঠাঁই দিলে লোকে যদি ছি ছি করে!'

'লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করলেই হল।' ডিম্বেশ্বর চা খাচ্ছিলেন তাঁর বসবার ঘরে বসে। কথার ঝোঁকে অতিথিকে বসাবার কথাও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। চা খাবার পর সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তিনি বলে চললেন, 'লোকে কি ভাববে আমি জিলাপসীর দোসর, ওরই মতো লম্পট, বাঁদর ও কাপুরুষ ? লোকগুলোকে তাড়ানোর আগেভাগে সে কেমন চম্পট দিল যদি দেখতে! কত জনাকে কোম্পানী উৎখাত করল জানো ? এক হাজার! তারা স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। কিছু লোককে সেই শকুনিটা ডেকে নিয়েছে—সেই কন্ট্রাকটারটা—যার নাম বীরভদ্র সিং। সায়েবদের ভজিয়ে পটিয়ে দু'হাতে টাকা লুটছে। খনি-মজুরদের দুর্দশা দেখে আজ আমার দু'মুঠো খেতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। অন্যায় ঘোর অন্যায়!' ডিম্বেশ্বরের কথা শুনে জেবউন্নিসা মনে মনে খুশি হল, মনে হল ও যেন বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষের সমাজে।

নাসিরুদ্দীন দুঃখ করে বলল, 'দেখুন তো ইসমাইলটাকে। সে বলছে মুসলমান আর অসমীয়াদের ছাঁটাই করেনি। কদ্দূর নীচমনা হলে এমন কথা বলতে পারে... ।'

'ওর মাথায় কিছু নেই। ওকে ফোরম্যান করে দিয়েছে, ও ভাবছে এখন ও পদস্থ লোক। আমাদের দেশের লোকগুলোকে টোপ দিয়ে গেঁথে ফেলা ভারি সহজ। অন্য দেশ হত যদি আগুন জ্বলত—এই বলে দিলাম নাসিরুদ্দীন সাহেব। এদেশের লোকের সাহস নেই।' ডিম্বেশ্বর সিগারেট টানতে টানতে বলে চলল, 'ওদিকে

চ্যাটার্জিদের আস্ফালনের দিকে না তাকালেই ভালো। বই পড়ে বিপ্লব করতে চায়, বই পড়ে পড়ে সব নিষ্কর্মা হল। ওই যে সায়েবদের দালাল বীরভদ্র সিং বলে লোকটা, সে কি করছে জানো? সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে য়ুনিয়ন করার জন্যে টেরোরিস্ট আসছে, কংগ্রেসী আসছে—আরো কত কি। এ সমস্ত সায়েবদেরই কারসাজি। আসল কথা, কোম্পানী মুনাফা চায় আর এরা চায় চাকরী।' ডিম্বেশ্বর হাসতে লাগল।

জেবউন্নিসা বলল, 'আপনি যান একটু বিশ্রাম করুন। কিছু তো খাননি এখনো।' ডিম্বেশ্বরের বসবার ঘরে দেয়ালঘড়িতে তখন দুটো বাজছে।

ডিম্বেশ্বর শুতে যাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না। সিগারেটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার শোওয়া হবে'খন। তুমি বরঞ্চ ঘরখানা খুলে নাও।' এই বলে বাঁ হাতটা পকেটে চালিয়ে একগোছা চাবি বের করে জেবউন্নিসার হাতে দিলেন। তারপর নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন নাসিরুদ্দীন সাহেব, একটু ঘুরে আসি। এখনো তো আপনার সময় হয়নি ডাক্তারের ওখানে যাবার। চলুন একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

জেবউন্নিসার দিকে তাকিয়ে নাসিরুদ্দীন বলল, 'তুই তাহ'লে থাক এখানে, নাতনী। তোর অনেক ভাগ্য তুই ডিম্বেশ্বরবাবুর অনুগ্রহ লাভ করেছিস। খোদা তোর মঙ্গল করুন। আমি চলি তাহলে।'

জেবউন্নিসার চোখে জল এল, বলল, 'দাদাজান, বিদায় নিচ্ছ কেন? তুমি ছাড়া কে আর আমার আছে?' নাসিরুদ্দীনের বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকির পাট সরতে লাগল। সে বলল, 'জেবু, তোকে কী যে আমি বলব। মুখে কথা সরছে না। মনটা কেমন যেন লাগছে। কতটুকুই বা মানুষের শক্তি?'

ডিম্বেশ্বর হাসতে লাগলেন, 'নিন, এইসব প্যানপ্যানানি রাখুন তো নাসিরুদ্দীন সাহেব। যতদিন সায়েবের বাবুর্চি থাকবেন, ততদিন নিজের খুশি মতো চলতে পারবেন না, ভালোলাগা তো দূরের কথা। জেবউন্নিসা তুমি তাহলে থাকো, আমরা ঘুরে আসি।'

দু'জনে বেরিয়ে গেল। জেবউন্নিসা নিজের মনটাকে হাল্কা করার জন্য চাবির গোছাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে গুন গুন করে একটা গান ধরল। অর্থহীন গান। যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জনকে দেখা গেল, জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। ওর ব্যাথিত হৃদয় একটু যেন শান্ত শীতল হল। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনো অজানা—এখনো অন্ধকার। ভরা দুপুরের রোদে আকাশ উজ্জ্বল। সেদিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়।

পাঁচ

ডিম্বেশ্বরের খনির কাজ সেদিন বন্ধ। নাসিরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন আহমদ সায়েবের বাসায়। ঘরে ঢুকে ডাকলেন আহমেদ সায়েবকে। আহমেদ সায়েব বেরিয়ে এলেন। তাঁর মনে শান্তি নেই। টাওলার সায়েব মাথা গরম করতে লেগেছে। অফিসে কাকে নামায় কাকে ওঠায়—তার কোনো স্থিরতা নেই। ইসমাইল খুবই জুনিয়র ছিল তাকে একচোটেই ফোরম্যান করে দিল। ওদিকে অফিসের মধুসূদনবাবু পুরনো লোক, টাইপ করতে গিয়ে কী যেন ভুল করেছিলেন বলে এক কথায় তাঁকে বরখাস্ত করে দিল। লোকটা অবশ্য কাজ করত কনফিডেসিয়াল ব্রাঞ্চে। সেটাও একটা কারণ হতে পারে। শহরে টেরোরিষ্টদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে শোনার পর থেকে সায়েবের মনে ভয় ঢুকেছে। প্রত্যেক দিন কড়া নজর রাখে মজুরদের কে কাজে এল কে এল না। লোকেদের ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও চোখ। অপর দিকে শহরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোক আছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পালপার্বনে স-বেতন ছুটি চাইছে, মন্দির মসজিদ তৈরি করার জন্য জমি চাইছে, নিজেদের নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল চাইছে, ডাক্তার ও ওষুধপত্তরের সুবিধা চাইছে এবং সর্বোপরি চাইছে বাসস্থান। কিন্তু টাওলার সায়েব খুবই সন্ধিগ্ধচিত্তের মানুষ। দাবী বা মীটিং করলেই ওর ভয় হয় টেরোরিষ্ট কিম্বা কংগ্রেসীরা এল বলে। গত কয়েকদিন ওর বাংলোবাড়িতে সায়েবরা একত্র হয়ে কী যেন সব গুজ গুজ করল। সেইসব গোপন বৈঠকেই স্থির হল এক হাজার খনিমজুর বরখাস্ত হবে। জিলাপসী সায়েব গেছে নূতন ড্রিলিং মেশিন ও অন্য কী সব যন্ত্রপাতি অর্ডার দিতে। এর পর আর কি হয় কে জানে। এদিকে সায়েব কী ভাবে, সায়েবই জানে। সেইজন্য আহমদ সাহেবের মনে ঘোরতর অশান্তি। তার উপর ডিম্বেশ্বর এমন একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়েছেন যা নিয়ে তাঁর মনের শান্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। নাসিরুদ্দীন ও ডিম্বেশ্বরকে দেখে আহমদ সাহেব বললেন, 'এই যে ডিম্বেশ্বর এসো বাবা, বোসো বোসো। বোসো নাসিরুদ্দীন।'

নাসিরুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শরীরটা কি ভালো যাচ্ছে না?'

'আর বোলো না, কাণ্ডাকাণ্ড দেখে গায়ে জ্বর উঠেছে। আমার তো আবার গ্যাস্ট্রিক রোগ। তার উপর জাহানারার কথা শুনে বুকটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য ডেকেছিলাম, ডিম্বেশ্বর বাবাজী। বয়সে ছোট হলেও তুমি আমার একজন নিকট বন্ধু। তুমি কোম্পানীর একজন পদস্থ চাকুরে। এটা তুমি কি করতে চাইছো, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।' আহমদ সাহেবের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

নাসিরুদ্দীন এতক্ষণে বুঝল ব্যাপারটা কী। অতঃপর যে বিষয় উত্থাপিত হবে তাতে তার কোনো ভাগ না নেওয়াই ভালো। সে আস্তে মোড়া ছেড়ে উঠে

সসম্ভ্রমে বলল, 'আমি চলি আহমদ সাহেব, কাজ আছে। আপনারা কথা বলুন।'

কিন্তু ডিম্বেশ্বর তার হাত ধরে টেনে বসাল, বলল, 'আহা অত তাড়া কিসের? একটু বসে যাও। একটা কথা শুনে যাও।' তারপর ডিম্বেশ্বর সসম্ভ্রমে আহমদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যে দুঃখ পাবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমার কথাটা অসঙ্গত নয়—অশোভনও নয়। জাহানারাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

আহমদ সাহেবের মুখটা লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'সেই জন্যেই তো তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। প্রস্তাবটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার বাসায় তুমি আসা যাওয়া করো; কারণ তুমি আর আমি একই জায়গার লোক। কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গে ভাবসাবের ফলে এই রকম কাণ্ড ঘটতে পারে—সে আমি ভাবিনি।' আহমদ সাহেবের কথায় ক্ষোভ, বেদনা, অভিমান, রাগ একটা মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ। এখন দেখছি এই রকম অকাজে জাহানারাও মেতেছে। বড় খারাপ লাগছে আমার। এসব অঘটন। তুমি আর এগোতে যেয়ো না বুঝেছো, যা হবার হয়ে গেছে।'

ডিম্বেশ্বর আহমদ সাহেবের কথাগুলো হজম করে ধীরস্থির ভাবে জবাব দিল, 'ভুল বুঝবেন না, আমি জাহানারাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনি। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর নিজের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আছে। আর আমিও বিবেকবান মানুষ। সত্যি কথা বলব, জাহানারাকে মাঝে মাঝে আমার মনের কথা বলে থাকি। জাহানারার তো বয়স হয়েছে—কত হল আহমদ সাহেব—বত্রিশ, না?'

'হ্যাঁ, ওই রকম হবে।' ম্লানমুখে আহমদ সাহেব বলে চললেন, 'বয়স তো হয়েইছে।' চেষ্টা বহু করেছি, এতদিন ওর বিয়ে দিতে পারিনি। সেইটাই মস্ত ভুল হয়ে গেছে...' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী করেই বা দেব, যে দেখতে আসে সেই বলে রং কালো, মাথায় খাটো, বেঁটে মোটা মেয়ে।'

আহমদ সাহেব এই বলে চুপ করলেন, সত্য কথাটা গোপন করে লাভ নেই। জাহানারা ওঁর দূর সম্পর্কীয়া মা-মরা ভাগনী। প্রথমে আহমদ সাহেবের স্ত্রী তাকে গ্রাম থেকে আনিয়েছিলেন বাড়ির কাজকর্ম করাবার জন্য। পরে ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর পাওয়া গেলনা ওর জন্য। মেয়ের চেহারা দেখে বর পালায়।

'জাহানারার কি দুঃখ সে আমি জানি। পরশু দুপুরবেলা একটা চিঠিতে সব কথা সে আমায় লিখে জানিয়েছে। যাকগে সে-সব কথা। আমি কালবিলম্ব না করে তাকে বিয়ে করতে চাই।' ডিম্বেশ্বর একটা সিগারেট বের করে নির্বিকার ভাবে টানতে লাগল—জবাবের অপেক্ষায়। এরকম শক্ত ও জটিল প্রস্তাবে আহমদ সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মুখে কোনো কথা ফুটল না। তারপর তাঁর চোখ থেকে দরদর ধারে চোখের জল পড়তে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে সবাই চুপ করে রইল। তারপর তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা গোপনে এই সব

ঠিক করেছো বলে আমি দুঃখিত। তোমায় বলে রাখছি বাবা, এটা পাপ—ঘোরতর পাপ।

'সে আমি জানি।' ডিম্বেশ্বর বলল, 'কিন্তু আমি তো কিছু গোপন করিনি, সুতরাং পাপ হতে যাবে কেন?' আবার আহমদ সাহেব অনেকটা সময় চুপ করে রইলেন, কারণ তিনি জানেন কেবল ডিম্বেশ্বর নয় জাহানারারও ওই একই মত। 'সেকথা সত্যি। আমি হজরত মৌলবীকে ডেকে এনে সব কথা আলোচনা করেছি। তিনি নিকাতে মত দিয়েছেন একটা শর্তে।' আহমদ সাহেব গায়ের এণ্ডি চাদরটা দিয়ে সারা শরীর ঢেকে নিয়ে, গোঁফে একটু তা দিয়ে, মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। আসল কথাটা বলতে তিনি ইতস্তত করছেন অনুমান করে ডিম্বেশ্বর বলল, 'কী বলতে চান, নিঃসংকোচে বলুন। একবার কথা দিয়ে পরে হাহুতাশ করার মতো লোক আমি নই। আমার কথার হেরফের হয়না।'

আহমদ সাহেব ডিম্বেশ্বরকে বিরত করার জন্য এবার তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, 'মৌলভী সাহেব বলেছেন তোমায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। পারবে তুমি? অন্য কোনো শর্তে আমি তোমার হাতে মেয়ে দিতে পারি না।' আহমদ সাহেবের গলার স্বর পাথরের মতো কঠিন।

ডিম্বেশ্বর চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'ধর্মের ওপরে এত জোর দিচ্ছেন কেন? আমি তো কোনো ধর্মকর্মই মানি না। মুসলমান হলে কি লাভ?' আহমদ সাহেব ডিম্বেশ্বরকে তার ছেলেবেলা থেকেই জানেন। 'তবু মৌলবীর কথা তো ফেলা যায় না,' তিনি বললেন, 'তুমি কিছু মানো না কিন্তু আমি তো মানি। নিজের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কথা তুমি যদি বিবেচনা করে দেখো আমার মনে হয় এ-কাজে তুমি এগোবে না।' ডিম্বেশ্বর কিন্তু চিন্তা বিবেচনা বিশেষ কিছু না করেই বলল, 'আচ্ছা বেশ। আমি মুসলমান হব। আমার এতে ভয় নেই, সংকোচও নেই। আমি কেবল একটি জিনিসে বিশ্বাস করি—সে হল সত্য ও বিজ্ঞান।' এই বলে চেয়ারে সটান হয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল। নাসিরুদ্দীন ডিম্বেশ্বরের কথা শুনে অবাক। তাকে বারণ করার জন্য কপাল চাপড়ে বলল, 'ছি ছি ডিম্বেশ্বরবাবু, একটি মেয়েকে নিকা করার জন্যে আপনি যদি ধর্মত্যাগী হন, পৃথিবীর লোক হাসবে।'

'হাসে যদি হাসুক। আমিও পৃথিবীকে দেখে হাসব।' ডিম্বেশ্বর এতক্ষণে বেশ সহজভাবে হাসতে সুরু করল। আহমদ সাহেবের মুখে আর কথা সরছে না। অন্দরের দিকে তাকিয়ে তিনি গৃহিনীকে হাঁক দিলেন, 'ওগো, শুনছো?'

দেয়ালে কান দিয়ে আহমদ সাহেবের বেগম ও জাহানারা ডিম্বেশ্বর কী বলে শোনার জন্য বসেছিল। সেখান থেকে জবাব এল বেগমসাহেবার 'সব শুনেছি।' সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে অস্পষ্ট একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল। আহমদ সাহেব এবার নিজেই অন্দরে চলে গেলেন,. বুঝতে পারলেন জাহানারা কাঁদছে এবং কেঁদে কেঁদেই মামার কাজের প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

নাসিরুদ্দীন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'অনেক দিন ধরেই কথাবার্তা শুনে আসছি। অনেকে ঘন ঘন আহমদ সাহেবের বাড়িতে আপনি আসা-যাওয়া করেন বলে আপনার নিন্দাও করত। ভেবেছিলাম এরকম উদ্ভুটে ঘটনা কতই তো ঘটে সংসারে, এটাও তার একটা। কিন্তু কী সাংঘাতিক মানুষ আপনি, ডিম্বেশ্বরবাবু! ধর্ম বড়ো না মেয়েমানুষ বড়ো? ধর্ম গেলে কোথায় পাবেন? মেয়েমানুষ অনেক আছে।' সরল মন নাসিরুদ্দীনের, সে অবাক হওয়াতে ডিম্বেশ্বর কিছু মাত্র বিচলিত হলনা, বলল, 'আমি আপনাদের মতো করে ভাবি না। আপনাদের মন ভারি ছোট।' কিন্তু কথাগুলো বলার পর তার সমস্ত শরীর ঘামতে লাগল—যেমন ঘামে ম্যালেরিয়া জ্বরে।

তা দেখে নাসিরুদ্দীন আরো আশ্চর্য হল। বেশ কিছুটা সময় দু'জনের কেউ কোনো কথা বলল না।

আহমদসাহেব অন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখেও কোনো কথা নেই। কেউ যদি দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়। দর্শকদের মুখে কথা সরে না।

নাসিরুদ্দীন বলল, 'এত শক্ত-বাঁধনে জড়াবেন না আহমদ সাহেব। ধর্মান্তর করার কথাটা বলে ভালো করেননি।'

আহমদ সাহেব জবাবে বললেন, 'জাহানারাও কথাটা শুনে কাঁদছে কিন্তু মৌলভির কথা আমি ঠেলতে পারি না। হ্যাঁ শোনো বাবা ডিম্বেশ্বর, বিয়েটা ঈদের আগের দিন হয়ে গেলেই ভালো। রাজী তো? আহমদ সাহেবের কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল। ডিম্বেশ্বর কিন্তু ধীর স্থির, সিগারেটটা এশ্-ট্রেতে ফেলে দিয়ে সহজভাবেই জবাব দিল, 'রাজী। এবার আমি যাই। চলো নাসিরুদ্দীন সাহেব। আপনি সাক্ষী থাকলেন।'

আহমদ সাহেব বললেন, 'একটু চা খেয়ে যাও। ভেতরে চা তৈরী করছে।'

ডিম্বেশ্বর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আহমদ সাহেবের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'এখন আমায় স্টেশনে যেতে হবে। এখন আর নাই-বা খেলাম চা।' রুমাল বের করে ডিম্বেশ্বর কপালের ঘাম মুছল—গরম লাগার ঘাম নয়, উত্তেজনার ঘাম। আহমদ সাহেবও দাঁড়ালেন। এণ্ডি চাদরটা কাঁধ থেকে খসে পড়ল, লুঙ্গির তলায় দুপায়ের চটিজোড়া চকচক করে উঠল। মুখের চেহারাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। সকালবেলা ডিম্বেশ্বরকে যখন ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ধর্মান্তরের কথা তুললেই ডিম্বেশ্বর পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ডিম্বেশ্বর যখন সাহস করে মুসলমান হবার কথা মেনে নিল, আহমদ সাহেব যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি নিজেই পড়লেন নিজের ফাঁদে। আত্মগ্লানির আগুনে মনের ভিতরটা যেন জ্বলেপুড়ে গেল।

তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমারো শরীরটা ভালো নেই। যাই, একটু গিয়ে বিশ্রাম করি।' আহমদ সাহেব বিদায় নিয়ে অন্দরে ঢুকে পড়লেন। ডিম্বেশ্বরও দাঁড়াল চৌকাঠের কাছে। সেখান থেকে দেখতে পেল পর্দা সরিয়ে জাহানারা বেরিয়ে এল। 'শুনুন, দাদা, এমনটা করা আপনার উচিত হয়নি, আমার জন্যে এমনটা

করা আপনার কিছুতেই উচিত হয়নি। আমি তো কতবার আপনাকে বলেছি সরে যেতে—শোনেননি। এখনো...সরে যান, ছেড়ে যান। আমার মতো অমঙ্গলে অলক্ষুণে অভিশপ্ত মেয়ের জন্যে এতখানি ত্যাগ করা আপনার উচিত হবে না।' ডিম্বেশ্বর দাঁড়িয়ে রইল, মুখের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জাহানারার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এখন অসম্ভব, জাহানারা।' এই বলে সে রাস্তার দিকে বেরিয়ে গেল। অসহায় জাহানারা নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ওঁকে একবার বুঝান। আমার শপথ, ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

নাসিরুদ্দীন জাহানারার দিকে তাকিয়ে দেখল কালো বেঁটে ও মোটাসোটা মেয়েটির মুখে অনুনয়ও কেমন যেন অশোভন শোনাচ্ছে। ডিম্বেশ্বর হাজারিকা হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারার মানুষ—আর তার পাশে এ-মেয়ে তো বেঁটে বামন। জাহানারাকে বলল, 'গোড়াতেই এসব কথা ভাবা উচিত ছিল। অনেকদিন ধরেই তো কথাবার্তা চলছিল। ডিম্বেশ্বর বাবুর কথা নড়চড় হয় না।'

জাহানারা হাপুস হুপুস কাঁদতে লাগল। নাসিরুদ্দীন পা ফেলল বাইরের দিকে। অতিষ্ঠ হয়ে ডিম্বেশ্বর দূর থেকে ডাকল, 'নাসিরুদ্দীন, তাড়াতাড়ি করুন।' নাসিরুদ্দীন জোরে পা চালাল। সঙ্গে সঙ্গে জাহানারার কান্নার উচ্ছ্বাসও যেন বাড়তে লাগল।

ছয়

লম্বা লম্বা পা ফেলে ডিম্বেশ্বর এগিয়ে যাচ্ছে। মেথর ঝাড়ুদারদের বস্তীর অপর দিকে দেখা গেল ঠিকাদার বীরভদ্র সিংকে। শক্ত সমর্থ দেহখানা এদিক ওদিকে নাড়িয়ে সিং নজর করছিল সামনের বস্তীটা। নাসিরুদ্দীন লোকটাকে এড়াবার জন্য ডিম্বেশ্বরকে বলল 'এবার তাহ'লে আমি যাই।' এতটা রাস্তা একসঙ্গে এল, কিন্তু দু'জনের মধ্যে এতক্ষণ কোনো কথা হয়নি। ডিম্বেশ্বর ওকে বিদায় দিয়ে, সিং-এর দিকে নজর করল কটাক্ষে, বলল, 'এখানে কী মতলবে, ও বিহারী!'

বিহারে ওর দেশ বলে বীরভদ্রকে লোকে বিহারী বলে ডাকে। বীরভদ্র বলল, 'বোধন-রা অন্য কাজ করতে বেরোচ্ছিল, ওদের আটকেছি।'

'তোমার কাজে বুঝি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু হাজিরা নিয়ে বচসা হচ্ছে। বলছে আট আনা দিতে হবে।'

'তাই দাও না।' ডিম্বেশ্বরের গলাটা রুক্ষ।

'অত কি দিতে পারি? তুমি চললে কোথায়?' বীরভদ্রের চোখে সন্দেহ। এইখানে বসে থাকতে থাকতে নজর করেছে, ছাঁটাই মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ

কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কোম্পানীর কর্মী স্টেশনের দিকে গিয়েছে। মালা সিং গেছে, সঙ্গে গেছে হেড মাষ্টার। চণ্ডী আহির গেছে, বরুয়াকেও দেখেছে যেতে। এখন এল ডিম্বেশ্বর।

'হু'টো ছেলে আসবে বলেছে। আমার সেই আগেকার স্ত্রীরও আজ আসার কথা।' এই বলে ডিম্বেশ্বর চুপ করল। শরীরটা ঘামছে। কেন ঘামছে সে নিজেও জানে না। আজ তো তেমন গরমও নয়।

বীরভদ্র এবার ডিম্বেশ্বরের খুব কাছে এসে বলল, 'তিনি আসছেন—খুব ভালো কথা। এবার আর তাঁকে চলে যেতে দিয়ো না।'

ডিম্বেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠল, বলল, 'না, ওকে আমি আর রাখব না। একটা ছেলে বিয়োতে পারল না এতদিনেও। আমি জাহানারাকে বিয়ে করব সেই কথা বলে ওকে ফিরে যেতে বলব। ছেলে হু'টো আসছে কাজের সন্ধানে। ওদেরকেও বলব ফিরে যেতে।'

বীরভদ্র ডিম্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না। ওর নিজের স্ত্রী আছে, একটা ছেলেও হয়েছে। তবু অন্য মেয়েদের প্রতি ওর আসক্তি হয়। সে যে এখানে অপেক্ষা করছে—তা বোধনের জন্য নয়। বোধন কাজে নিযুক্ত হয়েছে, কাজ করতেই বেরিয়েছে। সিং এসেছে বোধনের মেয়ে লছমীর খোঁজে। ডিম্বেশ্বরবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলল, 'আর কি মেয়ে পেলেন না ডিম্বেশ্বরবাবু? কালো, মোটা, বেঁটে—তায় মুসলমান। এমন কর্ম করবেন না। বৌদিকে নিয়ে আবার সংসার পাতুন—লক্ষ্মী বৌ। ভালো করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন পূজো-আচ্চা করলে ভগবান সন্তান দেবেন।' ডিম্বেশ্বর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বীরভদ্রের মুখে সদুপদেশ যেন ভূতের মুখে রাম নাম। অসহ্য মনে হল। ইতিমধ্যে বস্তী থেকে বেরিয়ে এল লছমী। বস্তীর মলিন পরিবেশে মানুষ হলেও লছমীর চেহারাটা পরিষ্কার। ছিপছিপে শরীর, ডিমের মতো মুখে সবসময় একটা চঞ্চল হাসি। লছমীকে দেখে ডিম্বেশ্বর বলল, 'বোধনের মেয়ের দেখছি বিয়ের বয়েস হয়েছে—কি বলো বিহারী?'

কথাটা লছমীর কানে যেতে লছমী মুখ টিপে হাসতে লাগল। ওর মনটা নিষ্পাপ। হেসে হেসে বলল, 'বাবু না কি জাহানারা বাঈকে বিয়ে করবেন? কী মজার কথা!'

ডিম্বেশ্বর বলল, 'ঠিকই শুনেছিস। কোথায় শুনলি?'

'পান্নু বলছিল।' যৌবনের স্পর্শ লেগে লছমীর দেহলতা যেন নৃত্যধারা। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। ডিম্বেশ্বর বলল, 'পান্নু মেয়েটি ভারি ভালো। ওর বিয়েটা কি হয়ে গেছে?'

হাসতে হাসতে লছমী বলল, 'রামুকে ওর পছন্দ হয়নি।' কথাটা বলে চোখ নীচু করল।

বীরভদ্র সিং বলল, 'রামু দেখছি বুড়ো হয়ে গেছে।' কথাটা বলার পিছনে একটা

অর্থ ছিল। পান্নুকে পাবার আশা কম বলে, রামু আজকাল লছমীকে বিয়ে করতে চাইছে। বোধন রাজী, কিন্তু লছমী কথা দেয়নি। বোধন ওকে বলে গিয়েছিল কাজ করতে। বীরভদ্রকে দেখেই লছমী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর পরনে একটি শাদা শাদা ফুটকিওয়ালা কালো রঙের শাড়ি আর লাল ব্লাউজ। ঠোঁট পান খেয়ে লাল। বীরভদ্রের কথাটা সমর্থন করে লছমী বলল, 'বুড়ো হয়েছে কিন্তু রামু মানুষটা খুব ভালো। দেবতার মতো।' বীরভদ্রের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। ডিম্বেশ্বর এবার অনুমান করতে পারল আসলে বীরভদ্রের উদ্দেশ্যটা কি। ডিম্বেশ্বর লছমীকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই যাচ্ছিস কোথায় ?'

সিং বাবুর বাড়িতে কাজ করতে।' লছমী জবাব দিল, 'সিং বাবু বাবাকে চাকরী দিয়েছে। আমাকেও দিতে চায়।'

ডিম্বেশ্বর বিরক্ত হলেন, বললেন, 'এই বয়সে তোর কাজ করার কি দরকার ?' বীরভদ্রের মুখখানা কালো হয়ে গেল। লছমী লজ্জায় মুখ নিচু করল। দুজনেই বুঝল ডিম্বেশ্বর কী সন্দেহ করছে। বীরভদ্রের চরিত্রটা সুবিধের নয়, সারা শহর জানে। বীরভদ্র সাফাই দিল, 'বাড়ির লোকের অসুখ তো। তাই কাজ করার লোক দরকার। বাড়িতে এবার রামলীলা করবে।'

ডিম্বেশ্বর বললেন, 'এই মেয়েটির হিত চিন্তা করা তোমারও কর্তব্য, বিহারী। যদি না করো, টের পাবে।' এই বলে হাসতে হাসতে স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। লছমী জিজ্ঞেস করল, 'ডিম্বেশ্বরবাবু কাজ করতে বারণ করলেন কেন আমাকে ?' ওর প্রশ্ন শুনে বীরভদ্রের মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

শহরটার চারিদিকে একবার দেখে বীরভদ্র বলল, 'এমনি বলল। চল্, আমার মোটরে যাবি। কাজ করবি না কেন ?'

লছমী বলল, 'মোটরে যাব না। হেঁটেই যাব।'

'কেন ?' বীরভদ্র জিজ্ঞেস করল।

'বাবা বারণ করেছে।' লছমী এবার স্থির হয়ে নির্ভয়ে বীরভদ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল। অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল বীরভদ্র। অসম্ভব চালাক মেয়েটা। ঠিক বুঝেছে, মোটরে চড়ার অর্থ কি। বীরভদ্র ঘেমে অস্থির, তারপর বলল, 'চল্, কিছু হবে না।'

লছমী হেসে হেসে বলল, 'আমায় ভগবান দু'খানা পা দিয়েছেন। আমি হেঁটেই যাব।' বীরভদ্র সিং-এর চেষ্টা মাটি হল। সে বলল, 'তবে তুই হেঁটে আয়। আমি চলি।' বীরভদ্র সিং কিছুদূর গিয়ে মোটরে উঠল। লছমী হাসল আর গুনগুন করে একটা গান গাইতে লাগল। বীরভদ্রের হতাশ মুখখানার কথা ভেবে ওর খুব মজা লাগল।

এরই মধ্যে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এল পান্নু। লছমীকে কাছে ডেকে এনে বলল, 'তুই খুব ভালো কাজ করেছিস, লছমী। আমি সব শুনেছি।' লছমী জিজ্ঞেস করল, 'তুই কখন এলি ? তুই কি এখানেই ছিলি নাকি ?'

'হ্যাঁ। খুব ভালো কাজ করেছিস।' পান্নুর মুখে একটা সন্তোষের ভাব। ওর হাতে একটা পোটলা আর চোখে উজ্জ্বল হাসি। 'পুরুষমানুষের সঙ্গে এভাবে চলাফেরা করার জন্যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেননি। কি বলিস তুই? তুই কিন্তু আগে একবার ভুল করেছিস।'

লছমীর মুখখানা কালো হয়ে গেল, বলল, প্রথম দিন তো, তাই ভুল হয়ে গেল। বাবাও ঠিক বুঝতে পারেনি। সেই জন্যে মোটরে চড়লাম। কিন্তু যখন বুঝলাম সিংজীর মতলবটা খারাপ, তখুনি নেমে গেলাম। কিন্তু...'

পান্নু চোখ রাঙিয়ে লছমীর দিকে তাকাল, নাকটা কুঁচকে গেল, বলল, 'ওসব কথা আমায় বলতে আসিস না। সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলবি। আমরা মেয়েরা কি দোকানের কেনাবেচার জিনিস?'

একটুও না দমে লছমী বলল, 'কি করি বল তো পান্নু? বুঝতে পারিনা। আর সিংজী বাবার কিছু কম উপকার করেননি। কাজ দিয়েছেন।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমায় কিছু একটা করতে হবে পান্নু। তখন মনের সুখে চলাফেরা করতে পারব। বস্তিতে চুপচাপ বসে থাকতে ভারি বিরক্ত লাগে। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে আমার কোনো কাজ থাকেনা। ঝাড়ুদার মেথরদের বাড়িতে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। মদ খেয়ে সব সময় অশান্তি করে। ভালো লাগেনা।'

পান্নু বলল, 'তা হোক, নিজে তুই ভালো হয়ে থাকিস। তুই লেখাপড়া করবি, লছমী?'

লছমী হেসে জবাব দিল, 'এ বয়সে কি আর পড়ব। শুনেছি তুই নাকি জাহানারার কাছে যাস পড়তে? কতটা এগিয়েছিস?'

'প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষ করেছি। আর কিছুদিন পরে চিঠি লিখতে পারব, কাগজ পড়তে পারব।' পান্নু বলল, 'তুইও পড়াশোনা কর, লছমী। আমি জাহানারাদিদিকে বলে দেব। যাবি?'

লছমী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে বলল, 'তবে তো আমি বাঁচি। তোদের সঙ্গে থাকতে পেলে দুটো কথা শিখতে পারব, আর সৎ সঙ্গ পাব।'

'যাস, তাহলে।' পান্নু বলল। পান্নু চলে গেল। লছমী সিং-এর বাড়িতে যাবে বলে বেরিয়েও যেতে পারলনা। তার চোখের সামনে একটা নূতন জগতের ছবি ভেসে উঠল যেন—লেখাপড়া করতে হবে।

সাত

গোস্বামী খুবই পণ্ডিত মানুষ। কংগ্রেসের কাজে দু'-তিনবার জেল খেটেছে—সে-ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হয়ে। বলাইচাঁদও সাহসী কর্মী, কোন যেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যোগ দিয়ে বহু বছর জেল খেটে সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে। তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য চ্যাটার্জি, বরুয়া, মালা সিং, প্রধান প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় লোকেরা স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ওই একই প্লাটফর্মে ছিল ছাঁটাই খনি-মজুরের দল। তারা বিষণ্ণ মনে বসে আছে পশ্চিম দিকে যাবার গাড়ি ছাড়বার অপেক্ষায়। কিন্তু গার্ড হুইস্ল্ দেয়নি তখনো। পূবদিকের গাড়িটা এখনো এসে পৌঁছায়নি। ইঞ্জিনের বাঁশী শুনে মনে হল ট্রেন এল বলে। ওই ট্রেনটা এলে পর পশ্চিমের ট্রেন ছাড়বে।

চ্যাটার্জি ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে খুবই মনঃক্ষুণ্ণ। পরাজয়ের বিষাদে মন ছেয়ে আছে। এক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হল, অথচ কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলনা। কোম্পানীর এতই প্রতাপ। অন্যদের মনে দুঃখের চেয়ে রাগটাই বেশি। সারা শহরে চাকরীতে নিরাপত্তার অভাব। উপরন্তু লোকমুখে শোনা যাচ্ছে নূতন নূতন কল ও যন্ত্রপাতি আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। অথচ প্রত্যেক ট্রেনে ক্রমাগত লোক আসছে চাকরীর খোঁজে। এক হাজার ছাঁটাই মজুর, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা ভাবে যে কথা বলবে—মালা সিং-দের তত সময় নেই। ওরা তাই অপেক্ষা করছে গোস্বামীদের কাছ থেকে কিছু উপদেশ নির্দেশ যদি পাওয়া যায়।

প্লাটফর্মের একপাশে দাঁড়িয়ে ডিম্বেশ্বর ট্রেন আসার অপেক্ষা করছে। ছাঁটাই মজুরদের দিকে একবারও সে মুখ তুলে তাকাল না। সে জানে, কেন এতগুলি খনি-মজুর ছাঁটাই করা হল। য়ুনিয়নের ভয়ে নয়—সেটা নেহাতই লোক দেখানো কারণ। আসল কারণ রেশনালিজেশন (rationalisation)। মানুষের চেয়ে বেশি আস্থা কোম্পানীর যন্ত্রপাতির উপর। ইতিমধ্যে নূতন ডিজাইনের ডেরিক, অধিক কার্যক্ষম বয়লার, উন্নত ধরণের ডিস্টিলেটর ও কুলার-এর অর্ডার দেওয়া হয়েছে। চতুর সায়েবরা বুঝেছিলেন যতদিন যাবে, বেশি করে মজুরদের জন্য সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। আহমদ সাহেবের কাছে সে শুনেছে, বেশি করে কোয়ার্টার তৈরি করার জন্য কোম্পানীর একটা প্ল্যান আছে। খেলার মাঠ, ক্লাব, সিনেমা হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজার, হাসপাতালের সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট, ধর্মমন্দির প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর স্কুল প্রভৃতির জন্য জমি ধরে রাখা তো হয়েইছে, বাজেট বরাদ্দও হয়ে আছে। এই সব সুখসুবিধা দিয়ে কোম্পানী শ্রমিক অসন্তোষের মূলে কুঠারাঘাত করে চাইছিল—রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের কবল থেকে শ্রমিকদের দূরে রাখতে। কোম্পানী যে এই সব কৌশলের কথা জানে—ডিম্বেশ্বর ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল। কাজে কাজেই ক্রোধ, অসন্তোষ কিংবা প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে সমস্যাটা সে দেখতে চায়নি। সে ভেবেছিল মজুরদের ছাঁটাই করাটা শিল্পাঞ্চলের স্বাভাবিক ঘটনা।

যন্ত্রের কাছে কিংবা মুনাফার মোহের কাছে মানুষ এখানে নিতান্ত নগণ্য। একটা ট্রেনে যাবার যারা চলে যাবে. আর একটাতে আসার যারা আসবে। সেইজন্য এসব নিয়ে তার বিশেষ মাথা ব্যথা ছিলনা, সে কেবল অপেক্ষা করছিল তার স্ত্রী আসবে বলে।

ট্রেন এসে পৌঁছল যখন, বেশ কিছু যাত্রী নামল, তাদের মধ্যে চাকরী বা কাজের উমেদারই বেশি। ডিম্বেশ্বর এক-একটা কামরা দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল স্ত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য। একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে স্ত্রীকে নামতে দেখে ডিম্বেশ্বর দৌড়ে সেখানে গেল তাদের এগিয়ে নিতে। স্ত্রীর সঙ্গে দুটি ছোকরা ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'মাধুরী, এঁরা এসেছেন কেন ?

মাধুরী বলল, 'এটি তৌফিক, আমাদের কাকাজানের ছেলে। এখানে কাজ পাওয়া যাবে শুনে এসেছে আমার সঙ্গে। আর এটি আমাদের টীয়কের মধু ভকতের ছেলে। বরুয়া বলেছিলেন হরিসভার জন্য একজন লোক দরকার। তাই একে নিয়ে এসেছি।'

ডিম্বেশ্বর মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হাসল। ওর ভাব দেখে মাধুরী বুঝল স্বগ্রামের ছেলেদের জন্য কাজকর্ম জুটিয়ে দিতে ডিম্বেশ্বরের কোনো আগ্রহ নেই। মাধুরী বলল, 'ওরা কিন্তু আপনার ওপর নির্ভর করে এসেছে।'

মাধুরীর কথায় ডিম্বেশ্বরের মন একটু নরম হল, বলল, 'তৌফিকের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারব না পারব জানিনা। তবে ভকতের ছেলেটিকে বরুয়া হয়তো কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। আচ্ছা, তোমরা দু'জনে এখানে একটু বোসো, মাধুরীর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

মাধুরী ভয় পেল। ডিম্বেশ্বরের সঙ্গে জাহানারার প্রেমের কথা শুনেই সে এসেছে। স্বামীর সঙ্গে কথা বলবার আগেই সে একপ্রকার জোর করেই বলল, 'এদের কোথায় ওঠাব, বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে। চলুন বাড়ি যাওয়া যাক।'

ডিম্বেশ্বর অস্বস্তি বোধ করল, বলল, 'মাধুরী, বাড়ি গেলে তোমার মনোকষ্ট বাড়বে।' মাধুরীর শরীরটা খুবই রোগা, গায়ের রং ফর্সা। রেলপথে ভ্রমণের ফলে মুখখানা মলিন, পরনের রিহা মেখলাতেও কয়লার গুঁড়ো লেগেছে। ডিম্বেশ্বরের কথায় সে প্রমাদ গণল, কিন্তু কথাটা কানে যায়নি এরকম ভান করে বলল, 'আগে যাওয়া যাক তো ঘরে...।'

ইতিমধ্যে ডিম্বেশ্বর দেখল গোস্বামী, বরুয়া, মালা সিং, প্রধান, চণ্ডী প্রভৃতি বেশ কয়েকজন লোক ফ্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের পিছনে চ্যাটার্জি এবং আরেকজন কে যেন বাঙালী ভদ্রলোক। ওদিকে বেরিয়ে যাবার সময় গোস্বামী ডিম্বেশ্বরকে দেখে ডাক দিলেন ও বললেন একবার তিনি যেন অতি অবশ্য গোস্বামীদের সঙ্গে দেখা করেন, খুব জরুরী একটা কথা আছে, পারলে সেদিনই আসেন যেন।

ডিম্বেশ্বর দেখলেন গোস্বামীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে দিনের বেলাতেই দেখা

করা ভালো। রাত্রে ওঁর নিজের কাজ আছে। মাধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলেও যথেষ্ট সময় হাতে থাকা দরকার। মাধুরীকে তিনি বললেন, 'মাধুরী, ভেবেছিলাম এখুনি সব কথা তোমায় খোলাসা করে বলতে পারব। কিন্তু তুমি বাড়ি যেতে চাইছ যখন, যাও। আমি গোস্বামীদের সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা কয়ে আসি।' এই বলে ডিম্বেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা সিগারেট ধরালেন আর বললেন, 'দেখো, পিছনের দিকের ঘরে একটি মেয়েমানুষ আছে। সুতরাং একটা কাজ কোরো। ভকতের ছেলেকে পাঠিয়ে দিও সোজা হরিসভার ঘরে আর তৌফিককে আহমদ সাহেবের বাড়িতে।'

আহমদ সাহেবের নাম শুনে মাধুরী চমকে উঠল। কিন্তু ডিম্বেশ্বর ওকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় না দিয়ে, গোস্বামীদের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

মাধুরী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল ডিম্বেশ্বরের দিকে। ডিম্বেশ্বরকে আর যখন দেখা গেল না ভকতের ছেলেকে শুধোল, 'হ্যারে নন্দ, দাদাবাবুকে কেমন দেখলি?'

নন্দ বলল, যা শুনে এসেছি তা-ই হয়তো ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।'

মাধুরী চুপ করে রইল, বুকখানা তার ঢিপঢিপ করতে লেগেছে।

নন্দ ভকত বলল, 'কাজটা খুবই জঘন্য। ও-পক্ষের লোকটি কে?'

মাধুরী একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওর নাম জাহানারা।'

নন্দ ভকত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, ভালো করে ভেবেচিন্তে বলল, 'ব্যাপারটা আমার কিন্তু মোটেই ভালো ঠেকছে না। সব দেখেশুনে যা আপনার ভালো মনে হয় তাই করুন, দিদি। ফাটা বাঁশ জোড়া লাগে না। আজ চার বছর হল লোকটা তোমার খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়নি। এ-সবের কি মানে—একবার বুঝে দেখুন।'

মাধুরী একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ইতিমধ্যে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছে।

তৌফিক বলল, 'চলুন দিদি, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

মাধুরী কিছু জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে রইল ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে। মনে হল ওর বুকের উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকাগুলো একে একে চলে গেল।

আট

নূতন বিবাহের নানা সমস্যা মনের মধ্যে তোলপাড় করা সত্ত্বেও, ডিম্বেশ্বর বরুয়ার বাসার বৈঠকে সর্বসাধারণের সমস্যার আলোচনায় যোগ দিলেন। ঘামে নেয়ে তিনি যখন বরুয়ার বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তার আগেই আলোচনা আরম্ভ

হয়ে গেছে। গোস্বামী দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় বর্ণনা করছিলেন। দেশের শ্রমিকরা যদি কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলায়, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রহ্মপুত্রের মতো শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং শ্রমিকদের উচিত য়ুনিয়ন গঠন করে সমবেতভাবে এমন শক্তি সঞ্চয় করা—যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। তাহলে ভারত থেকে ইংরেজ একদিন চলে যেতে বাধ্য হবে। কংগ্রেস সভাপতি জবাহরলাল নেহরুর আসাম সফরে আসবার কথা আছে। সে সময় তিনি দেশের লোককে বলবেন কংগ্রেসকে ভোট দিতে। সুতরাং দেশের লোক প্রতিদিনের সমস্যা সমাধানের প্রযত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেশের মুখ্য সমস্যার কথা ভুলে না যান।

এইরকম সভাসমিতিতে সচরাচর যেমনটি হয়, এখানেও তেমন হল, অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাজন নেতার প্রশ্নের জবাব দেবার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। সকলেই নীরবে তাঁর মুখের কথা মেনে নিলেন। কেবল নীরবতা ভঙ্গ করার জন্যই যেন বলাইচাঁদ মুখার্জি তাঁর অভিভাষণে বললেন যে, যদিচ শ্রীযুক্ত গোস্বামীর বক্তব্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করেন, তাঁর মনে হয় শ্রমিকদের বলে রাখা দরকার যে য়ুনিয়ন সংগঠনই তাদের প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। এই য়ুনিয়নের মধ্য দিয়েই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিকশিত হয়ে দেশে সমাজবাদী শক্তির উত্থান ঘটাবে।

চ্যাটার্জি মাথা নাড়িয়ে এই কথা সমর্থন করে বললেন, 'ঠিক বলেছেন আপনি। য়ুনিয়ন সংগঠনের কাজে আমাদের লাগতে হবে। আমাদের পক্ষে সেটাই স্বাধীনতা আন্দোলন।'

দীর্ঘ দেহ মালা সিং-এর মাথায় শাদা রেশমের পাগড়িটা উজ্জ্বল নির্মল পতাকার মতো শোভা পাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এ শহরে য়ুনিয়ন গড়ে তোলা বড় সহজ হবে না চ্যাটার্জি বাবু—দেখলেন তো এক হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল। কিছু কি করতে পারলেন ?'

বরুয়া ব্যস্ত ছিলেন অতিথি সৎকার নিয়ে। ভিতর বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া আসা করে তিনি তাম্বুল-পান, চা-জলখাবার পরিবেশন করছিলেন বলে আলোচনায় যোগ দিতে পারলেন না। গোস্বামীর রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়েছে তাঁর বাড়িতে। সুতরাং তাঁর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না।

প্রধান সোজা মানুষ ; কিন্তু এক হাজার শ্রমিক বিতাড়িত হল দেখে যেমন তাঁর রাগ হয়েছিল তেমন ভয়ও ঢুকেছিল মনে। তিনি বললেন, 'কোম্পানীর কি ঘোরতর অন্যায়—দেখুন তো। নিরাশ্রয় লোকগুলো বাসস্থানের দাবী নিয়ে একদিনের জন্য ধর্মঘট করতেই এক হাজার লোককে বরখাস্ত করে দিল। এর কি প্রতিকার নেই ?

গোস্বামী বললেন, 'আছে বৈকি। কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে। য়ুনিয়ন গঠিত হলে

আইনের সাহায্যে এইসব সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারবে। সায়েবদের নিজেদের তৈরি শ্রমিক আইন আছে।'

বলাইচাঁদও জোর দিয়ে বললেন, 'কোম্পানী য়ুনিয়ন গঠন বন্ধ করতে পারে না। একটা ইশতাহার ছাপিয়ে সে কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়।'

'কার নামে বেরোবে ইশতাহার?' গোস্বামী এই প্রশ্ন করে সকলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

কেউ জবাব দিতে পারল না, নাম দিতে সবারি ভয়। ডিম্বেশ্বর এবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি নাম দেব। কিন্তু তার আগে একটা কথা আমি জেনে নিতে চাই। কোম্পানীর সায়েবদের নাড়ীনক্ষত্র আপনাদের জানা আছে কি? অপরিণত বুদ্ধিতে আমরা যদি একটা কথা ভাবি, পরিণত বুদ্ধি থাকায় তারা দশটা কথা ভেবে রাখে। আমরা সদ্য ভাবতে লেগেছি য়ুনিয়ন গড়ে তোলবার কথা। সায়েবরা য়ুনিয়ন হবে বলে ধরে নিয়েছে এবং কীভাবে তাকে নির্মূল করা যায় সেজন্য বুদ্ধি পরামর্শ স্থির করে রেখেছে। ওরা যাদের সন্দেহ করে তাদের তাড়াবে, বাকীদের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে খুশি রাখবে। নতুন যন্ত্র বসাবে, শ্রমিক ছাঁটাই করবে।'

মালা সিং ডিম্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে সমর্থন জানাবার জন্য মাথা নাড়াল। প্রধান ডিম্বেশ্বরকে সমীহ করে, তাই কোনো আপত্তি করল না। একমাত্র চ্যাটার্জি বললেন, 'এসব কথা তো সকলেই জানে। প্রতিকার কি করা যেতে পারে—সেইটাই আসল কথা।'

গোস্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন ডিম্বেশ্বরবাবু। আমার মনে হয়, কোম্পানীর কোনো কর্মীর নামে এখন ইশতাহার না বেরোলেই ভালো। আমার নামেই আমি বের করব—তাহলে হবে তো?'

'খুব ভালো কথা', ডিম্বেশ্বর বললেন। তারপরে তিনি আরো বললেন, 'টাওলার সায়েব আর দশজন সায়েবের মতো নয়, জেনে রাখবেন। লোকটি অসুর বিশেষ। ফ্লেমিঙ-এর কথা স্বতন্ত্র—তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর-এর জামাই। লোকটা উদার।'

মালা সিং বলল, 'টাওলার সায়েবকে কানমন্ত্রনা দেবার মতো লোক আছে। বীরভদ্র সিংকে আপনারা তো জানেন।'

ডিম্বেশ্বর জবাব দিলেন, 'ওদের সবকটাকেই জানি। কিন্তু একটা কথা, যে-কাজই হাতে নিন না কেন, আসল কথা হচ্ছে মানুষ। বুঝেছেন? মানুষ ঠিকমতো না পেলে কাজ ঠিকমতো চলবে না।'

ইশতাহার লিখে ছাপাবার কথা স্থির হল। কংগ্রেস-এর কাজে পূর্ণ সমর্থনও জানানো হল। এবার বরুয়া সবাইকে আমন্ত্রণ করলেন ভিতরবাড়ি গিয়ে চা-জলখাবার খেতে। সবাই যখন যাচ্ছেন—বরুয়া জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা, হাজারিকা, শুনলাম আপনি নাকি মুসলমান হবেন?' রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

থেকে একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। ডিম্বেশ্বরের ব্যাপারটা অবশ্য ইতিপূর্বে সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে থাকবে। ডিম্বেশ্বর তিনখানা লুচি একসঙ্গে কামড় দিয়ে একটু যেন চিন্তিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে ধর্মান্তরিত লোকটার দেহ কিংবা মনে কি কোনো পরিবর্তন হবে ?'

গোস্বামী আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মুসলমান হতে যাবেন কেন ?'

ডিম্বেশ্বর হেসে হেসে বললেন, 'মদনের শরে আমি জর্জরিত।' তিনি আবার একবার ঘেমে নেয়ে উঠলেন। সকলে হাসতে লাগলেন। কিন্তু বরুয়া আদ্যোপান্ত কাহিনী বলবার পর সকলে গম্ভীর। সমস্যাটা য়ুনিয়ন গঠন কিংবা ছাঁটাইয়ের চেয়েও গুরুতর। গোস্বামী হেসে চা খেতে খেতে বললেন, 'আপনি দেখছি আসল বিপ্লবী। আমরা সাম্রাজ্যবাদের ছেদ টানতে চাইছি আর আপনি সমাজের ধারাটাকেই উলটো পথে চালাতে উঠেপড়ে লেগেছেন।'

মালা সিং বললেন, 'ধর্ম না মানেন ভালো কথা। কিন্তু অন্য লোকের ধর্ম গ্রহণ করাটাই ভয়ের কথা। আপনি মুসলমান হতে যাচ্ছেন কেন ?' জলখাবার থেকে মুখ তুলে মালা সিং উদ্‌বেগের সুরে প্রশ্ন করলেন। ডিম্বেশ্বর জবাবে বললেন, 'ধর্ম আমার কাছে জামা-কাপড়ের মতো। জামা-কাপড় বদলালে কি মানুষও বদলায় ?'

মালা সিং কী একটা যেন বলতে চাইছিলেন, এমন সময় সেখানে নন্দ ভকত ও মাধুরী প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে এত লোক দেখে তারা অপ্রস্তুত। বিশেষত ডিম্বেশ্বরকে দেখে। ডিম্বেশ্বর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে এলে কেন ?' গলার স্বরে কোনো উৎকণ্ঠা নেই—যেন কী ঘটেছে না ঘটেছে তা তিনি ইতিমধ্যে আঁচ করতে পেরেছেন। মাধুরী মুখ তুলে ডিম্বেশ্বরের দিকে তাকিয়েও দেখল না ; গট গট করে ভিতরে ঢুকে গেল। বরুয়ার স্ত্রীর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় থাকায় সংকোচের কারণ ছিল না। ডিম্বেশ্বর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি ভকত ?'

নন্দ বলল, 'হরি হরি ! দিদি ঘরে ঢোকে সাধ্য কি ? রান্নাঘরে বসে কোথাকার কে একজন মুরগী কাটছে কুটছে। চাতালে আরো দুটো মুরগী ডাক ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মশাইরাই বলুন আপনারা অনেকেই তো সজ্জন- এরকম ভব্যসভ্য মানুষের এই রকম অধঃপতন হওয়াটা কি ভালো ?'

ডিম্বেশ্বর শুধালেন, 'রয়ে সয়ে কথা বল্, ভকত। তোর দিদি কি তাহলে আমায় ছাড়পত্র দিল ?'

নন্দ জবাব দিল, 'আপনি নাকি মুসলমান হতে চান ?'

'হ্যাঁ'। ডিম্বেশ্বরের উত্তর শুনে ভকতের মুখখানা শুকিয়ে গেল। ডিম্বেশ্বরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিম্বেশ্বর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। কিছুক্ষণের মতো কারো মুখে কথা নেই। ডিম্বেশ্বর বলল, 'বরুয়া, ভকতকে হরিসভার ঘরে একটু জায়গা করে দিন, রাতটা থাকুক। আমি এবার যাই।' সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বেশ্বর উঠে পড়লেন আর রান্নাঘরের দিকে উঁকি মেরে

মাধুরীকে ডাকলেন। কিন্তু মাধুরী বেরোল না, সাড়াও দিল না। অন্য অতিথিরা ব্যাপার দেখে হতভম্ব, কারো মুখে রা নেই, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কৌতুহলের দৃষ্টিতে সবাই তাকাল ডিম্বেশ্বরের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য য়ুনিয়নের কাজকর্মের কথায় যেন ধামাচাপা পড়ল। এরকম অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে ভকত অস্থির হয়ে উঠল। বরুয়া তাকে নিয়ে হরিসভার ঘরে রেখে এলেন। তখনো কারো মুখে কথা নেই। ডিম্বেশ্বর বরুয়ার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'মাধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আমার সঙ্গে যেতে চায় কিনা, আমার সঙ্গে কোনো দরকার আছে কিনা।' বরুয়ার স্ত্রী জবাব দিলেন না। হরিসভার ঘর থেকে বরুয়া ফিরে এলে পর, বরুয়াকে ডিম্বেশ্বর বললেন খবরটা নিয়ে আসতে।

বরুয়া ভিতরে গেলেন। দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'যাবে না। কিছুতেই না, কোনোক্রমেই যাবে না।' তার চেয়ে বেশি কথা বরুয়া বলতে পারলেন না, অবশ্য বলবার দরকারও ছিল না। ডিম্বেশ্বরের মুখে বিরক্তির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। তিনি যেন পূর্ব থেকে এই বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। 'হ্যাঁ, যাবে না। বলেছে, আপনার মুখ দেখাও না কি পাপ।' বলবে কি বলবে না করে বরুয়া শেষপর্যন্ত কথাটা বলেই ফেললেন।

ডিম্বেশ্বর হাসতে লাগলেন। তারপর অকস্মাৎ খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া পাখির মতো সমস্ত সমাজিক নিয়ম লঙ্ঘণ করে হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবার ঘরের মেঝের উপর। ডিম্বেশ্বর বলতে লাগলেন, 'পাপ কি পুণ্য কি? হিন্দুই বা কি মুসলমান কি—আমি এসব কথা একেবারেই বুঝতে পারিনা। মাধুরীর সঙ্গে অনেক বছর ঘর করলাম কিন্তু তার সর্বদাই ওই এক অভিযোগ। আমি নাকি পাপ কাজ করে থাকি। আমাদের সন্তান না হবার কারণ নাকি আমার পাপ কর্ম। সায়েবদের কাছাকাছি থেকে থেকে আমি ওদের কয়েকটা ভালো রেওয়াজ শিখেছি। তার মধ্যে অন্যতম হল এই যে, যেসব কাজ ইহজীবনে সম্পন্ন করলে সুখী হয়ে থাকতে পারি, সে সব পর জন্মের জন্য রেখে দেবার কোনো মানে হয় না। আমার বংশ নির্বংশ হয় সেটা আমিও কামনা করিনা। কেন করব? আমি জানি মাধুরী বন্ধ্যা, মাধুরী একেবারে গ্রাম্য। ওর সঙ্গে অশান্তিতে সংসার করাটাই পাপ। জাহানারাকে আমার ভালো লাগে—সেইটাই বড়ো কথা। আমার একটি ছেলেপুলে চাই। সেটাও বড়ো কথা। মুসলমান হওয়াটা এমন কিছু বড়ো কথা নয়। বুঝেছেন তো? সকল ধর্মেরই মূলে আছে ভণ্ডামি। কিন্তু আমার নিজের জীবনটা সুখময় করে তোলা আমার নিজের প্রতি প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সেই জন্যে মাধুরীকে ডিভোর্স করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এদেশে ডিভোর্স করা চলেনা—বিবাহ নাকি পবিত্র—তাতে নাকি বিচ্ছেদের স্থান নেই। বহু তিক্ততা সহ্য করে একটা মিথ্যা সংসার সাজিয়ে জগতের চোখে ধুলো দেওয়া আমার নীতি বিরুদ্ধ। আমি যে-ধরণের মানুষ—আমি তেমনি। আর ভকত বলছিল, আমার বাসায় কে একজন মেয়েমানুষ রান্না করছে, কিন্তু ভকত তো জানেনা জেবউন্নিসার করুণ

কাহিনী। সে বেচারী সায়েবটার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমার ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। দু'দিন বাদে সে চলে যাবে, নার্স হবার ট্রেনিং নিতে। সে তার নিজের খুশিতে রাঁধাবাড়া করছে, আমার অনুরোধে নয়। আমি কোনো পাপ করিনি, আমি যা করেছি সেটাই সত্যের পথ, বিজ্ঞানের পথ। আমি সমাজ সংস্কারক নই, আপনাদের মতো নামজাদা বিদ্রোহী নই। আমি চাই ঠিক পথে চলতে।'

উচ্ছ্বাসভরে কথাগুলি বলে বরুয়াকে ডিম্বেশ্বর বললেন, 'আপনি মাধুরীকে বলে দেবেন এ পর্যন্ত সে তার ভরণ-পোষণের জন্য যেরকম মাসোহারা পেয়ে আসছে, তেমনি পেতে থাকবে।' ডিম্বেশ্বরের কথাগুলি স্পষ্ট, গলার স্বর উঁচু পর্দায়। ঘরের আর পাঁচজন নিস্তব্ধ থাকায় ডিম্বেশ্বরের কথাগুলি সহজেই ভিতরবাড়ি গিয়ে পৌঁছল। ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শোনা গেল, সকলেই বুঝল কে কাঁদছে। ডিম্বেশ্বরের অন্তরে সে কান্না কোনো দাগ কাটল না। তিনি কারো সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ না করেই আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। খাবার ঘরে আর যে ক'জন বসে ছিল তাদের সকলের মনে হল একটা যেন অভিনয় দেখছে।

গোস্বামী বললেন, 'মানুষটা খাঁটি, কিন্তু—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না গোস্বামী, বলতে পারলেন না ডিম্বেশ্বর 'নিষ্ঠুর' 'প্রগতিশীল' কিম্বা 'পাগল'। 'কোনো বিশেষণ তাঁর সম্বন্ধে ঠিক খাটে না। পৃথিবীতে সমাজ-সংস্কার হয়তো এইভাবেই হয়, প্রথম লোকটাকে সবাই পাগল বলে।' এসব কথা গোস্বামী নিজের মনেই ভাবলেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

বলাইচাঁদ বললেন, 'দেশে এমন মানুষও আছে যখন, এ-দেশের আশা আছে।'

কারো মনে মাধুরীর প্রতি সহানুভূতি থাকলেও কেউ তার হয়ে একটা কথাও বলল না। আমাদের সমাজে পুরুষ প্রাধান্য পায় বলে নারী সর্বদাই এইভাবে উপেক্ষিত হয়। কিছুক্ষণ পরে মাধুরী স্বয়ং যখন বেরিয়ে এসে সমাজের সবাইকে অনুরোধ জানাল দু'জনের মধ্যেকার বিবাদ নিষ্পত্তি করে ভাঙা সংসার জোড়া লাগাতে—কেউই বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করল না। নিরুপায় হয়ে সেই রাতেই মাধুরী টিয়কে ফিরে যাবে ঠিক করল। সঙ্গে নন্দ ও তৌফিক দুজনেই চলে যাবে। যে-শহরে তাদের গ্রাম-সম্পর্কিত দিদির এতখানি হেনস্তা, সেখানে কোন উৎসাহেই বা তারা থাকে।

নয়

ঈদুজ্জোহার দিন অঝোরে বৃষ্টি ঝরল। তাতে অবশ্য পবিত্র বকর-ঈদ পালনে মুসলমানরা কেউ পিছপা হল না। পরের দিনই শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য ডিম্বেশ্বর মসজিদে গিয়ে সেখানকার কৃত্য শেষ করে নিজের বাসায় ফিরছিলেন। অন্যেরা অনেক করে বলেছিল ওঁকে ঈদের সমবেত নামাজে যোগ দিতে। তাতে কান না দিয়ে তিনি সোজা তার বাসায় ফিরে এলেন। তার নূতন নাম হল গিয়াসুদ্দীন। বাসায় ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় আহমদ সাহেবের বাসা থেকে পান্নু খবর আনল যে পান্নুদের পাড়ায় খুব গণ্ডগোল বেঁধেছে। ডিম্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, পান্নু ?'

'কী হয়েছে জানিনা। কিন্তু বিস্তর নেপালী জমা হয়েছে। ইসমাইল গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। আমার কিন্তু ওই রাস্তা দিয়ে ঘরে যেতে ভয় করছে, বাবু। কাল শেখরের খুব ভেদ বমি হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম আহমদ সাহেবের বাড়িতে পড়তে। এখন কেমন করে বাড়ি ফিরি ?'

গিয়াসুদ্দীন বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। ঘরের জানালাটা খুলে দিলেন। একদৃষ্টে অদূরবর্তী লোকের ভিড় দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কি। পান্নুকে বললেন, 'শেখরের যখন ভেদ বমি হয়েছে ডাক্তারকে খবর দাওনি কেন ?'

'বাবা বললেন যে মা কালী অসন্তুষ্ট হয়েছেন, পুজো দিলেই সেরে উঠবে। বাবা তার ব্যবস্থা করছেন। সোনারও আজ সকাল বেলা থেকে—

গিয়াসুদ্দীন খাট থেকে নামলেন, পান্নুকে বললেন, 'বেশ ব্যবস্থা করেছো যাহোক। ও দুটো বাঁচবে কি বাঁচবেনা—সন্দেহ। এই মুহূর্তে ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। দুর্গা বাড়িতে আছে না নেই... ?'

'দুর্গা আজকাল ব্যারাকে থাকে, বাসায় আসেই না। ঘন ঘন প্রধানের বাড়িতে যায়।' এই সংকটের মধ্যেও কথাটা বলতে গিয়ে পান্নু একটু মুখ টিপে না হেসে পারল না।

দুর্গাকে উদ্দেশ করে গিয়াসুদ্দীন বকতে লাগলেন, 'দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক, প্রেমে পড়ে নিজের-কর্তব্য পর্যন্ত ভুলে গেছে।'

ধীরে ধীরে কতকগুলি চেঁচামেচি বাতাসে ভেসে এল। একটু পরেই গিয়াসুদ্দীন দেখলেন জেবউন্নিসা দৌড়ে দৌড়ে আসছে—চণ্ডীর বাসার দিক থেকে। হন্তদন্ত হয়ে এসে পান্নুকে দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পান্নু, করছিস কি ! শেখর যে মারা গেল, সোনারও এখন তখন অবস্থা—খুব ছটফট করছে। আমি চেয়েছিলাম হাসপাতালে নিয়ে যেতে। মামা দিলেন না। দৌড়ে এলাম তাই খবরটা দিতে। মৃত্যুকালেও শিশুদের ছুঁতে দিলেন না আমাকে। হায় হায়, মিনা মাসীর বুকের ধন সোনাটাকে এখন কে ধরে রাখবে। সোনাও চলে যাবে ওর মায়ের কাছে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা।'

কথাটা শুনে পান্নু একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। চোখদুটো দু'হাতে ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শেখর যে এত হঠাৎ চলে যাবে—তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সোনারও কি দশা হয় ঠিক নেই। ওর বুকের উপর যেন ঢেঁকির পাট পড়তে লাগল। এমন হতে পারে জানলে সে কখনো বাড়ি থেকে বেরোত না—কখনো না—কিছুতেই না। পান্নু বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেব বলুন, আমায় একটু পৌঁছে দিন দয়া করে। আমি আর তো সইতে পারি না।'

কথা বলতে বলতে পান্নু ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গিয়াসুদ্দীন একবার পান্নুর দিকে তাকিয়ে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে জেবউন্নিসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মারপিট হচ্ছে কাদের মধ্যে?'

জেবউন্নিসা বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তবে শুনলাম, ইসমাইল নাকি অন্যায়-ভাবে কোরবানি করেছে...'

গিয়াসুদ্দীনের চোখ দুটো রাগে জ্বলতে লাগল, 'বুঝলাম। পুলিশ এসেছে, না আসেনি?'

'কই, পুলিশ তো দেখলাম না।' গিয়াসুদ্দীনের চোখের দিকে তাকিয়ে জেব-উন্নিসা যেন প্রমাদ গণল।

আলমারী খুলে গিয়াসুদ্দীন ছোট একটা পিস্তল বের করলেন। সেটা পকেটে ভরে বেরোবার জন্য তৈরি হলেন। জেবউন্নিসাকে বললেন, 'তুমি ঘরেই থাকো। আমি পান্নুকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

জেবউন্নিসা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, বলল, 'আজ আমায় ডিব্রুগড় যেতে হবে। বাড়িতে বসে থাকতে তো আমি পারবনা।' গিয়াসুদ্দীন জেবউন্নিসার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নজরে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি তা হলে চলে যেয়ো। আমি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দি। জেবউন্নিসা ট্রেনে যাবার জন্য জিনিসপত্র গোছাতে চলে গেল। ভিতর থেকে একটা তালা এনে সদর দরজায় তালাচাবি দিয়ে গিয়াসুদ্দীন পান্নুকে বললেন, 'চলো।' আবার একটা অশ্রুবন্যা পান্নু দমন করে নিল। কাঁদাকাটা বা আহাঃ উহু করার আর সময় কোথায়! মারপিটের শব্দটা ক্রমেই যেন বাড়তে লেগেছে। গিয়াসুদ্দীন জেবউন্নিসাকে বললেন, 'জেবু, তুমি একা একা বেরিয়ো না। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তোমার কিছু ক্ষতি হয়। আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় স্টেশনে পৌঁছে দেব। ঘটনাটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

জেবউন্নিসা বলল, 'আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না। হাসপাতালের দিকে একটা রাস্তা আছে, আমি সেই রাস্তা ধরে ঠিক চলে যেতে পারব। কিন্তু ইসমাইল কাজটা খুব অন্যায় করেছে, তার জন্যেই আমার চিন্তা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওর যদি কিছু হয় তো সর্বনাশ।' ওর চোখে জল এল। ইসমাইল যে ওর সর্বস্ব, মুখ ফুটে সে-কথাটা বলতে পারল না। গিয়াসুদ্দীন আর কোনো কথা

না বলে পান্নুকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীর বাসায় গিয়ে দেখলেন, চাতালের উপর দুই ছেলের মৃত দেহ রেখে চণ্ডী নিতান্ত অসহায় ভাবে কান্নাকাটি করছে।

এবার চণ্ডীর কান্নার সঙ্গে যুক্ত হল পান্নুর কান্না। পান্নু শেখরের দেহটা জড়িয়ে ধরল। গিয়াসুদ্দীনের তখন দু' নৌকায় পা—একদিকে মরাকান্না, অন্যদিকে মারপিট। পান্নুকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে ভেবে গিয়েছিলেন, এখন চণ্ডীর দুরবস্থা দেখে আটকে পড়লেন। গিয়াসুদ্দীন বিরক্তির সুরে বললেন, 'দুর্গাটা মনে হচ্ছে চাকরী পেয়ে আর ঘরমুখো হতে চায় না। এতক্ষণেও কি তার আসার সময় হল না? নিমকহারাম!'

চণ্ডী নির্বিকারভাবে বলল, 'আসতে চায় আসবে, না চায় আসবে না—।' বাপের মুখে একথা শুনে গিয়াসুদ্দীন থ হয়ে গেল! চণ্ডীর দেহে যেন প্রাণ নেই, উৎসাহ নিভে গেছে। মাথার চুলগুলো সাদা, মাথার টিকিটা ঝুলে রয়েছে। গায়ে একটা শার্ট, আর পরণে ধুতি। ওর গায়ের রঙ কালো হলেও এতটা পাণ্ডুর ছিল না। দেহখানা এতটা রোগা ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সংসারের প্রতি ওর কোনো শ্রদ্ধা নেই, মনে হচ্ছে সংসার বড়ো কঠোর। ছেলে মেয়ে দুজনেই অবাধ্য। একজন প্রধানের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের লীলায় মত্ত, আরেকজন তো রামুকে বিয়ে না করে আইবুড়ো থেকে লেখাপড়া শিখতে বেরিয়ে পড়েছে। শেখর ও সোনা গত হল। ওদের কলেরা হয়েছে বুঝতে পেরে মা কালীর পুজো দেবার সংকল্প করেছিল, কিন্তু মা তো চোখ তুলে চাইলেন না। এইসব সাত সতেরো কথা ভেবে চণ্ডী খুবই মনমরা।

গিয়াসুদ্দীন এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেবল সামনের মাঠে অশ্বত্থ গাছটার নিচে সেই ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা—পঙ্গু কুষ্ঠরোগীটাকে দেখলেন। চণ্ডী তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'আপনি মিথ্যে চিন্তা করবেন না। এদের দু'টিকে আমি নিজের হাতে মানুষ যখন করেছি, নিজের হাতে সংকারটাও করতে পারব। সংসার গড়ে তোলা কঠিন, ভেঙে দেওয়া খুবই সহজ। নিজের হাতেই তো সব ভাঙলাম, চিকিৎসা পর্যন্ত হল না।'

চেচাঁমেচি হৈ চৈ ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমন সময় চণ্ডীর ঘরের সামনে একটা এম্বুলেন্স ভ্যান এসে থামল। দুর্গা নামল ভ্যান থেকে। কোট প্যান্ট জুতো মোজা পরে দুর্গা ফিটফাট হয়ে এসেছে। কিন্তু খুবই মনমরা মুখখানা। নেমে যাবার পর দুর্গা এম্বুলেন্সটাকে ছেড়ে দিল। এম্বুলেন্স দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল ঘটনাস্থলে। দুর্গা দু'পা এগিয়ে সোনা ও শেখরের মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল. বুকখানা তার ধড়াস করে উঠল। তবু সে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখুন তো বাবু, আমায় সময় থাকতে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারল না এরা?'

নির্বিকার চণ্ডী বলল, 'কোন সাহসে খবর দি তোকে? চাকরী পাবার পরেই তো ঘর ছেড়ে চলে গেলি।'

গিয়াসুদ্দীন এদের দু'জনের কথার মধ্যে বলতে চাইলেন না। কিন্তু মারপিটের শব্দ

ক্রমাগত তাঁর কানে আসছে। ঘটনাস্থলে যাবার জন্য তিনি উসখুস করছেন। তাঁর অবস্থা দেখে চণ্ডী উপযাচক হয়ে বলল, 'আপনি যান বাবু। পারলে ওখানে গিয়ে কিছু একটা করুন। ইসমাইল-এর কথা ভেবে ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আর কারো কিছু হল কি না, তাই বা কে জানে?'

দুর্গা বলল, 'ইসমাইল-এর মাথাটা ফেটেছে। সে এখন আছে হাসপাতালে।

'আর কারো কিছু হয়েছে নাকি?' উৎকণ্ঠিত হয়ে গিয়াসুদ্দীন শুধোলেন।

'বোধনকে দেখলাম—ওর হাতে চোট লেগেছে। প্রধানবাবু সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তাঁকে ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দিয়েছে।' দুর্গা অল্প কথায় ঘটনার বিবরণ দিল। ভারি বিশ্রী ঘটনা, ভায়ে ভায়ে এরকম মারপিটের দরকার ছিল না।

'মারামারি থামাবার জন্য প্রধানবাবু সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়েছিলেন বলে তিনি জখম হলেন। ওখানে আহমদ সাহেবকেও দেখে এলাম। আর দেখলাম বরুয়াবাবুকে, মালা সিংকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীকেও। তাছাড়া গোস্বামীবাবুরাও ওখানেই আছেন...' দুর্গা এক নিশ্বাসে এইসব খবর বলল। গিয়াসুদ্দীনের মনটা একটু ঠাণ্ডা হল, তাহলে ওখানে ভালো ভালো কিছু লোক গিয়ে পড়েছেন। এবারে মারামারি থামাতে বেশি সময় লাগবে না। গিয়াসুদ্দীন একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বোধন ওখানে গিয়ে পড়ল কেমন করে?'

দুর্গা বলল, 'জানি না।'

গিয়াসুদ্দীনের সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা সেই বিহারীটার কারসাজি নয় তো?'

দুর্গা বলল, 'আমি কি করে জানব বাবু?'

চণ্ডী হঠাৎ বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে বোধনকে সিংজী লাগিয়ে থাকবে। তা না হলে এতগুলো লাঠিয়াল ওখানে গিয়ে জুটল কোথা থেকে?'

দুর্গা বলল, 'না জেনে কথা কওয়া ভালো নয়। বেশ কিছু নেপালীকেও দেখে এসেছি।'

গিয়াসুদ্দীন সিগারেটে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এই দেশে কী না হয়। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে খাণ্ডবদহন পর্যন্ত হতে পারে। অজমূর্খের দেশ।'

'এই জন্যেই তো সায়েবদের অনেকগুলি গুণ আমার ভালো লাগে। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, কাজ করা, প্রেম করা—সব বিষয়ে ওরা আদর্শ স্থানীয় আর আমাদের দেশের সবই যেন পচা।' গিয়াসুদ্দীন কথা থামিয়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে গেলেন। বুকে তার একটা তীব্র বেদনা বোধ হতে লাগল।

চণ্ডী দুর্গাকে বলল, 'এই সময়ে কে আর আসবে? তোতে আমাতেই সৎকার করে আসতে হবে। চল্।'

দুর্গা রাজী হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে বাপের জামাকাপড় পরে বাইরে এসে দাঁড়াল। মৃতদেহ দু'টো দু'খানা কম্বলে জড়িয়ে নিল। তারপর উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল।

তার কান্না শুনে পান্নুও কাঁদতে লাগল। 'সোনা রে, তোকে আর দেখতে পাব না। শেখর, তুই কোথায় গেলি, মা গো, বুঝেছি আমি, আমার ওপর বিশ্বাস ছিল না বলে তুমি এদের টেনে নিলে। আমি ওদের বাঁচাতে পারলাম না, মা।' পান্নুর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুনে চণ্ডীর চোখেও জল এল। সে বলল, 'পান্নু, কাঁদিস না আর। কাঁদলে কি হবে? মা কালী রুষ্ট হয়েছেন। মানুষ কি করবে? মরাখাগী পূজো চাইছে। পূজো করতে হবে।'

দুর্গার মুখে আর কথা নেই, সে বুঝেছে ত্রুটি তারই বেশি। সে তো আর কাঁচা ছেলে নয়, সব জানে, সব বুঝতে পারে। আগের থেকে কলেরার ইঞ্জেকশন দিলে ছেলে দু'টো মরত না। এ কাজটা করা উচিত ছিল তারই। কিছু যখন করতেই পারল না এখন আর ওকে দুষে কী লাভ? দুর্গা বলল, 'চলো বাবা, ওদের নিয়ে যাই।'

দেহ দুটো বুকের সঙ্গে বেঁধে বাপে ছেলেতে শ্মশানের পথে রওনা হল। পান্নুর বুকফাটা কান্না আবার উথলে পড়ল।

গিয়াসুদ্দীন যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, মারামারি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। নেতৃস্থানীয় সৎ লোক যাঁরা ছিলেন তাঁদের চেষ্টায় বস্তিতে শান্তি ফিরে এসেছে। গোস্বামীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকেদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, এরকম অশান্তির কুফল কি ঘটতে পারে। ইসমাইল সত্যিই ভুল করেছিল, কিন্তু অন্যদের ভুলটাও কিছু কম নয়। ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটি করলে, সবচেয়ে বেশি অনিষ্ট হবে ধর্মের। গিয়াসুদ্দীন ফিরে গেলেন চণ্ডীর বাড়িতে, পান্নুর শোকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁর কর্তব্য। চণ্ডীর উঠোনে পা দিয়েই দেখলেন পান্নু সেখানে নেই।

গিয়াসুদ্দীন এর পর ভিতর বাড়িতে উঁকি মেরে দেখলেন, পান্নু শেখরের বিছানার উপর বসে মীনাবাইয়ের ফোটোর দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ ভাবে প্রার্থনা করছে। গিয়াসুদ্দীনকে দেখে পান্নু বলল, 'আমার কাছে আসতে হবে না, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। আমি মার কাছে প্রার্থনা করছি। মা আমায় দুষছেন। ও মাগো!' পান্নুর অবস্থা দেখে গিয়াসুদ্দীন দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'মরার যারা তারা মরল। এবার জীবিতদের কথা ভেবে দেখ।' নির্দেশের সুর। পান্নু নীরবে গিয়াসুদ্দীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই চাহনীতে ছিল গিয়াসুদ্দীনের পৌরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা। গিয়াসুদ্দীন আবার বললেন, 'আমি বলছি তুই আর শোক করিস না।' এই বলে গিয়াসুদ্দীন বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ গিয়াসুদ্দীন লক্ষ্য করলেন, তাঁর ডান দিকে অদূরেই পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর মিশ্র পুলিশদের কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন। পুলিশের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেশহীন মুখে বীরভদ্র সিং। সবকিছু সে নজর করছে। গিয়াসুদ্দীন গেলেন এগিয়ে পুলিশদের কাছে, দেখলেন পুলিশ ইসমাইল ও চ্যাটার্জির বাসা খানাতল্লাস করতে লেগেছে। মিশ্র তাদের নির্দেশ দিয়ে বলছেন তাদের কি করতে হবে না হবে।

গিয়াসুদ্দীন মিশ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খুঁজছেন এখানে ?'

মিশ্র হেসে হেসে বললেন, 'খুঁজে পেতে কিছু পাওয়া যায় কি না দেখছি। আপনিই তো দু'পক্ষের মধ্যে একটা কোনো স্থায়ী মীমাংসা করে দিতে পারেন। একদিকে আপনি ডিব্বেশ্বর আবার অন্য দিকে গিয়াসুদ্দীন।'

মিশ্রকে একটা সিগারেট দিয়ে গিয়াসুদ্দীন নিজেও একটা ধরালেন, বললেন, 'এই বিহারীটা কি আপনার সঙ্গে এসেছে ?' এই বলে তিনি ঘাড়খানা ঘুরিয়ে বাঁকা দৃষ্টিতে সিং-এর দিকে নজর করলেন।

মিশ্র জবাব দিল, 'হ্যাঁ। কেমন করে এই কাণ্ডটা ঘটল বলুন তো—আপনার কি মনে হয় ?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'আমি জানি না। ওকে জিজ্ঞেস করুন।' ওঁর গলার স্বর কঠিন। সিং অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'আমি কী করে জানব ? আমি কিছু জানি না।' 'বোধন এখানে এসে পড়ল কেমন করে, বলো তো ?' গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'সে তো কাজ করে ফিল্ড-এ...'

সিং আপত্তি করে বলল, 'এ-রকম ভাবে সন্দেহ করা ঠিক নয়। য়ুনিয়ন করা লোকগুলো আমার বিরুদ্ধে যা তা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওদের কথায় এক বিন্দু সত্যি নেই।' সিং একটু থেমে আবার দম নিয়ে বলল, 'সাধ্যমতো আমি সায়েব থেকে আরম্ভ করে মজুর পর্যন্ত—সকলের সাহায্য করার চেষ্টা করি। ঘর তৈরি করবার জন্যে বরুয়াকে সস্তায় মালমশলা জোগাড় করে দিয়েছে কে ? আমি। কালীপূজো করার জন্যে চণ্ডীকে টাকা ধার দিয়েছি। তাছাড়া মালা সিং, প্রধান, ইসমাইল, আহমদ সাহেব—এদের কাকে না অসময়ে সাহায্য করেছি, বলুন ? আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? য়ুনিয়ন মহলের লোকেরা মিছেমিছি আমায় সন্দেহ করে। আমার সন্দেহটা একটু অন্য রকম—সাব ইনস্পেকটরকে সে কথা আমি বলেছি। আমার ধারণা, শহরে টেরোরিষ্ট এসেছে, তারা ইশতাহার ছাপিয়ে বিলি করেছে। আপনি সেটা পড়েছেন কি ? আসলে অমিল আপনাদের নিজেদের মধ্যে। য়ুনিয়ন গঠন করার ক্ষমতা নেই, দোষ দিচ্ছেন কোম্পানীর। বলছেন কোম্পানী না কি চক্রান্ত করছে।'

গিয়াসুদ্দীন স্তব্ধ হয়ে সিং-এর কথা শুনলেন। ওর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে টেরোরিস্টদের কথাটা প্রচার করেছে ওই বিহারীটাই, গিয়াসুদ্দীন ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিগবয়ে কোন টেরোরিস্ট ইশতাহার ছাপিয়ে বের করেছে বলো দেখি। বলতে না পারো যদি মরবে তুমি।'

মিশ্র হেসে বলল, 'ওই যে বলাইচাঁদ নামে লোকটা তাহলে কি ? একস...'

বীরভদ্র ফোড়ন দিল, 'আর চ্যাটার্জি হল উড বি।'

'ও, সেইজন্যে বুঝি সার্চ করাচ্ছেন ? কিছু পেয়েছেন ? গিয়াসুদ্দীন হাসতে হাসতে বললেন, 'কেবল মানুষটাকে একটা মিছে বদনাম দিতে চাইছেন।'

এরই মধ্যে কয়েকজন পুলিশ একটা থলে ভরতি করে কিছু বই এনে রাখল মিশ্রের

সামনে। বইগুলো নেড়েচেড়ে মিশ্র দেখলেন বেশির ভাগ দস্যু মোহন সিরিজের বই। আর কিছু আছে মার্কস, এঙ্গেলস ও গান্ধীর বই। মিশ্র হুকুম দিল, 'যা নিয়ে যা, যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দে। এসব বইয়ে কিছু নেই।'

একজন পুলিশকে গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'চ্যাটার্জি বাড়িতে আছেন কি ?'

পুলিশটি বলল, 'আছেন।'

'ডেকে দাও।' পুলিশ মিশ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে, গিয়াসুদ্দীনের হুকুম তামিল করা যায় কি না বিষয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগল।

গিয়াসুদ্দীনের গলা শুনে চ্যাটার্জি নিজেই বেরিয়ে এলেন। চ্যাটার্জির মুখে চোখে দারুণ উত্তেজনা। গিয়াসুদ্দীনের মুখোমুখি দাঁড়ালে পর গিয়াসুদ্দীনই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করছিলেন ?'

'নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছেন।' চ্যাটার্জি বললেন, 'মারামারি কাটাকাটি দেখতে কারই বা ভালো লাগে ?'

গিয়াসুদ্দীনের হৃদয় সহানুভূতিতে বিগলিত হল। চ্যাটার্জিকে একটি সিগারেট দিয়ে, রাগতস্বরে বললেন, 'মিথ্যা সন্দেহে আপনার উপর জুলুম করছে এরা। আপনার একমাত্র অপরাধ আপনি য়ুনিয়ন গঠন করতে চান। কেমন, তাই না মিশ্র ?'

মিশ্র থতমত খেয়ে বললেন, ও সব অন্য কথা।' এই বলে তিনি পুলিশদের চলে যেতে বলে দিলেন এবং তিনি নিজে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে গেলেন বীরভদ্রের দিকে। বীরভদ্র ওঁর জন্যেই পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিল। দু'জন একটু এগিয়ে যেতে গিয়াসুদ্দীন চেঁচিয়ে বললেন, 'বীরভদ্র, খবরদার, চ্যাটার্জিকে উড্-বি টেরোরিস্ট বলে আর কারো কান ভারি করতে যেয়ো না।'

বীরভদ্র হাসতে হাসতে বলল, 'আমি স্বাধীন মানুষ। আপনিও স্বাধীন মানুষ। কে কার মুখ-চাপা দিতে পারে, কাজে বাধা দিতে পারে ? আমায় যদি কেউ সায়েবদের দালাল বলে, আমি উলটে বলব ওরা ষড়যন্ত্রকারী।'

গিয়াসুদ্দীন খুব কাটা কাটা স্পষ্ট ভাষায় এবার বলল, 'তুমি বলছো, তুমি এই ধরণের কাজ করো না। বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু যেদিন দেখব এরকম কাজে হাত দিয়েছো, সেদিন টের পাবে। আচ্ছা, চলে যাও এখন।'

মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'চলি তা হলে, গিয়াসুদ্দীন সাহেব।'

গিয়াসুদ্দীন কোনো কথা বললেন না। বীরভদ্র গিয়াসুদ্দীনের চোখের দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। ওর রাগ হচ্ছিল, কিন্তু গিয়াসুদ্দীনকে ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছিল না। ওকে শুধু যে সায়েবরা পছন্দ করে এমন নয়, লোকটার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও আছে। মেজাজটা রুক্ষ কিন্তু অন্তরটা খুবই সরল ও সাদাসিধে। রেগে গেলে রক্ষা নেই। বীরভদ্র বলল, 'আপনি আমার বন্ধু মানুষ। আমায় এরকম কড়া কথা বললেন বলে আমার খারাপ লাগছে।'

চ্যাটার্জি হঠাৎ বললেন, 'কন্ট্রাকটারবাবু, আপনার হাজিরায় যারা কাজ করে সেই সব লেবার জুটিয়ে, এই প্রথম দাঙ্গা মারামারিতে লাগালেন। এর রহস্যটা কি?' চ্যাটার্জির গলার সুরে কিছু ক্ষোভ, কিছুটা ঠাট্টা।

বীরভদ্রের কান দু'টো লাল হয়ে উঠল। গিয়াসুদ্দীন মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন. 'এই বিহারীর কটা লোককে গ্রেফতার করলেন, মিশ্র?'

মিশ্রও হেসে জবাব দিলেন, 'তিনটাকে।' গিয়াসুদ্দীন আবার হাসলেন, 'লোক দেখাবার জন্যেই বুঝি গ্রেফতার করলেন?' বীরভদ্র চুপ করেই রইল। আস্তে আস্তে মিশ্রের সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল অন্তরালে। চ্যাটার্জি ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ইসমাইলের মনটা এ-লোকটাই ঘুরিয়েছে।'

'কী যে বলেন!'

গিয়াসুদ্দীনের ঠিক বিশ্বাস হলনা কথাটা, কিন্তু অবিশ্বাসই বা করে কী করে? যেখানে সংগ্রাম, সেখানেই সন্দেহ—অবিশ্বাস। সত্যটা ঠিক যে কি তার সন্ধান পাওয়া শক্ত। এ-শহরে এখন সংগ্রাম পর্ব।

দশ

ইসমাইল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় ফিরে এসেছে। মাথায় ওর এখনও ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে চণ্ডীর বাড়িতে কালীপুজোর বাজনা শুনতে যাচ্ছে। ধার কাছের চা-বাগান থেকে তরুণ বয়স্ক কুলীকামিনেরা এসে ঝুমুর নেচে গান গাইছে।

একটি পয়সার পুঁটিমাছ
কি দিয়ে রান্ধিব গ',
বাগাল বুড়া মরিয়া গেল
কি বলে কান্দিব গ'!

মাঝে কেবল একটা উঠোনের ব্যবধান, তৎসত্ত্বেও চণ্ডী তাকে নেমন্তন্ন করেনি। ইসমাইলের সেজন্য মন খারাপ। জলের কল থেকে জল আনতে গিয়ে একাধিকবার পান্নুর দেখা পেয়েছে, কিন্তু একবারও পান্নু তাকে বলে নি পুজোয় যেতে। ইচ্ছা থাকলেও পান্নুর বাড়ির লোক নিশ্চয় আপত্তি করবে। কি কুক্ষণেই সে কোরবানি করতে গেল, কী দুর্মতি পেয়ে বসেছিল তাকে? একই বস্তিতে থাকে নেপালী, পাঞ্জাবী, মুসলমান। সব কথা মনে পড়ায় ভারি গ্লানি বোধ করল ইসমাইল।

ছি ছি, কেন যে সে বীরভদ্রের কথা শুনতে গেল। ঈদের পরব উপলক্ষে বীরভদ্র ওকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বলেছিল, 'সায়েবদের কি ইচ্ছা, জানো ইসমাইল?'

'কি' ?

'মুসলমান নিজেদের ধর্মমত অনুসারে চলুক, নিজেদের পালাপরব পালন করুক, নিজেদের রুচিমাফিক খানাপিনা করুক। এখানে কোম্পানীর রাজত্ব।' তারপর হেসে হেসে বলেছিল, 'তোমরা এবার বেশ ভালো করে ঈদের উৎসব করো। মুসলমান শ্রমিকদের তুমি যদি নিজের হাতে রাখতে পারো, সায়েব আগেভাগে তোমায় প্রমোশন দেবেন।' তারপর একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বীরভদ্র চলে গিয়েছিল।

ওর কথা শুনে ইসমাইলের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। এখন সে বুঝতে পারছে বীরভদ্র কী ধরণের লোক। সে তো চণ্ডীর হাতেও টাকা গুঁজে দিয়ে গেছে কালীপুজো করার জন্যে। বলে নাকি কলেরা বন্ধ করতে হলে দেবীর কৃপা দরকার। চণ্ডীর বাসায় পূজো চলছে, চণ্ডী মদ খেয়ে হাসছে। পূজারী মন্ত্র পড়ছে, ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর মা কালীর পায়ে বার বার জবা ফুল নিবেদন করছে। পাঁঠাবলি দিচ্ছে। পুরুতের সামনেই বসে আছেন বরুয়া, কেমন যেন উসখুস করছেন। এক একবার তাকাচ্ছেন ইসমাইলের দিকে, এক একবার পান্নুর হাতে সাজা পান চিবোচ্ছেন।

দুর্গা নয়নমণির কাছে বসে কথা বলছে। সে তার খাকী পোশাকটা ছাড়ে নি, ছাড়বেই বা কেন, য়ুনিফর্ম তো ওর পদমর্যাদার চিহ্ন। নয়নমণি প্রধানের মেয়ে। প্রধান নেপালী ছেলেদের স্কুলের মাস্টারী করেন। মেয়েটি ফরসা, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। দেখলেই ভালো লাগে। দুর্গা ও নয়নমণি কথা বলছে তো বলছেই—দৃশ্যটা চোখে পড়ার মতো। বরুয়া ও চণ্ডীর কাছে ভারি বিসদৃশ লাগছে ওদের এই ব্যবহার। কিন্তু দুর্গাকে ওঁরা বারণ করতেও পারছেন না। ড্রাইভারের কাজ পাবার পর থেকে কাজে কর্মে, হাঁটা চলায়, কথায় বার্তায় দুর্গার একটা নূতন ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে যেন। আর নয়নমণি? সে তো বনফুলের মতো সরল সুন্দর, প্রস্ফুটিত যৌবনের সৌরভ বিতরণ করেই তার যেন পরম আনন্দ। মাঝে মাঝে পান খাচ্ছে, কখনো বা ঝুমুর নাচ দেখছে, পূজোর দিকে তাকাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে ইসমাইলের বাসার নীরব অন্ধকার বারান্দার দিকে—যেখানে একা বসে আছে ইসমাইল। চারিদিকে নয়নমণির চোখ ঘুরছে যদিও, আসলে ওর চোখের সামনে এখন একটা মাত্র লোক—সে হল দুর্গা।

ইসমাইল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বার বার মনে পড়ল পান্নুর কথা। আহমদ সাহেবের বাগানে এক জাতের করবী ফোটে। কাছের থেকে সে ফুল দেখার অনেক বাধা, বেড়া কাছে, মালী আছে। কিন্তু দূর থেকে দেখা করবীটাকে ইসমাইলের খুব ভালো লাগে দেখতে। ওর মনে হল, পান্নু যেন সেই করবী ফুলের মতো। ছিঃ, এসব কী ছাইভস্ম ও ভাবছে। পান্নুকে ওর ভালো লাগে, কত যে ভালো লাগে সে ও কথায় বোঝাতে পারে না। ওর এই গভীর মনের গোপন কথাটা বোধহয় জেবউন্নিসা জানে। জেবউন্নিসা পরমা সুন্দরী। কখনো কখনো একা

একা ইসমাইল যখন পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকায়, জেবউন্নিসার সুন্দর মুখটা ওর চোখের উপর ভেসে ওঠে। ওর রূপে যেন সমস্ত মনটা মজে যায়। কিন্তু তাহলে কি হয়, জেবউন্নিসা এমন মেয়ে নয় যার সঙ্গে ঘর বাঁধা যায়। একটি মাত্র পুরুষকে নিয়ে জেবউন্নিসা কী করে সংসার পাতবে? কিন্তু পান্নুকে নিয়ে ঘর করা যায়—ঘরণীর সবরকম গুণ ওর আছে। সরল মেয়ে, কোমলমতি, কেমন স্নিগ্ধ ওর গায়ের রঙ—কত কর্তব্যপরায়ণ ওর স্বভাব। এই রকম মেয়ে সংসারখানা ধরে রাখতে পারে। বেশি রূপসী হলে বিপদ। রূপমুগ্ধ চাটুকারদের স্তোকবাক্যে ভুলে গিয়ে রূপসী মেয়েরা সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু পান্নুর ধর্ম আর ইসমাইলের ধর্ম তো এক নয়—সেটা একটা মস্ত অন্তরায়। অপর পক্ষে জেবউন্নিসা ওরই মতো মুসলমান—কিন্তু রূপটা যে তার বিপজ্জনক!

একটিমাত্র উঠোনের বাধা। অবশ্য মাঝখানে ধর্মের প্রাচীর একটা খাড়া হয়ে আছে। মনে যা আসে সেরকম কাজ করায় অনেক বাধা এখানে। সবাই তো ডিম্বেশ্বর হাজারিকা নয়। কেমন করেই বা হবে? ডিম্বেশ্বর ধর্মকে ভাবে পরণের পোষাক। একটা যদি পুরনো হয় কিংবা খারাপ হয় তাহলে অন্য একটা ধারণ করতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা নেই।

ওই তো কাছেই গিয়াসুদ্দীনের বাসা। বিছানায় শুয়ে লোকটা এখন নিশ্চয়ই হুইস্কির বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছে, এবং কোনো কিছু একটা পড়ছে। একটু দূরে হলেও ইসমাইল অনুমান করতে পারে গিয়াসুদ্দীন কি পড়ছেন। একটু আগেই চ্যাটার্জি তাঁকে এক কপি ইশতাহার দিয়ে গেছে। গোস্বামীরা ছাপিয়ে বের করেছেন। দেখল—পূজামণ্ডপেও ইশতাহার বিতরণ হল। বরুয়া ও চণ্ডীর হাতেও চ্যাটার্জি একখানা করে দিয়ে গেলেন। ইসমাইলেরটা ও আপাততঃ পকেটের মধ্যেই রেখেছে, পড়তে এখন ইচ্ছা করছে না। য়ুনিয়নের কথা এখন ও ভাবতে পারছে না, ওর অন্তরটা এখনো জ্বলছে অনুতাপের আগুনে। চ্যাটার্জি তো পাশেই থাকে, তাকে দেখলেও ওর কেমন যেন লজ্জা লাগছে। কী কুক্ষণেই না বীরভদ্রের কথায় ও কান দিতে গেল। ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে পড়েছে। বীরভদ্র ওকে যেমন ভুল পথে চালনা করেছিল তেমনি একই সঙ্গে বোধহয় উসকে দিয়েছিল কয়েকজন লাঠিয়াল নিয়ে ওদের উপর হামলা করতে। লোকটা চুকলি-কাটা দুমুখো সাপ। সেই বীরভদ্রও পূজাপ্রাঙ্গণের এক কোণে বসে ছিল, তার হাতেও চ্যাটার্জি এক কপি কাগজ দিল। ইসতাহার নেবার জন্য ওর খুব আগ্রহ ছিল না, তবু হাতে করে নিল এবং পকেটে রেখে দিল। চ্যাটার্জি বিতরণ করছে, সাক্ষর নিরক্ষর সকলেই সাগ্রহে নিচ্ছে।

ইসমাইল একটা সিগারেট ধরাল। এরকম পুতুল নাচ দেখার সময় ওর সিগারেট টানতে ইচ্ছা করে। পুতুল নাচ দেখতে ওর সব সময়েই ভালো লাগে।

পিপরীর জমিদারেরা যখন দেশ গ্রামে আসেন তখন প্রতি বছরই পুতুল নাচ হয়। সেই নাচের সময় দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ, রাজা-প্রজা সবাইকে পুতুল

নাচিয়েরা নাচিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে পূজা মণ্ডপে এক ধরণের পুতুল নাচ চলছে—নাচাচ্ছে বীরভদ্র। সুতো টেনে নয়, টাকার টানে, মানুষকে লোভ দেখিয়ে। দুদিন আগে ইসমাইল নিজেও নেচেছিল। বোধন, রামু, চণ্ডী—এমনকি বরুয়াও পুতুল নাচ নাচছে। সিংজী নাকি ওর জন্যে ঘর বানাবার সব সরঞ্জাম জোগাড় করে দিয়েছে। নূতন সংসার পেতেছেন বরুয়া, ঘরের মোহ ওকে পেয়ে বসেছে এখন। সেই মোহকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য বীরভদ্র ইন্ধন যোগান দিচ্ছে। সিং-এর মনে শয়তান ঢুকেছে—এবং সে শয়তান হল কোম্পানীর সাহেব টাওলার।

চিন্তাগুলি মনে আসছে ইসমাইলের, ছেঁড়া সুতোর মতো টুকরো টুকরো ভাবে। জোড়া দেবার উপায় নেই, দরকারও নেই। রান্নাবান্না করতে ইচ্ছা করছিল না—যদিচ খিদে যে পায়নি এমন নয়। ওদিকে কাল থেকে আবার কাজে যোগ দিতে হবে। উপোস করে থাকাও মুশকিল। রান্না করার জন্য কেউ একজন থাকলে কত ভালো হত। কিন্তু সহজে পাবে কোথায়? একবার ভাবল পূজা-মণ্ডপে যায়, পরক্ষণেই মনে হল বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

ওর চিন্তার স্রোতে ভাঁটা পড়ল। লক্ষ্য করল ঝুমুর নাচ চলছে বেশ দ্রুত লয়ে। নয়নমণি ও দুর্গাও কথা বন্ধ করে তাকাল ঝুমুর নাচের দিকে। প্রেমের আকর্ষণের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হল নাচ। শিবের গায়ে পা দিয়ে মা-কালী তার জিভ কেটেছেন, সে তাঁর লজ্জায় না নাচ দেখার বিস্ময়ে। পূজারী ঘণ্টা নেড়ে মন্ত্র পড়ছে, পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে—তারই ফাঁকে ফাঁকে এক নজর ঝুমুর নাচ দেখে নিচ্ছে। ইসমাইল দেখল এবার নাচতে লেগেছে সেই চা-বাগানের কামিনরা নয়—লছমী। লছমীর নৃত্যপর পায়ের ছন্দে মনে হল মণ্ডপের মেঝেটা বুঝি ফেটে যাবে। দেহটা দুলছে, কোমর উঠছে নামছে। সেই নৃত্যের ঢেউ এসে লাগছে দর্শকদের মনে তো বটেই—ইসমাইলের মনেও। চ্যাটার্জি কাগজ বিতরণ ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লছমীর দিকে। রামু তো একেবারে পাগল হবার দাখিল। বীরভদ্র সিং কিন্তু তাকাতে পারছে না লছমীর দিকে চোখ তুলে। কামনার যন্ত্রণায় তার মুখে চোখে এক দারুণ অস্থিরতা। চণ্ডী তাকিয়ে আছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। তাকাবারই কথা। লছমী এখন আর লছমী নয়—যেন যৌবনের ভরা নদী। যেন সেই নদী তরঙ্গ তুলে নাচছে। লছমীর এই মূর্তি ইসমাইল ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। আজ দেখে সে-ও মুগ্ধ।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে একটু চোখ বুজল। এভাবে চোখ বোজাটাও যেন সেই বিচিত্র পুতুল নাচের একটা অঙ্গ।

'তুমি খাবে না আজ? না কি লছমীর নাচ দেখেই পেট ভরে গেছে?'

ইসমাইল ঘাড় ফিরিয়ে দেখে পান্নু। অন্ধকারেও পান্নুর তন্বী দেহের সঞ্চারিনী ভাবটুকু সে যেন অনুভব করল। কিন্তু তার খুব অভিমান, বলল, 'আমি খেলাম কি না খেলাম তাতে তোমার কি? নাচ খুব সুন্দর, কিন্তু নাচ দেখে খিদে মেটে বলে কোথায় শুনেছো?' পান্নু গলাটা নিচু করে বলল, 'খাবে না কেন? জোয়ান

মানুষ, না খেলে চলবে কেন ? যুবকের খিদে যুবতীর নাচ দেখে মেটে না বুঝি ?'

ইসমাইল বলল, 'তোমার মাথা আর মুণ্ডু !'

পান্নু হাসতে লাগল, 'এভাবে না খেয়ে তোমার থাকা তো চলবে না। আমাদের ঘরে মোহনভোগ আছে, আমি নিয়ে আসছি। উনুনে জল গরম হচ্ছে, একটু চা-ও খাবে।'

পান্নু বেরোতে যাচ্ছে, ইসমাইল তাকে বলল, 'তোমাদের বাড়ির কোনো জিনিস আমি চাই না খেতে।'

'কেন ?'

ইসমাইল কোনো জবাব দিতে পারল না। ওর লোভের আসল কারণটা বলতে ওর মুখে আটকাল। পান্নু হেসে বলল, 'তুমি কি বলতে চাও আমি ঠিক বুঝেছি। পুজোয় তোমায় ডাকেনি বলে রাগ হয়েছে। কিন্তু কাউকে ডাকা বা না-ডাকা তো আমার এক্তিয়ারে নয়। পুজো তো হচ্ছে সার্ব্বজনীন। বীরভদ্র সিং-ই সবকিছু করেছে। সে সব কথায় গিয়ে দরকার নেই। আমি খাবারটা নিয়ে আসি, তুমি ঘরের ভিতরের আলোটা একটু জ্বালাও।'

পান্নু চলে গেল। খানিকক্ষণ বাদে পান্নু একখানা পাতায় করে মোহনভোগ নিয়ে এল, আর এক গেলাস গরম চা। তখনো ইসমাইল অন্ধকারে বসে আছে দেখে, পান্নু রাগ করে বলল, 'এখানে বসে আছো। চলো ঘরের ভিতর।'

ইসমাইল বলল, 'খেতে দিতে চাও তো এখানেই দাও। আমি ভিতরে যাব না। এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।'

পান্নু মোহনভোগ ও চায়ের গেলাসটা রেখে ফিরে যেতে বেরোল। ইসমাইল বলল, 'গেলাসটা নিয়ে কি করব ?'

পান্নু বলল, 'এখানেই থাক।' আবার যাবার উদ্যোগ করল সে। ইসমাইল আপন মনে মোহনভোগ খেতে লাগল। খানিক পরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি না কি পড়াশুনো করতে লেগেছো জাহানারার ওখানে। সত্যি নাকি ?'

'হ্যাঁ,' পান্নু জবাবে বলল, 'কেবল আমি না, লছমীও পড়ছে।'

'লছমীও পড়ছে ?' বলে ইসমাইল পান্নুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

হঠাৎ ওর মনে কেমন যেন তোলাপাড় হতে লাগল। একটু পরে দেখল আপন মনে কী একটা কথা ভেবে পান্নু বারান্দার ওপর কি যেন আঁকিবুকি করছে। 'কি পড়ছে ?' ইসমাইল জিজ্ঞেস করল।

'অসমীয়া নামতা', পান্নু জবাব বলল।

ইসমাইল মোহনভোগের পাতাটা ছুড়ে ফেলে দিল। চায়ের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে আগ্রহভরে চেয়ে রইল পান্নুর দিকে। মেয়ে মানুষ লেখাপড়া করছে—না, পান্নু ও লছমী পড়ছে, সদাসর্বদা চোখে দেখা যায় এমন দুটি মেয়ে !

ইসমাইল এক চুমুক চা খেয়ে কিছুক্ষণ বসে বসে কী যেন ভাবল। তারপর আরেক চুমুক খেল। এইভাবে চা খেতে খেতে ও কল্পনায় যেন দেখল পান্নুরা সব

লেখাপড়া করে বিদুষী হয়েছে। কেন লেখাপড়া ধরতে হল ওদের ? এখনো ওদের বর পাওয়া গেল না বলে কি ?

ইসমাইল মাঝে মাঝে সেকথা ভাবে। পুরুষদের তবু কাজ আছে, চাকরী আছে। ইচ্ছা মতো এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে। কিন্তু মেয়ে হলে একমাত্র গতি—বিয়ে। বিয়েই ওদের চাকরী।

তার চেয়েও গভীর ভাবনা এল ওর মনে। জেবউন্নিসা ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ও চায় না। জেবউন্নিসার ইতিহাস যারা জানে তারা কেউ কি ওকে বিয়ে করতে পারে ? পান্নুকে কিন্তু ওর খুব ইচ্ছা হয় বিয়ে করতে। ধর্মের বাধা না থাকলে আর কোনো বাধা তো ছিল না। পান্নুও ওকে ভালো চোখেই দেখে, কিন্তু আরো বেশি এগোতে পারবে কি ? পান্নুর কথা যেমন ভাবে, লছমীর কথাও ওর মাঝে মাঝে মনে হয়। আজ লছমীর নাচ দেখে একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল ! মেয়ে তো নয়—যেন অগ্নিশিখা। আর পান্নু যেন প্রখর গ্রীষ্মের সময়কার একটি হাত পাখা—একটু হাওয়া দিলে শরীর মন জুড়িয়ে যায়।

এই যে কাছাকাছি পান্নু রয়েছে, এতেও ওর ভালো লাগছে।

'লেখাপড়া করে কি করবে ?' ইসমাইল শুধোল।

পান্নু বলল, 'বই পড়ব।'

ইসমাইল অবাক হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পান্নু যেন বার বার কাতর হয়ে তার অন্ধকার ঘরটার খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ পান্নু জিজ্ঞেস করল, 'জেবউন্নিসার সঙ্গে কথাবার্তা তাহলে চালাতে চাও না নাকি ?'

ইসমাইল এবার একটু সহজ হল। কিন্তু গলা থেকে তার কথা বেরোতে চায় না, লজ্জা তাকে চেপে ধরেছে।

পান্নু আবার শুধোল, 'শুনলাম জেবউন্নিসা নাকি এসেছিল তোমার খবর নিতে ? কী বললে তাকে ?'

ইসমাইল স্তব্ধ, কথা বেরোতে চায় না গলা থেকে। পান্নু হেসে হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কই, কিছু বলছো না যে, জেবউন্নিসার কি হল ?'

ইসমাইল বহু কষ্টে জবাব দিল, "দেখো পান্নু—। জেবউন্নিসার খুব ইচ্ছা আমি তাকে বিয়ে করি। আজ হাসপাতালেও গিয়েছিল। ডিব্রুগড় থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিল আমায় দেখতে। কিন্তু...'

'কিন্তু কি ? এমন পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দরী মেয়ে, ওকে বিয়ে করবে না কেন ?' পান্নু বলল।

ইসমাইল এবারে সাহস করে বলল, 'না, ওকে আমি বিয়ে করব না।'

'কিন্তু কেন ?' পান্নু সরলভাবে জিজ্ঞেস করল। ইসমাইলও এবারে সরলভাবে নিজের মনের কথা বলল, 'না, ওকে বিয়ে করতে চাইনা। তোমার মতো কাউকে যদি পেতাম...'

পান্না হেসে ফেলল, 'তার মানে আমাকে ?'

'হ্যাঁ', ইসমাইল আশায় ভর দিয়ে এবার বলল।

'সে কথা কি তোমার বলা ঠিক হয় ? দেখছো না তোমার ও আমাদের বাড়ির মাঝখানে এই একটা উঠোনের ব্যবধান আছে। আর কেবল কি তাই ? আরো একটা বেড়া আছে দু'জনের মাঝখানে—খুব শক্ত সেই বেড়া। একেবারে লোহা দিয়ে তৈরি।' পান্না বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইসমাইল উত্তর দিল, 'বুঝেছি। ওই বেড়াখানা কি ভাঙা যায়না ?'

পান্না হেসে বলল, 'তোমার সাধ্য আছে ?'

'আছে', সহজ প্রত্যয়ে ইসমাইল বলল।

'আমার সাধ্যের বাইরে। আমি তো তোমার মতো সাহসী নই। আমি ধর্ম মানি, মনে আমার ভয় আছে।' পান্না খোলাখুলি ভাবে বলে চলল, 'ভয় থেকে কখনো যে মুক্তি পাব, মনে হয়না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার নিজের মনেই বলল, 'কখনো মুক্তি পাই তো আলাদা কথা। কিন্তু এ সমস্তই বাজে কথা'।

ইসমাইল এরকম জবাবটাও আশাপ্রদ বলে মেনে নিয়েছিল। সে বুঝতে পারে পান্না কিরকম মেয়ে। তার বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। তার মনের আসল ভাব সে ব্যক্ত করবে কিংবা গতানুগতিকের বাইরে অসাধারণ কিছু করবে—তা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু সে যেন একটু একটু বুঝতে পারে যে পান্না তাকে ভালোবাসে। কথাটা ভাবলেও তার বুকখানা শীতল হয়। ভালো যদি না বাসত, তাহলে পান্না এভাবে কথা বলতে পারত না।

পান্না শুধোল, 'তুমি জেবউন্নিসাকে বিয়ে করতে চাও না কেন ? এখন সে আর আগের মতো নয়। ভালো হয়েছে। দু' দিন বাদে সে নার্স হয়ে আসবে। হ্যাঁ, দোষ তার হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না। সেজন্য ওই সায়েবটাই দায়ী।'

ইসমাইল চায়ের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'তা হোক, এঁটো গেলাস থেকে জল খেতে খারাপ লাগে।'

পান্না হাসতে হাসতে বলল, 'পুরুষদের মধ্যে বুঝি 'এঁটো' গেলাস নেই ?'

ইসমাইল চুপ করে রইল। গেলাসটা মেঝের উপর রেখে এক মনে লছমীর নাচ দেখতে লাগল। লছমী এবার যেন অঘ্রাণের পাকা ধানের ক্ষেতের মতো হাওয়ায় দুলে দুলে নাচছে। শরীরে যেন তার বিজুলী খেলছে। মাদলের বোল দ্রুত হল, তারই তালে তালে ইসমাইলের বুকটাও যেন অতিদ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। বীরভদ্র সিং-এর মুখে একটা বিস্ময়ের উত্তেজনা। মুখখানা ঘেমে উঠেছে। গেলাস থেকে এক ঢোক মদ খেয়ে নিল। বরুয়া আবার পড়তে লাগল ইশতাহার। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না পড়তে, আবার চোখ ফেরাল লছমীর নাচের দিকে।

নাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পান্না ও ইসমাইল যেমন ছিল তেমনি বসে রইল।

শেষ হবার পর পান্নু বলল, 'এবার আমি চলি। এখন কাকে কি দিতে হবে কোনো ঠিক নেই। শোনো, তুমি কিন্তু আমার কথা অমন করে ভেবো না।'

ইসমাইল অসহায়ের মতো বলল, 'আমি পারি না।' অন্ধকারে ঢোক গিলে আবার বলল, 'তোমায় আমার খুব ভালো লাগে, পান্নু—'

'জানি সে কথা।' পান্নু বলল। নিজের অজান্তেই ওর চোখ দুটো নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। অন্ধকারে ইসমাইলের সেটা নজরে পড়ল না।

ইসমাইলের মনের সব তিক্ততা যেন দূর হয়ে গেল। মোড়া ছেড়ে সে দাঁড়াল, আর নিচু গলায় পান্নুকে বলল, 'তোমায় আমার খুব ভালো লাগে, জানো? তুমিও আমায় ভালোবাসো।'

পান্নুর সামনে দাঁড়িয়ে ওর হাতখানা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পান্নু নিতে দিল না।

হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি এবার যাই, তাহলে।'

ইসমাইল অন্ধকারে পান্নুর মুখখানা একবার দেখতে চেষ্টা করল, দেখতে পেল না। দেখতে পেল কেবল চোখদুটো—পাতলা একটা জালের তলায় রূপোলি মাছের আভাস মাত্র। পান্নু বলল, 'আমার কাছ থেকে তুমি কোনো আশা কোরো না।'

'কেন?' ইসমাইলের স্বরে বিরক্তি। মাথার ব্যাণ্ডেজের উপর একটা হাত বুলিয়ে সে অস্বস্তি প্রকাশ করল।

'আমার অত সাহস নেই জেনো। জাহানারার মতো আমি করতে পারব না।' পান্নুর গলাটা যেন ধরে উঠল। 'তাছাড়া, নিজেও আমি নিজের মনকে এখনো ঠিক জানি না।'

ইসমাইল কিছুটা সময় চুপ করে রইল পান্নুর কথাগুলি ভালোভাবে বুঝতে। তারপর বলল, 'বুঝেছি।' ওর মুখখানা অভিমানে ভরে গেল।

পান্নু নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ণ সুরে বলল, 'তুমি কিন্তু আমার জন্য পথ চেয়ে থেকোনা। বুঝেছো? আমার নাগাল পাবে না। আমার মনটা কেমন যেন, বিয়ে করতে আমার ইচ্ছে নেই। পড়াশুনো করে একটা কোনো কাজ করতে চাই।'

'ওসব কথা এখন রাখো তো—।' ইসমাইল একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। পান্নুর কথা ও ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। বলল, 'তুমি এখন যাও তো। মানুষ দেখলে মন্দ বলবে।'

পান্নু বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু একটা কিছু ঠিক করো। জেবউন্নিসার সন্ধান করো। ওকে আমার খুব ভালো লাগত, জানো?' এই বলে পান্নু ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ইসমাইলের বাড়ির সামনেই সেই মাঠ, আর সেই মাঠের পাশে অশথ গাছতলায় সেই কুষ্ঠরোগীটা তখনো কাতরাচ্ছে 'মাগো, মা—গো, মা—গো।' এই কাতর

কান্নাটা ওর একটুও ভালো লাগছিল না। সে তার নিজের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল ওই 'মাগো' কান্নার মধ্যে কোথাও যেন ওর নিজের বেদনাটাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

পূজা মণ্ডপ থেকে বরুয়া ও আরো অনেকে এবার উঠে চলে যাচ্ছে। রাত বেশ হল। প্রধানও বরুয়াদের পিছন পিছন চলছে। আস্তে আস্তে তাদের আর দেখা গেল না, অন্ধকারের মধ্যে সবাই মিলিয়ে গেল। রাস্তায় এখন দেখা যাচ্ছে কেবল জোনাকির আলো।

নয়নমণি ও দুর্গা আবার কথাবর্তা শুরু করেছে। বীরভদ্র লছমীর সঙ্গে কথা বলার অছিলা খুঁজছে কিন্তু লছমী তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। রামু চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে বীরভদ্রের দিকে—চাহনীটা হিংস্র বাঘের মতো। ইসমাইলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। খারাপ অবশ্য লাগবারই কথা। নারীর প্রতি প্রেম ও নারীদেহের প্রতি লোলুপতা—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু ঠিক প্রভেদটা কোথায় বলা শক্ত।

পুতুল নাচ দেখার শখ ইসমাইলের মিটে গেল। সিগারেটে টান দিতে দিতে সে এবার চলতে শুরু করল গিয়াসুদ্দীনের বাসার দিকে।

এগার

ইসমাইল সোজা গিয়াসুদ্দীনের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। গিয়াসুদ্দীন বিছানা থেকে উঠে ইশতাহারখানা সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে শুধোল, 'এটা পড়েছো?'

ইসমাইল বলল, 'না পড়িনি।'

তাহলে পড়ো। তুমি তো কিছু একটা খেয়ে যাবে—কেমন?' এই বলে ইসমাইলের জবাবের অপেক্ষা না রেখেই জাহানারার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'শুনছো জাহানারা, ইসমাইলও খাবে এখানে।' জাহানারাও ভিতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'বেশ'—তারপর রান্নাবান্না করে যেতে লাগল।

ইসমাইল ইশতাহার পড়ায় কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আরো কেউ কেউ আসবে নাকি?'

'হ্যাঁ, নাসিরুদ্দীন। বিয়েটা হয়ে যাবার পর থেকে ক্রমাগত ভোজ খাবে বলছে। নতুন গৃহিনী এলে কাউকে কাউকে খাওয়াতে হয়, বুঝেছো?' গিয়াসুদ্দীন জবাবে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এক পাত্র মদ হবে নাকি?'

'আমি মদ খাই না।' ইসমাইল গম্ভীর সুরে জবাব দিল।

'তাহলে ইশতাহারটাই পড়ো। আমি ততক্ষণ একটু মদ খেয়ে নি। খাওয়া-দাওয়া

সেরে আবার ফিল্ডে বেরোতে হবে। নতুন একটা খনিতে ড্রিলিং হচ্ছে। জিলাপসীর মাথা ঘুরে গেছে। আমি হাতের কাছে না থাকলে ওর খুব ভয় করে। অন্যদিন আমি খনিতে বসেই খেয়ে নি। কিন্তু জাহানারা আজ মাথার দিব্যি দিয়েছিল বলে বাড়িতেই খেতে এসেছি। তুমি কিন্তু বেশ আছো। বিয়ে থা না করে একা-একা থাকাই ভালো। মেয়েদের নিয়ে ভারি ঝঞ্ঝাট।' এই বলে গিয়াসুদ্দীন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলমারী খুলে একটা হুইস্কির বোতল, সোডা আর একটা গেলাস এনে রাখলেন টেবিলের উপর। তারপর গেলাসটা ভরতি করে একটু একটু চুমুক দিয়ে খেতে লাগলেন।

ইসমাইল ইশতাহারখানা হাতেও স্পর্শ করল না। গিয়াসুদ্দীনের আত্মভোলা মুখখানা দেখতে লাগল বিহ্বল দৃষ্টিতে। লোকটার ভিতর-বাহির খোলা, কোনো কুচুটেপনা নেই। কপটতা নেই। যথাসাধ্য লোকের উপকার করেন, আবার অন্যায় বরদাস্ত করতে পারেন না। বিরুদ্ধতা যখন করেন ভাসা ভাসা ভাবে করেন না, আন্তরিকতার সঙ্গে করেন। মানুষটা একেবারে নিখুঁত। প্রথম বিয়ে করা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করেছেন বলে অনেকে ছি ছি করে। কিন্তু ইসমাইল তা অন্যায় বলে মনে করে না। উনি ছেলেমেয়ে চান, সেইজন্য অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাইলেন। করলেনও বিয়ে।

গিয়াসুদ্দীন সাহেবের জীবনকথাও কারো অবিদিত নয়। ডিগবয় শহরে মানুষের অতীত নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের জীবন কথা মজুরদের মুখে মুখে। ওরা ওঁকে একালের অতিমানুষ-বিশেষ বলে মনে করে। মনে করার কথাই। বাপ ছিলেন কাছেপিঠে কোন্ এক চা-বাগানের বড়-বাবু। ঘোরতর মদ্যপী মানুষ। দু-তিনটি বিয়ে করেছিলেন, মদে মাংসে আহার করতেন ভালো। আবার কাজেকর্মেও ভালো ছিলেন, চা-বাগানের কুলীকামিন এক কথায় উঠত বসত। ডিম্বেশ্বর পড়তেন গৌহাটির কটন কলেজে, সেখানে ভালো খেলোয়াড় বলে বেশ নামডাক ছিল। কেবল শরীর স্বাস্থ্য যে ভালো ছিল এমন নয়, লেখাপড়াতেও বুদ্ধি ছিল বেশ। বি.এস-সি পাশ করেই ঢুকেছিলেন কোম্পানীর কাজে। সেখানে ড্রিলিং-এর কাজ একেবারে শুরু থেকে শিখে নিয়ে সে কাজে ওস্তাদ বলে গণ্য হয়েছিলেন। জিওলজিস্ট থেকে শুরু করে সাধারণ মজুর পর্যন্ত সবাই জানে ডিম্বেশ্বরের কাজ কত পরিপাটি। সায়েবরাও খুব ওকে পছন্দ করে। এই রকম ব্যোমভোলা অথচ সকল কাজে পটু মানুষকে ভালো না লেগে পারে? তবু ইসমাইল ওঁর মধ্যে একটা খুঁত আবিষ্কার করেছে। কাজে পরিপাটি হলে কি হবে, জীবনযাত্রাটা কেমন যেন অগোছালো। মানুষটাও ছোটো ছেলের মতো সহজ। রুচি উন্নত নয়, চাকরীতে উন্নতি করারও স্পৃহা নেই।

ইসমাইলকে চুপচাপ দেখে গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কী হল? ইশতাহারটা পড়ো!'

ইসমাইল বলল, 'না, পড়তে আমার ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?'

ইসমাইল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে বলল, 'কেন, তা বলতে পারব না।'

গিয়াসুদ্দীন আরো এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি, নিশ্চয় কোনো একজনের কথা ভাবছো।'

'হ্যাঁ'।

'বলব, কার কথা ভাবছো তুমি?' গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন। ইসমাইল উপরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল, কোনো কথা না বলে। গিয়াসুদ্দীন বলল, 'পান্নুর কথা।'

এবার ইসমাইল সজাগ হল, বলল, 'হ্যাঁ তাই। মিছে কথা বলব কেন? কিন্তু পান্নুকে যে পেতে পারব না আমি।'

তোমাদের দুজনের সাহস নেই। গিয়াসুদ্দীন বললেন।

'সেইজন্যই তো আপনার সাহসটুকু পেতে চাই। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহসের কথা অবান্তর। পান্নু তার বাপকেও ছাড়তে পারবেনা, ধর্মকেও নয়।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইসমাইল বলল, 'ওর অমতে আমি কিছু করতে চাই না।'

'বুঝেছি।' গিয়াসুদ্দীন আরো দু' চুমুক হুইস্কি খেয়ে মনে মনে ইসমাইলের সমস্যাটা ভাবতে লাগলেন। ইসমাইল কী করতে চায়? বিয়ে তো?

এমন সময় 'বাড়ি আছেন তো?' বলে নাসিরুদ্দীন ডাক ছাড়লেন।

নাসিরুদ্দীনের দেখা পেয়ে ইসমাইল খুব খুশি। লোকটা গল্পের জাহাজ। বলতে শুরু করলে ওঠা যায় না—বিশেষ করে সায়েবদের গল্প যদি হয়। একটা ছোট মোড়ার উপর নাসিরুদ্দীন বসলেন, তার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খবর, ইসমাইল? জেবউন্নিসা তোমায় বুঝি দেখতে গিয়েছিল?'

ইসমাইল বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিল হাসপাতালে।'

নাসিরুদ্দীন ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'এই পাগলী নাতনীটার জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয়, জানো ইসমাইল। মেয়ে তো নয়, একেবারে খাঁটি সোনা। কেবল তুমিই তাকে চিনতে পারলেনা।'

ইসমাইল চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল। গিয়াসুদ্দীন এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে বললেন, 'জেবউন্নিসার বদনাম আছে বলে বোধহয় ওর ওদিকে মন নেই। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে এত কি ভাববার আছে? আমি বলি কি আগুপিছু না ভেবে করে ফেলো।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'সবার বড়ো কথা হল মনের কথা, বুঝলেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব। মনকে বোঝানো শক্ত। পুরুষের মন চঞ্চল—সে বেশ্যাকেও উপভোগ করতে চায় আবার বিয়ে করে ঘর বাঁধতেও চায়। এটা ঠিক নয়। সায়েবদের বাংলো বাড়িতে দেখেছি একই দরজা দিয়ে রাতে বেশ্যাও ঢোকে আবার মেম-সায়েবরাও। মেয়েদের কি আবার রকমফের আছে? সব মেয়েই একই ছাঁচে গড়া। আমরা আলাদা করে দেখি, সে কেবল মনের ভুল। এক সায়েবের গল্প বলি শুনুন।

ডুমডুমার চা-বাগানে এক বড় সায়েব ছিল, নাম এণ্ডারসন। তার রক্ষিতা ছিল এক কুলী-কামিন। এক কেবল রঙের কথাটা বাদ দিলে, কী তার চেহারা! একেবারে পরীর মতো। সায়েব তো প্রেমে মজে গেল। এদিকে সায়েবের ঘরে মেমসায়েব আছে। মেম যেদিন ঘরে থাকে না, কালো মেম এসে বাংলোতে থাকে। চার বছর ধরে তো এই ভাবে চলল। একদিন মেমের কাছে ধরা পড়ল হাতে নাতে। তারপর সাদায় কালোয় হাতাহাতি জড়াজড়ি চুলোচুলি—অর্থাৎ যা না হবার সব হল। পরের দিন মেমসাহেব তালাক দিয়ে চলে গেল কলকাতা। কিন্তু এণ্ডারসন সায়েব কালো মেয়ের প্রেমে অচল অটল—হিমাচল। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কী তাদের প্রেমালাপ, শুনে অবাক লাগত। সায়েবকে দেখে মনে হত সে যেন হাতে এমন কিছু পেয়ে গেছে যা নাকি পাওয়া যায় না। ডুমডুমায় ছিলাম বিশ বছর, সেই বিশ বছর ধরে কুলী মেম বাংলো বাড়িতেই থেকে গেল। তারপর সায়েব বিলেত ফিরে গেল। বিদায় কালে কুলীমেমকে দিয়ে গেল ঔরসজাত একটি মেয়ে, টাকাপয়সা আর একটা পুরুষ মানুষ। লোকটা টাকাপয়সা পেয়ে প্রায় রাতারাতি বেশ বড়ো একজন কন্ট্রাকটার হয়ে গেল। কিছুদিন বাদে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিল। ওর নিজেরও ছেলেপুলে হল। এখন সে আর ঠিকাদার নয়, নামজাদা কন্ট্রাকটার। এখন সে সায়েবদের মতো রক্ষিতা রাখে।'

ইসমাইল অবাক হয়ে গল্পটা শুনল। তার অনুমান হল, ওই লোকটা নিশ্চয় বীরভদ্র সিং। কিন্তু নাসিরুদ্দীন যখন কোনো কাহিনী বলে, টীকাটিপ্পনী করতে চায় না। তাতে না কি রসভঙ্গ হয়। তাছাড়া সব কথা বিশদ করতে গেলে অনেক প্রতিষ্ঠাবান লোকের সম্মানহানি হতে পারে।

গিয়াসুদ্দীনের একটু যেন নেশা ধরেছে, বললেন, 'বেশ লাগছে গল্প শুনতে। আরো কিছু গল্প যদি থাকে তো বলেই ফেলুন।'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'আমার ঝুলি ভরতি গল্প, কত শুনবেন? আরেকটা বলি, শুনুন—মিস ম্যাকফারসেন্-এর কথা। এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, দেখতে একেবারে গোলাপফুলের একটি তোড়ার মতো। কোম্পানীর এক সায়েবের ঔরসে কলকাতার কোনো প্রেমিকার গর্ভে তার জন্ম। বাপের নামটাই নিয়েছিল মেয়ে। বাপের সূত্রেই চাকরী পেল কোম্পানীতে। চাকরী পেয়ে এখানে এল যেন বাঘিনী—পুরুষ মাত্রেরই ঘাড় মটকাতে চায়। অনেকেই ওর ফাঁদে পড়ল—কেমন করে জানিনা, ফাঁদে পা দিল এক দক্ষিণ ভারতের ইঞ্জিনীয়র। মানুষটা আমাদের এই ইসমাইলের মতো—এঁটো গেলাসে জল খেতে চায় না। কিন্তু মদনের বাণ অব্যর্থ আর মিস্ ম্যাকফারসেনের হাতের টিপটাও ছিল ভালো। একখানা বাণ বুকে এসে লাগতেই ইঞ্জিনীয়র সাহেব ধরাশায়ী হল ও নিরুপায় হয়ে ফিরিঙ্গি মেয়েটির হাতে আত্মসমর্পণ করল। এখন দুজনে সুখে ঘরসংসার করছে। আছে কোম্পানীর কলকাতা অফিসে। কখনো কখনো এখানেও আসে। তখন পূর্ব প্রেমিকদের সঙ্গে আলাপ-

সালাপ করে যায়। মোটকথা, প্রেম আর মন দুটোই জলের মতো, যে-আকার বা যে রঙের গেলাসে রাখো, তার রূপ নেয়।'

ইসমাইল গল্পটা শুনে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নাসিরুদ্দীন সাহেব, এসব লোক মানুষ না জন্তু বিশেষ? বলুন তো?'

'মানুষ'। নাসিরুদ্দীন তাঁর শাদা পাঞ্জাবীর আস্তিনে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানুষের অর্ধেকটা তো জন্তুই। সায়েবদের প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো কুকুর থাকে, দেখেছো তো? আমি প্রথম যখন ডিগবয়ে ফিলিপস্ সায়েবের খানসামা হয়ে এলাম, তখন সায়েবের ছিল মস্ত একটা মাদী কুকুর—কালো রঙের একটা অলসেশিয়ান। তাকে কখনো কখনো নিয়ে যেতে হত মদ্দা কুকুরের কাছে। মাদী কুকুরের কখন যে কামরোগ হয় সে আমার জানা ছিল না। দুয়েক দিন কালো কুকুরটা খেঁকিয়ে আমায় কামড়াতে এসেছিল। বাদ বাকি সময়টা কাম ভাবে একেবারে অচেতন হয়ে শুয়ে থাকত। একদিন সন্ধ্যাবেলা ফিলিপস্ সায়েবের নজরে পড়ল। সায়েব হেসে হেসে আমায় বলল, 'এই, তুই দেখতে পাস না কুকুরটা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে? যা, এখুনি একে নিয়ে যা এগনেস মেমসায়েবের বাংলোতে—সেখানে ওর দোসর আছে।' তারপর আমার হাতে একটা চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দিল। তখনো আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। বাংলো বাড়ির বাইরে মাঘের হাড়কাঁপানো শীত। এক হাতে চিরকুট, অন্য হাতে সেই মাদী কুকুরটির চেন। এগনেস মেমসায়েবের হাতে চিরকুট দেবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন।

ওদের বুড়ো বাবুর্চিকে শুধোলাম, কি করছেন মেমসায়েব? সে বলল, আমাদের কালো মাদীটার সঙ্গে ওদের বাদামী রঙের অলসেশিয়ানের মিলন হতে পারে কি না পারে, মিলন হলে তা থেকে ভালো ফল অর্থাৎ বাচ্চা পয়দা হবে কি হবে না—এসব প্রশ্ন নিয়ে তিনি অনেক জল্পনা কল্পনা করছেন। শুনে তো আমি অবাক। তারপর মেমসায়েবের হুকুমে আমাদের কুকুরটিকে একটা বড়ো রুমে নিয়ে যাওয়া হল। অর্থাৎ দুই কুকুরের ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখে স্থির হল কোনো প্রকারে যোটক মিলেছে। তারপর মাদীটিকে সেই রুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি বাইরে বসে অপেক্ষা করে রয়েছি কখন সে বেরোবে। কিন্তু মাদীটা আমার কথা যেন ভুলেই গেল—অগত্যা সারা রাত সেখানে বসেই কাটাতে হল। সকাল হতেও প্রেমিককে ছেড়ে আসতে মাদীটার ঘোরতর আপত্তি। শেষে কোনো প্রকারে তাকে নিয়ে নিজেদের বাংলো বাড়িতে ফিরলাম। সেদিন বুঝলাম, এইসব কামঘটিত ব্যাপার হল পাশবিক ব্যাপার। তফাৎ এই যে জন্তুদের বিশেষ বিশেষ ঋতু আছে, মানুষের তাও নেই।'

গল্পটা শুনে ইসমাইল হেসে উঠল। সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এসব গল্প শুনে মজা লাগে ঠিক, কিন্তু খুবই নোংরা গল্প।'

নাসিরুদ্দীন হেসে হেসে বলল, 'নোংরা হতে বাধ্য, মানুষের জন্মটাও তো এক

নোংরা ব্যাপার, কি বলেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব? আপনি রসিক মানুষ, ঠিক বুঝবেন। আর একটা গল্প বলি। জিলাপসী সায়েবের আগে ছিলেন ফাগু'সন সায়েব; ভারি ধর্মভীরু মানুষ। কখনো মেয়েমানুষের ব্যাপারে থাকতেন না। কিছুকাল পরে বিয়ে করবেন স্থির করলেন। পছন্দ হল অভিজাত পরিবারের শান্ত সুশীল সুন্দরী কন্যা। বিয়ের পর দুজনে চলে এল এই শহরে। কিছুকাল বেশ সুখে কাটল। একদিন প্রসব যন্ত্রণা শুরু হতে সায়েব মেমকে নিয়ে রেখে এলেন হাসপাতালে। হাসপাতালে জন্ম নিল একটি মৃত শিশু—যথাসময়ের আগেই। শিশু ও মায়ের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল মেমসায়েবের রক্তে সিফিলিস্-এর বীজ রয়েছে। ফাগু'সন সায়েব হতাশায় মৃতপ্রায় হলেন। দিনে দিনে তিনি শুকিয়ে এমন রোগা হলেন যে অন্য সায়েবরা এক প্রকার জোর করেই দু'জনাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিল। সে দেশে নাকি এসব রোগের ভালো চিকিৎসা হয়।'

গিয়াসুদ্দীন হেসে হেসে বললেন, 'মানুষ যেটা চায় সেটা পায় না, বুঝেছো ইসমাইল? তাই বলি এখন থেকে সাবধান।'

ইসমাইল বলল, 'তবু মানুষের মনকে বেঁধে রাখা শক্ত।'

'শক্ত বলেই কি হাল ছেড়ে দিতে হবে?' নাসিরুদ্দীন বললেন, 'কঠিন হোক না কেন, সহজ করে নিতে হবে। প্রেমের ব্যাপারটা যতই তুমি জটিল করবে, ততই সে তোমার অন্তর কুরে কুরে খাবে এবং শেষে পথের ভিখারী করে ছাড়বে।'

ইসমাইল বলল, 'কখনো কখনো তা-ও খারাপ লাগে না।'

নাসিরুদ্দীন জবাব দিল, 'তবে তো তোমার দেখছি একবারে মশগুল অবস্থা। এই অবস্থার মজাটা কোন জানো? তবে শোনো একটা গল্প বলি। এই বিচিত্র শহরেরই একটি কাহিনী। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে বেশির ভাগ মেমসায়েবের মনে হয়, এ শহরে মানুষ থাকে কী করে? তখন ওদের অবস্থা কেমন হয় জানো? জাহাজডুবির পর কোনো নাবিক যদি এমন একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে—যেখানকার সমস্ত বাসিন্দা অচেনা অজানা অসভ্য বর্বর—সেইরকম। এক-একটা মস্ত বাংলোবাড়িতে একা একা থাকতে থাকতে ওদের স্বপ্নে কখনো উদয় হয় মনপ্রাণ-হরণ-করে-নেবার-মতো কোনো কল্পিত সায়েব যুবক। শয়নে স্বপনে অশনে বসনে উঠতে বসতে তখন তারা কেবল সেই মনের মানুষের চিন্তায় মগ্ন থাকে। আর কিছুতে মন লাগে না। একটা বাংলোবাড়িতে এইরকম একটি মেমসায়েব ছিল—রোগা মতো দেখতে। তার স্বামীটি কাজে কর্মে এমনি ব্যস্ত যে মেমকে সঙ্গদান করতেও সময় পায় না। দুজনে হেঁটে চলে একত্র ঘোরাফেরা করবে—তারও সময় নেই। কেবল রাতে তারা একসঙ্গে থাকে। এইরকম অবস্থা। এমন সময় অকস্মাৎ কলকাতা থেকে এল এক সুদর্শন তরুণ—বিলেতের কোন কাগজে নাকি কাজ করে। সে এসে উঠল ওই বাংলোবাড়িতে। সামাজিক শিষ্টাচারের নিয়মে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় শুরু হল। কয়েকটা দিন ঘরের মধ্যে কাটাবার পর একদিন মেমসায়েবই প্রস্তাব করল দূরে কোথায় যেন

শিকারে বেরোবে। ডিহিং নদীর অপর পারে কোন একটা অঞ্চলে নাকি হরিণ চরতে আসে। সেখানে মাচান বেঁধে দুজনে হরিণ শিকার করবে স্থির হল। দুটো দিন শিকার করে কাটল, তারপর আরম্ভ হল মোটর চড়ে ঘোরাফেরা। কোথায় যে যায় তার ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন রাতেও বাড়ি ফেরে না। মেমসায়েবের এই পাগলপারা অবস্থা দেখে সায়েবের মনে জাগল ঈর্ষা। ঈর্ষা জিনিসটা খারাপ। দশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর, বাংলোবাড়িতে বসে দুই সায়েবের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি। অতঃপর ঘুসোঘুসি। তারপর দু' পক্ষ যখন বন্দুক হাতে আসরে নাবল। মেমসায়েব দুজনার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যখন এই কলহের কারণ, আমাকেই মারো গুলি করে!' তখন দুই পুরুষ সিংহ রণে ক্ষান্ত দিল। পরদিন তরুণ অতিথি ফিরে গেল। কিন্তু মেম-এর মাথায় কী যেন এক ভূত ঢুকল—খায় না দায় না, কথা কয় না, হাসে না কাঁদে না—কেবল এক জায়গায় ঠায় বসে কী যেন ভাবে। শেষে আচম্বিতে একদিন তার মধ্যে পরিবর্ত্তন হতে শুরু করল। সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে থাকে, হুইস্কির গন্ধ ভক্‌ ভক্‌ করে মুখ খুললেই, হো হো করে হাসে হা হা করে কাঁদে, সায়েবের সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়, তর্কে হেরে গেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে। একদিন মাতাল অবস্থায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথাটা ফাটাল, তারপর আরেক দিন বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করার উদ্‌যোগ করতে লাগল। এসব দেখে শুনে সায়েব পাঠিয়ে দিল মেমকে বিলেতে। গেল তো গেল, তাকে আর ফিরে আসতে দেখিনি। কোনো কোনো দিন তার কথা মনে পড়লে সায়েব সারাটা রাত মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। বেশি দিন সায়েবের এখানে থাকা হল না, কম বয়সেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হল। বুঝলে ইসমাইল ভায়া, একেই বলে প্রণয়পীড়া, এ অসুখ ধরলে ওষুধে কিছু হয় না। মরলেও রক্ষা নেই।'

গিয়াসুদ্দীন আর এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে বললেন, 'গল্পটা ভালো, কিন্তু এ প্রেম হল দুর্বলের প্রেম।'

নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'দুর্বলের কেন হবে? এটা সবলেরই প্রেম। দু'জাতের প্রেমিক আছে পৃথিবীতে—একদল লোকচক্ষুর সামনে প্রেমকে প্রকাশ করে আনন্দ পায়। আরেক দল অন্তরের অন্তস্থলে প্রেমকে সুগোপনে রেখে হৃদয়ের দরজায় কুলুপ এঁটে রাখে। ইসমাইল হল দ্বিতীয় জাতের, জেবউন্নিসা প্রথম জাতের প্রেমিক। ওকে আমি খুব ভালো করে জানি। পৃথিবীতে এমন মেয়ে খুব কম দেখা যায়। উপরন্তু রূপসী—মাঝে মাঝে মনে হয় জাহাঙ্গীর বাদশা'র নুরজাহান হয়তো ওরই মতো সুন্দরী ছিলেন। প্রথম যেদিন সায়েবের শোবার ঘরে ওকে পাঠিয়ে দি, সে রাতে আমার চোখে ঘুম ছিল না। কোনো মেয়ে নিয়ে আগে কখনো আমার এমন চিন্তা ভাবনা হয়নি। পরের দিন সকালবেলা ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, আমি ঠিক যে ভয় করেছিলাম তাই লক্ষ্য করলাম ওর মুখে। কালো কেউটে সাপের দংশনে সমস্ত মুখটা যেন নীল হয়ে গেছে, শরীর পাণ্ডুর। মুখে একটা কথাও বলতে আমি পারলাম না, মনে হল আমার গুণাহ হয়েছে।

সেদিন থেকে প্রায়ই চোখ রেখেছি ওর ওপর। দেখেছি কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেমন কলায় কলায় হ্রাস পেতে থাকে, তেমনি বাংলোবাড়িতে যাবার ফলে প্রতিদিন ও যেন শুকিয়ে ক্ষীণ হতে লাগল। অবশ্য সেটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। শেষে দেখি নিজেই একদিন এসে জেবু আমায় বলল, দাদাজান, আর আমি এখানে আসব না। আমিও বললাম, সেই ভালো, তাই করো। তারপর কি যে হল সে তো আপনারা জানেন, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। সে এখন চাইছে মনে প্রাণে ভালো হতে, আর সেই সূত্রে তোমায় আপন করে নিতে চাইছে, ইসমাইল। তুমি ভালো করে ভেবে দেখো ওর কথাটা। মনে কোরো না ও নষ্ট মেয়ে, জেবু হল নাসিরুদ্দীনের নাতনী। বুঝেছো? ও কখনো খারাপ হতে পারে না। আমার নিজের বিবিকেই তো সায়েব কেড়ে নিল। কিছু কি করতে পারলাম আমি? যদ্দিন এই সায়েবরা এখানে আছে, এরকম কাজ ওরা করবেই। তাই বলি, ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখো কথাটা, চট করে 'না' বলতে যেয়ো না।'

বুড়ো নাসিরুদ্দীনের তেষ্টা পেয়েছিল বলে ঘন ঘন গিয়াসুদ্দীন সাহেবের হুইস্কির বোতলের দিকে নজর করছিল। গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'মাপ করবেন নাসিরুদ্দীন, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। দাঁড়ান, একটা গেলাস আনি।' এই বলে উঠে গিয়ে হুইস্কি সোডা মিশিয়ে গেলাসটা তাঁর সামনে ধরলেন। নাসিরুদ্দীন একটা চুমুক দিয়ে একবার ইসমাইলের দিকে তাকালেন, চোখ বুজে ইসমাইল কী যেন ভাবছে। গিয়াসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'সায়েবরা যদ্দিন এ-দেশে আছে, কেবল মেয়েদের কেন পুরুষদেরও কোনো সুখ নেই এ শহরে, বুঝেছেন? আপনি এই ইশতাহারখানা পড়েছেন, নাসিরুদ্দীন সাহেব?'

'না', নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'এটা ইশতাহার বুঝি। পড়ুন তো একটু।'

গিয়াসুদ্দীন ইশতাহারটা টেনে নিয়ে বললেন, 'ইসমাইলকে পড়তে বললাম, ও পড়ল না। আমিই পড়ছি, শুনুন।' গিয়াসুদ্দীন পড়তে শুরু করলেন :

'সায়েবরা মূলধন দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে—এবং এইসব দিয়ে খনি থেকে তেল বের করে শোধন করার ব্যবস্থা করেছে। সে তো ভালো কথা। কিন্তু সেই কারণে তারা মজুরদের সকলকে দাবিয়ে রাখবে—সে কী করে সম্ভব? শহরে কোনো মজুরের চাকরীর স্থায়িত্ব নেই। লেবার ব্যুরো ইচ্ছামতো মজুর নিযুক্ত করে, আবার বরখাস্তও করে। কোম্পানী মজুরদের আইনসংগত ছুটি-ছাটা দেয় না, তাদের পালাপার্বণে স-বেতন ছুটি মঞ্জুর করে না। মজুরীর হারও খুব কম। দৈনিক-হাজিরা আট দশ আনা মাত্র। কেরানীরা নিম্নতম বেতন পায় মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র। ডাক্তার-হাসপাতালের সুবিধা আশানুরূপ নয়। দুর্ঘটনা ঘটলে নিয়মিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। কিছুদিন আগে অসন্তুষ্ট খনি-মজুরেরা নিরুপায় হয়ে কাজ বন্ধ করে। মজুরেরা চেয়েছিল ওভার টাইমের পয়সা, টিফিন এবং পালাপার্বণে স-বেতন ছুটি। সপ্তাহান্তেও তারা ধরাবাঁধা নিয়মিত

ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। উপরন্তু সামান্য অপরাধে খনিমজুর একজনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কাজ থেকে। এইসব কারণে মজুরেরা কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।'

এইটুকু পড়ার পর গিয়াসুদ্দীন এক চুমুক খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। ইসমাইল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। ইশতাহারের কথাগুলি ওকে আগ্রহী করে তুলল। খনি-মজুরদের তাড়িয়ে দেবার দৃশ্যটা ওর চোখের উপর ভেসে উঠল যেন। ছি ছি, কেন যে ও গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গ ধরে স্টেশন পর্যন্ত যায়নি! যাওয়া উচিত ছিল। এতদিন একসঙ্গে যাদের সঙ্গে কাজ করেছে সেই সব বিতাড়িত মজুরেরা ওর বিষয়ে নিশ্চয় বলাবলি করে থাকবে, 'ইসমাইলের মনে একটু স্নেহ বা সহানুভূতিও নেই। ফোরম্যান হয়ে সে ভাবছে বুঝি রাজা-উজির হয়ে গেছে।' ইসমাইল আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'ইশতাহার শুনে ভালো লাগছে। মজুরদের দুঃখের কথা আগে কেউ এমন করে ছাপার অক্ষরে লিখে প্রচার করেনি। পড়ুন।'

গিয়াসুদ্দীন আবার পড়তে লাগলেন, 'সায়েবরা শোধ তোলবার জন্য সেই হাজার দেড় হাজার মতো ধর্মঘটী মজুরদের বরখাস্ত করল। বরখাস্ত করার পর তাদের অভিযোগ অনুযোগ উপেক্ষা করে শহর থেকে তাদের বিতাড়ন করে, তাদের জায়গায় নূতন নূতন মজুর বহাল করা হল।'

ইসমাইল আবার চোখ বুজল, এবার তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল পান্নুর মুখচ্ছবি নয়, বিতাড়িত সেই হাজার জন খনি-মজুরের মুখচ্ছবি। ছেলে মেয়ে বৌ নিয়ে ওরা কে কোথায় আছে এখন? ওদের খাওয়া দাওয়ার কি কোনো ব্যবস্থা হল, মাথা-গোঁজার ঠাঁই মিলল কি? ইসমাইলের অন্তর যেন কাঁদতে লাগল।

গিয়াসুদ্দীন পড়ে যেতে লাগলেন, 'তারপর আরম্ভ হল নূতন করে অপর ছাঁটাইয়ের পালা। বিলাত থেকে নূতন যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম এনে দশ/বিশটা মানুষের কাজ একটা যন্ত্রের সাহায্যে করতে শুরু করল। ফলে আর লোকের দরকার নেই বলে, লোক তাড়ানোর ব্যবস্থা হল। কোম্পানী বেছে বেছে কিছু লোককে উপরে তুলল, কাউকে কাউকে টেনে নামাল তলায়। কোনো নিয়ম নেই —কেবল খেয়ালখুশি মাফিক। এ বি সি ডি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে কিছু কিছু কোয়ার্টার তৈরি হল, কিন্তু বেশির ভাগ বাড়িতেই বিজলি বাতি, স্নান পানের জল ও অন্য আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার অভাব। কভেনেন্টেড্ স্টাফ ও সায়েবদের নিজেদের বসবাসের বাংলোবাড়ি ঘরের তুলনায় এ-সব কোয়ার্টার যেন গোরুর গোয়াল। সায়েবদের বাংলোবাড়িতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিজলি পাখা, তেমনি লাইট, জলকলের আধিক্য, জানালা দরজায় পর্দা, ঘরে ঘরে ঘরজোড়া কার্পেট, ডাইনিং রুমের সেট, ড্রয়িং রুমের সেট, টেলিফোন, মোটর গাড়ি, খানসামা ও বাবুর্চি। অপরদিকে অবিবাহিত কুলিমজুরদের ঘরগুলো ঘনবসতিপূর্ণ ব্যারাক মাত্র। এক একটা ব্যারাকে দশটা করে ঘর—প্রত্যেকটিই আয়তনে ছোট। সঙ্গে থাকে একটা করে চৌষট্টি বর্গ-ফুটের রান্নাঘর। প্রত্যেক ব্যারাকেই পায়খানাগুলি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। শোবার ঘরে সিলিং নাই, আলোবাতাস ঢোকা শক্ত। বিবাহিতদের জন্য কিছু ঘর

আছে, সে সব ঘরেও সিলিং নেই, আলোবাতাস ঢোকেনা। এই সব কোয়ার্টারে মেয়েদের স্নান করার মতো কোনো আলাদা ব্যবস্থা নাই। জলের কলগুলি সর্বসাধারণের। কণ্ট্রাকটারের মজুরদের অবস্থা এদের চেয়েও শোচনীয়, তারা থাকে পচা বস্তিতে।'

ইসমাইল এবার আর চুপ করে বসে থাকতে পারলনা। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'খুব সত্যি কথা লিখেছে—একেবারে আমাদের মনে কথা। কে লিখেছে এ সব ?

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'নাম দেওয়া নেই, তাই কারো নাম বলা ঠিক হবে না। কথা ছিল গোস্বামী লিখবেন। কিন্তু কে যে লিখেছেন সেটা বড় কথা নয়, সত্যি কথা যে নির্ভয়ে লিখতে পেরেছেন, সেইটাই বড় কথা। এবার বাকীটুকু শোনো—

'এই সব নানা অসুবিধা ছাড়াও অন্য অসুবিধা থাকতে পারে। কিন্তু এই সব অসুবিধা দূর করতে হলে শ্রমিকদের সুসংগঠিত হয়ে য়ুনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। ভারতবর্ষে ট্রেড য়ুনিয়ন আইন প্রবর্তিত হয়েছে, সেই আইন অনুসারে য়ুনিয়ন গঠন করে তাকে রেজিস্ট্রি করতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সকল শ্রমিককে সমবেত ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা একটা সাধারণ সভায় মিলিত হতে পারে। কেরানী, মজুর, খানসামা, চাপরাসী, পিয়ন, ড্রাইভার—সকলকেই এই য়ুনিয়নের সভ্য হতে হবে। মজুরদের পিছনে ভারতের কোটি কোটি জনতার সমর্থন আছে। সুতরাং তাঁরা নির্ভয়ে সংগঠন আরম্ভ করে, নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত করা ছাড়াও, নিম্নতম বেতন, পালাপার্বণে স-বেতন ছুটি, মাহিনা বৃদ্ধির হার, মুনাফা বোনাস, দক্ষতা বোনাস, চাকুরীর নিরাপত্তা, মজুরদের জন্য থাকবার ঘর, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায় করার জন্য সংগ্রাম করতে পারবেন।'

গিয়াসুদ্দীন এই পর্যন্ত পড়ে ইশতাহারখানা এক পাশে সরিয়ে রেখে আর এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে নিলেন। ইসমাইল তখনো মেঝের উপর চলাফেরা করছে। ইশতাহারের কথাগুলি সে খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখল। নিজেরা নিজেদের সংগঠিত করে সত্যি সত্যি অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কি পারি না ? নিশ্চয় পারি। খানিকক্ষণ বাদে সে শান্ত হয়ে বসল। তারপর চোখ বুজে কল্পনা করতে লাগল মজুরদের শান্তিময় ঘরবাড়ি, তাদের চাকরিতে নিরাপত্তা ইত্যাদি। শহরে থেকে তখন ভালো লাগবে, কাজকর্ম করে ভালো লাগবে এবং সব চেয়ে বড় কথা মানুষদের মধ্যে তখন সংহতি আসবে।'

য়ুনিয়ন-এর অর্থ কি এবার তার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাল।

নাসিরুদ্দীন বলল, ঠিক কথা সব লিখেছে। কিন্তু কেবল লিখলে চলবেনা, কাজ করে দেখতে হবে।

গিয়াসুদ্দীন চুপ করে রইল। নিচু গলায় বললেন, 'রাত হয়ে গেছে। জাহানারা হয় তো অপেক্ষা করছে, আমি বলে আসি ভাত বাড়তে। গিয়াসুদ্দীন উঠে গেল। ইসমাইল ও নাসিরুদ্দীন দুজনে বসে রইল নীরবে।



কিছুক্ষণ পরে গিয়াসুদ্দীন ওদের দুজনকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেল।

খেতে বসে ইসমাইল একবার জাহানারার দিকে তাকাল। দেহখানা শীর্ণ, দেখে মনে হয় যেন রোদে শুকিয়ে যাওয়া একটি করবী ফুলের গাছ। কিন্তু চোখের চাহনীটা মধুর, মুখের ভাব স্নেহশীল। জাহানারা হেসে বলল, 'নিকাহ্-র দিনে এলে না কেন?'

ইসমাইল বলল, 'ঈদও এবার আমার মাঠে মারা গেল, আপনাদের বিয়েতেও যোগ দেওয়া হল না। বিয়ে তো হল ঈদের পরের দিন—না?'

জাহানারা কিছু বলল না। গিয়াসুদ্দীন আনুষ্ঠানিক বিয়ের কোনো উদ্‌যোগ করেছিল বললে ভুল হবে। একেবারে নামমাত্র বিয়ে। আহমদ সাহেবের বাড়িতেও নিরানন্দ। নিতান্ত মামুলীভাবে নিকাহ সম্পন্ন হল, নিমন্ত্রিতের সমাগম হল না, জাঁকজমক কিছু হল না। মা-মরা ভাগনীটিকে কোনোপ্রকারে দায়সারাভাবে পাত্রস্থ করে আহমদ সাহেব জাহানারার কথা যেন মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন।

জাহানারা হেঁট মাথায় খাবার বেড়ে দিতে লাগল। নাসিরুদ্দীন বলল, 'এরকম উটকো নিকাহ জন্মে দেখিনি, জানো ইসমাইল? যেন বিয়েটা হল খোদার চোখের সামনে, মানুষের সামনে নয়। অবশ্য এরকম নিকাহ্-ই আসল নিকাহ্।'

ইসমাইল বলল, 'বেশি হুলুস্থুল হল না, সে তো ভালোই হল।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'আর কি দিনে হল বিয়েটা, সমস্ত দিনটাই নিরানন্দময়। কারো মুখে হাসি নেই। বিয়েতে কাউকে ডাকিনি ঠিক, কিন্তু ডাকলেও কেউ হয়তো আসত না। এমনিতেই ধর্মের বাইরে কাজ করছি বলে হিন্দুরা সবাই অসন্তুষ্ট। তার ওপর তোমরা বাঁধালে গণ্ডগোল।' একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে গিয়াসুদ্দীন বলে চললেন, 'অবশ্য তুমি এখনো ছেলেমানুষ। বীরভদ্র সিং তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিল। আবার কখনো এরকম ভুল করতে যেয়ো না।'

ইসমাইল বলল, 'এরকম ভুল আর কখনো করব না।' লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। জাহানারা ভাত বেড়ে দিয়ে বলল, 'খাও ইসমাইল, ভাত খাও—শুধু শুধু ভাত। অনেক কিছু রান্নাবান্না করব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ইনি বাড়ি এলেন মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। বাজার করাও হয়নি। আরেক দিন নেমন্তন্ন করে তোমায় ভালো করে খাওয়াব।' জাহানারার অনুতাপের স্বর শুনে ইসমাইল হেসে হেসে বলল, 'দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। আমি তো নিজের থেকে এসে পড়েছি। আবার কোনো একদিন এসে ভালো করে খেয়ে যাব। আসলে খাওয়া-দাওয়াটা তো বড়ো কথা নয়. স্নেহ ভালোবাসাটাই বড়ো কথা। এই শহরে সেটার ভারি অভাব।'

জাহানারা হেসে বলল, 'আমরা কি আর স্নেহ সমাদর করতে পারব? কখনো সখনো এলে পর এক কাপ গরম চা দিতে পারব বড় জোর।' কিছুক্ষণ চুপ করে

থাকার পর বলল, 'হ্যাঁ, আরো একটা কাজ অবশ্য করতে পারি তোমার জন্যে একটি সুন্দরী রাজকন্যা সন্ধান করে এনে দিতে পারি।'

ইসমাইল হেসে বলল, 'রাজকন্যা আনবেন কোথা থেকে?'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'তুমি জানবে কি করে? রূপকথার রাজপুত্তুরও বলতে পারে না রাজকুমারী কোথা থেকে আসবে। স্বপ্নে তাকে দেখতে পায়। তারপর অনুচর পরিচর দেশ বিদেশ যায়, নদ নদী সমুদ্র প্রান্তর পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে পার হয়, অশ্ব হস্তী পদাতিক নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ জয় করে—তারপরে পায় রাজকুমারীর সন্ধান: যেমন করে গিয়াসুদ্দীন সাহেব পেলেন জাহানারা বেগমকে। বুঝলে কি না। তুমি যদি এক জায়গায় থেবড়ে বসে থাকো রাজকুমারী লাভ করবে কেমন করে?'

আহার ছেড়ে গিয়াসুদ্দীন হাসতে লাগলেন, বললেন, 'কি গো জাহানারা, আমি রাজকুমারের মতো সাধ্যসাধনা করেছিলাম নাকি?'

জাহানারা বলল, রাজকুমার ছিলে না জিন—কেমন করে বলি।'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'আপনি হলেন লায়লা, আর গিয়াসুদ্দীন সাহেব মজনু।'

ইসমাইল হাসতে হাসতে বলল, 'আমার কিন্তু অন্য একটা গল্প মনে পড়ে গেল। জাহানারা হলেন জুলেখা আর গিয়াসুদ্দীন সাহেব ইউসুফ...'

এবার জাহানারা না হেসে থাকতে পারল না। জুলেখার সঙ্গে তাঁর তুলনা করার জন্য ইসমাইলের প্রতি তাঁর অন্তর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। ছেলেবেলায় মৌলভী সাহেবের মুখে জুলেখার গল্প শুনেছিল। কী আশ্চর্য মেয়ে ছিল এই রাজকুমারী। শয়নে স্বপনে, বিদেশে বিভুঁয়ে সব অবস্থায় কেবলমাত্র ইউসুফের চিন্তা। উষা যেমন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অনিরুদ্ধকে পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি জুলেখা ইউসুফকে দেখেছিল স্বপ্নে। বাবা তাঁর বিয়ে দিলেন মিশরে—কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পেল না। অবশেষে ইউসুফকে খুঁজে বের করে দুজনের মধ্যে মিলন ঘটাতে হল। প্রেমের পথ সর্বদাই কন্টকাকীর্ণ।

নাসিরুদ্দীন ইসমাইলকে বলল, 'জানিনা তুমি জানো কি না—জুলেখা কিন্তু বিবাহিত ছিল, তবু ইউসুফকে সে ভুলতে পারেনি। ভালোবাসাই ওকে টেনে নিয়ে গেল প্রেমাস্পদের কাছে।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ও কিন্তু তোমায় খুব ভালোবাসে। জানিনা সেকথা তুমি জানো কি না।'

ইসমাইল বুঝতে পেরেছিল নাসিরুদ্দীন কার কথা বলতে চাইছিল। বার বার জেবউন্নিসার কথা ওকে মনে পড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ইসমাইলের বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। মাথা হেঁট করে সে এক মনে ভাত খেয়ে যাচ্ছিল, জবাব দেবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জাহানারার কৌতূহল অসীম, জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই মেয়েটি?'

'জেবউন্নিসা। আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র চিনি। ডিব্রুগড়ে ট্রেনিং নিচ্ছিল, সব ছেড়ে ছুড়ে কেমন দ্বিধামাত্র না করে ডিগবয় ফিরে এল। কারণ কি? ইসমাইল তখন

হাসপাতালে, সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু ইসমাইল একটা কথাও বলল না। আমার কাছে এসে মেয়েটা খুব কাঁদল। ওর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। কোলেপিঠে করে ওকে মানুষ করেছি, ওর সুখদুঃখের কথা আমি ছাড়া কে আর জানবে, কেই-বা বুঝবে। কথা বলার ঝোঁকে নাসিরুদ্দীন ভাত খেতে পর্যন্ত ভুলে গেল। গিয়াসুদ্দীন সাহেব, জেবু আপনাকে জানে মানুষের মতো মানুষ বলে। সেদিন আপনি যেমন সায়েবের কোনো পরোয়া না রেখে আপনার বাড়িতে ওকে আশ্রয় দিলেন, তেমনটা আর কেউ কি করতে পারত? নিশ্চয় পারত না। আপনার সৎসাহস দেখে জেবু বুঝেছে দুনিয়াটা এখনো একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে তেমনি শামুকও থাকে। দুটোকে কীভাবে তফাত করে দেখতে হয়, সেটা জানা দরকার। তা না হলে মুড়ি মুড়কির একদর হয়। জেবউন্নিসাকে আমি জানি, সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন। তাকে সুখী করতে পারবে।'

ইসমাইল বুঝল, দুজনেরই মন্তব্য তাকে লক্ষ্য করে।

জাহানারা বলল, 'জেবউন্নিসার রূপ আছে, চরিত্র নেই।' ইসমাইলের মনের কথাটা বুঝতে পেরে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলো ইসমাইল?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'তোমার বিচারটা যুক্তিসম্মত নয়, জাহানারা। ধরো, কোনো মেয়েকে পুরুষ বলাৎকার করল, তার ফলে মেয়েটিকে কি ভ্রষ্ট চরিত্র বলা চলে? ধরো, জেবউন্নিসা কোনো সায়েবের অবৈধ সন্তান, কিন্তু সেই কারণে তাকে ঘৃণাভরে একঘরে করবার আমরা কে? সমাজ যা দূষণীয় মনে করে, তা সব সময় সত্যি সত্যি দূষণীয় নাও হতে পারে। এই তো কোম্পানী আমাদের বিষয়ে কত কি মনে করে, তাই বলে আমাদের সম্বন্ধে কোম্পানীর ধারণা কি সব সময় ঠিক বলা যায়? সায়েবদের কথা যেমন ভাবতে হবে, মজুরদের দিকটাও তেমন দেখতে হবে। জেবউন্নিসার বিষয় সেইরকম সব দিক দেখে বিবেচনা করা উচিত। জেব-উন্নিসা ভালো হতে চায়, ভালো হয়েছে। আমাদের উচিত যাতে সে ভালো হয়ে থাকতে পারে সেজন্য সাহায্য করা।'

জাহানারা চুপ করে রইল, গিয়াসুদ্দীনের কথাগুলিতে যুক্তি আছে। নাসিরুদ্দীন এবার একমনে খেতে লাগল। সকলেই অপেক্ষা করছে ইসমাইলের বক্তব্য শোনবার জন্য। কিন্তু ইসমাইলের তখনকার মতো কোনো বক্তব্য নেই— 'হাঁ' কিংবা 'না—দুটোর কোনোটাই সে আপাততঃ বলতে চায় না।

অনেকক্ষণ ধরে ইসমাইল চুপ করে আছে দেখে গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কী হে, আবার বুঝি তার কথা ভাবছ?'

'কার কথা?' জাহানারার কৌতূহল হল।

'সেই যে তোমার ছাত্রী—পান্নুর।'

মুচকি হেসে জাহানারা বললেন, 'ওদিকে হাত না বাড়ালেই ভালো। আঁকশি দিয়ে কি সব সময় পাকা আমটা পাড়া যায় ?'

এবার ইসমাইলকে বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হল। সে বলল, 'না না, ওর সঙ্গেও আমার বিয়ে হতে পারে না, জেবউন্নিসার সঙ্গেও নয়।'

হেসে হেসে ইসমাইলের মুখখানা দেখতে দেখতে জাহানারা বলল, 'তবে তো দেখি রাজকন্যাই মিলছে না।'

ইসমাইল বলল, 'আমিও তো রাজকুমার নই যে কোনো রাজকুমারী আমার প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। তেমন কোনো মেয়ে পেলে বিয়ে করব। আপাতত আরো একটা গল্প শোনান, নাসিরুদ্দীন সাহেব।'

নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি দেখছি একেবারেই বেরসিক, ইসমাইল। জাহানারা বিবি তোমায় এত যত্ন করে খানা খাওয়ালেন আর তুমি কিনা এতক্ষণেও একটি রাজকুমারী খুঁজে বের করতে পারলে না? তবে গল্প আর কি বলি, বলো ?'

বার

নূতন একটা খনি থেকে তেল তোলার জন্য ডেরিক খাড়া করা হয়েছে। ড্রিল বিট প্রায় তিনশো গজ নিচে ঢোকবার পর, পাইপের ভিতরে চাপ দেবার জন্য জলে কাদায় মিশিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর বড়ো গর্তটার চারদিকে গোল করে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার তোড়জোড় শুরু হল। গিয়াসুদ্দীন ও জিওলজিস্ট টেইন্স সায়েব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন কত ফুট নিচু অবধি ড্রিলিং করা দরকার হবে। সায়েবের অনুমান ছ' হাজার ফুট অবধি ড্রিলিং না করা পর্যন্ত তেল হয়তো পাওয়া যাবে না।

কিন্তু গিয়াসুদ্দীন অভিজ্ঞ ড্রিলার। সে বুঝেছিল আর কত ফুট গেলে তেল মিলবে। এসব ক্ষেত্রে অঙ্কের গণনা সব সময় ঠিক হয় না। প্রকৃতি অঙ্কের গণনা অনেক সময় নাকচ করে দেয়।

টেইন্স বিরক্তিতে চোখ পাকিয়ে একবার গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকাল—শালপ্রাংশু মহাভুজ লোকটা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, শক্ত সমর্থ মোটা সোটা মানুষ। মুখের ভাবে সায়েবের প্রতি সমীহ করার চিহ্নমাত্র নেই—কাউকে বড়ো একটা সম্মান সম্ভ্রম করে না। বহু দিনের পুরাতন কর্মচারী। ডিগবয়ের অধিকাংশ তেলখনির ইতিহাস ওর সুবিদিত। ভূমিতলের ভৌগলিক সংস্থান ভূ-বিজ্ঞানীর মতো ঠাহর

করতে না পারলেও, ড্রিলিং চলাকালে অনেক কিছু অনুভবে অনুমান করতে পারে। সেইজন্য টেইন্স ওর কথায় আর উচ্চবাচ্য করল না।

গিয়াসুদ্দীন একটা সিগারেট ধরালেন। টেইন্স-এর অসহ্য মনে হল—খনিতে সিগারেট ধরানো এবং উপরওয়ালার নাকের সামনে ধোঁয়া ছাড়া—দু-দুটোর কোনোটাই সায়েব সহ্য করতে পারে না। সায়েব সরে গিয়ে কণ্ট্রাকটারের মজুরদের কাজ তদারক করতে লাগল। বেশির ভাগই ধারে কাছের বাগান থেকে ধরে আনা দিনমজুর কামিন। তারা নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে করতে বালির স্তূপ থেকে টিনে বালি ভর্তি করে, খনির গর্তটার চার দিকে ফেলছিল। সায়েবকে দেখে ওদের হাসি-তামাশা বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক সেইসময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। বালি-ভরতি টিন মাথায় করে বয়ে নিতে গিয়ে একটি যুবতী কামিন ক্লান্তিতে দিশেহারা হয়ে, কাদায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ল গিয়ে কেসিং ও ড্রিলিং বিট-এর মাঝখানের গর্তটাতে। সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। মেয়েটির কোমর অবধি বসে গেল কাদার মধ্যে।

গিয়াসুদ্দীন সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে, জুতো জোড়া খুলে ফেললেন। দশ গজ মতো দূরে একটা সিঁড়ি পড়েছিল। সিঁড়িটা এনে গর্তের মধ্যে দাঁড় করালেন, তারপর নিমেষের মধ্যে তলায় নেবে গিয়ে মেয়েটিকে তুলে এনে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন। মেয়েটির মাথা ফেটে গেছে, পায়েও বেশ জখম, সারা দেহ কাদা মাখা। কেটে যাওয়া জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। গিয়াসুদ্দীনের জামাকাপড়ও কর্দমাক্ত। তিনি দেখলেন, মেয়েটি বোধনের মেয়ে—লছমী। বীরভদ্র সিং চা-বাগান থেকে যেসব কুলিকামিন এনেছে, লছমী তাদের মধ্যে ঢুকল কেমন করে? কিন্তু তখন কৌতূহলের সময় কোথায়? পকেট থেকে রুমাল বের করে গিয়াসুদ্দীন একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। রক্ত থামল না দেখে শার্টখানা ফালি ফালি ছিঁড়ে জখমটার উপর আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

টেইন্স এম্বুলেন্সের খোঁজ করতে লোক পাঠাল। এম্বুলেন্স তখন হাসপাতালে ছিল না বলে একটা স্ট্রেচার আনিয়ে তাতে করে লছমীকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। গিয়াসুদ্দীন হাত ধুয়ে আর একটা সিগারেট ধরালেন ও সায়েবকে বললেন, 'সায়েব, মেয়েটার অবস্থা খারাপ।'

টেইন্স-এর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল, বলল, 'আই এম সরি'।

কথা ওখানেই শেষ হল, গিয়াসুদ্দীন কাজে নাবলেন। টেইন্স তার বাংলোবাড়িতে ফিরে গেল।

তখন ভর দুপুর। বেশ শীত। সূর্যের রঙ কমলালেবুর মতো। একটু দূরে একটা শেড-এ কয়লার আগুন জ্বলছে। সামনে বসে দু'জন লোক ইঞ্জিন চালাচ্ছে। গুম্ গুম্ শব্দে ওদের কানে যেন তালা লাগার মতো অবস্থা। ভীমকর্মা গিয়াসুদ্দীন এবার ড্রিলিং-এর কাজ শুরু করেছে।

'গিয়াসুদ্দীন সাহেব!'

'কী হয়েছে? বেশি বকবক করিস না এখন।' তুই-তোকারী করে কথা বলা গিয়াসুদ্দীনের স্বভাব।

'ইঞ্জিনটা খুব তেতে উঠেছে।'

বিরক্তিতে গিয়াসুদ্দীনের মুখখানা বিকৃত হয়ে পড়ল। ড্রিলিং বন্ধ করে তিনি ইঞ্জিনের কাছে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, 'কোনো ভয় নেই, সন্ধে পর্যন্ত ঠিক চলবে। ওয়াশারটা একটু খারাপ হয়েছে।'

ইঞ্জিনের লোকটা আপন মনে কী যেন বলল। গিয়াসুদ্দীন আবার ড্রিলিং-এর জায়গায় ফিরে গেলেন। আইম্যা তার সঙ্গীকে বলল, 'কথাটা শুনলি? ইনি যদি থাকেন তো জিরোবার উপায় নেই—কেবল কাজ, কাজ, কাজ। দেখবি, আজ রাত অবধি কাজ চলবে। ঘরে নতুন বিয়ে করা বৌ থাকলে কি হয়—বৌয়ের চেয়ে ড্রিলিং-এর কাজেই এর বেশি আগ্রহ। মানুষ তো নয়—দৈত্য বিশেষ।'

দ্বিতীয় লোকটি রামু। তার আর কাজে মন ছিল না। লছমীর অবস্থা দেখে মনে তার ঘোরতর অশান্তি। মাঝবয়সী রামুর লছমী হল দ্বিতীয় প্রেমাস্পদা। পান্নু ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকাল লছমীর কাছে আসা যাওয়া করে। বোধনের ইচ্ছা রামুর সঙ্গেই লছমীর বিয়ে দেয়, কিন্তু এখনো লছমীর মনের নাগাল রামু পায়নি। বিয়ের কথা বললে মেয়েটা খিল খিল করে হাসে। সে যাই হোক, এখনো স্পষ্ট 'না' বলেনি। রামু বলল, 'আমার কেমন কেমন লাগছে যেন। ইঞ্জিন চলুক। চল্, আমরা একটু দূরে গিয়ে দুটো কথা বলি।' ইঞ্জিনের আওয়াজ থেকে একটু দূরে গিয়ে, দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর ঘাসের উপর বসে আইম্যা হাসতে হাসতে বলল, 'তোর বুঝি লছমীর কাছে যেতে ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ'। রামুও বসল আইম্যার কাছে—'ওকে কত করে বললাম, খাটাখাটুনী তোমায় করতে হবে না। শুনল না কথাটা। আজকালকার মেয়েদের মন বুঝতে পারা শক্ত। নিজেদের খুশি মতো চলে।'

আইম্যা বলল, 'চলবে না কেন? ওদের তো নিজস্ব একটা মন আছে, মতামত আছে।'

'কিন্তু ওদের মনের কি মূল্য?' রামু বলল, 'বিয়ে না করলে ওরা বাঁচবে কী করে?'

আইম্যা হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'তোদের যত সব কথা! আমাদের বর্মী সমাজ দেখলে বুঝতিস মেয়েরা কী চীজ! ওদের খেয়ালখুশি বাগ মানানো শক্ত, পুরুষদের ওরা গ্রাহ্যই করে না।'

রামু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, ওর মনে হল আইম্যা যেন অশোভন কথা বলছে।

আইম্যা বেশ কঠিন সুরে বলল, 'পান্নু বা লছমী কী দেখে তোকে বিয়ে করতে চাইবে—বল তো? কেবল পুরুষ হলেই হয় না, পৌরুষ থাকা চাই।'

রামুর এবার আঁতে ঘা লাগল। কিছু জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করল। আইম্যা ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়ল। রেঙ্গুনের দিনগুলোর

কথা ওর মনে পড়তে লাগল। ডিগবয়ে আসবার আগে ও ছিল রেঙ্গুনে। সেখানে জীবনের ধারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সারাটা দিন কাজকর্মে কাটাবার পর সন্ধ্যাবেলা সেখানে বান্ধবীর অভাব হত না। হেসেখেলে, ঘুরেফিরে যুবতী বান্ধবীর সাহচর্যে সন্ধ্যাগুলো আনন্দে কেটে যেত। ডিগবয়ে সে সুযোগ নেই। কতদিন ও এখানকার মেয়েদের সঙ্গে ঘুরেফিরে বেড়াতে চেয়েছে। কেউ তারা পরপুরুষের সঙ্গে বেরোতে চায় না—এত তাদের সংকোচ। তাদের এই তফাৎ রাখার স্বভাব দেখে ওর মনে খুব দুঃখ। আর দুঃখকষ্ট লঘু করতে হলে মদ ছাড়া গতি নেই। আইম্যা পকেট থেকে বের করল একটা বিয়ার-এর বোতল। ছিপিটা খুলে সে একমনে বিয়ার পান করতে লাগল।

রামুও একমনে বিড়ি টানতে টানতে লছমীর কথা চিন্তা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে চ্যাটার্জি এসে পড়লেন—রোগা মানুষ, চোখে এক জোড়া চশমা। চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি খাচ্ছ, আইম্যা ?'

আইম্যা উঠে বসল। বোতলে যেটুকু বিয়ার ছিল চ্যাটার্জিকে দিতে চাইল। চ্যাটার্জির কোন আগ্রহ নেই দেখে, আইম্যা নিজেই বোতলের বাকী বিয়ারটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করল। চ্যাটার্জি আইম্যার সামনে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইশতাহার বেরিয়েছে, শোনোনি ?'

'শুনেছি। কিন্তু ইশতাহার কি ধুয়ে খাব ? কাজ, কাজ—শুধু কাজ। ছুটি নেই আইম্যার মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে পড়ল।

'শুনেছো কি, বলাইচাঁদ আর গোস্বামী—দুজনকেই শহর থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে সরকার ?'

আইম্যা হেসে বলল 'এসব তো আজকাল হয়েই থাকে—মামুলী ঘটনা।'

'না, না, য়ুনিয়ন গড়ে তোলার জন্য ওই রকম কয়েকজন মানুষের দরকার ছিল। কোম্পানী দুজনকেই 'টেরোরিস্ট' অপবাদ দিয়ে বহিষ্কার করিয়েছে।' চ্যাটার্জির গলার স্বরে বেশ একটা উত্তেজনা, বিশেষত 'টেরোরিস্ট' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে।

আইম্যা বলল, 'সেটা কি কোনো কথা হল ? ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে তো য়ুনিয়ন গঠন করুন না কেন'—এই বলে সে ইঞ্জিনের শব্দটা শোনবার জন্য একবার কান পাতল। তারপর রামুকে বলল, 'এই রামু, যা তো একবার। মেয়েদের কথা ভেবে কি হবে ? বয়লারে একটু কয়লা ফেলে দে।'

রামু চলে গেল, সে চলে যেতেই চাইছিল। এইসব কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই।

চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বুঝি কেবল বিয়ের কথা ভাবে ?'

'হ্যাঁ', আইম্যা বলল, 'বিয়ে না করলে এখানে নারীসঙ্গ করা যায় না '

চ্যাটার্জি হাসতে লাগলেন। ওঁর ইসমাইলের কথা মনে পড়ল, সে বেচারা পান্নুর কথা চিন্তা করে দিন কাটায়। ওদিকে জেবউন্নিসা ভাবে ইসমাইলের কথা।

ভালো লাগা, ভালোবাসা, এক আশ্চর্য ব্যাপার। রাস্তু অবশ্য ঘরগেরস্থালী পাততে চায়—ওঁর যাকে হোক পেলেই হল।

আইম্যা বলল, 'হাসছেন যে বড়ো ?

চ্যাটার্জি এবার তাঁর মনের কথা সব খোলাসা করে বললেন। সবটুকু শুনে আইম্যা বলল, 'এগুলো আসল ভালোবাসা নয়। কেবল বাসা বাঁধার চেষ্টা—পাখি যেমন বাসা বাঁধে।'

চ্যাটার্জি আইম্যার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বললেন, 'এগুলো ভালোবাসা নয় বলতে চাও ?'

'হ্যাঁ', আইম্যা বলল, 'বিয়ে জিনিষটা আমার ভালো লাগে না। কোনো মেয়েকে আমার ভালো লাগলে, ভালো লাগে। চুমো খেতে ইচ্ছে যায়, তো চুমো খাই। গল্প করতে ভালো লাগে, তো গল্প-গুজব করি। ব্যস তাইতেই আমার আনন্দ।' আইম্যা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনের দরজা ওর যেন হঠাৎ খুলে গেছে, বলল, 'আরো একটা বোতল আছে, খাবেন নাকি ?'

'না, খাবো না। আমি খেয়েদেয়েই বেরিয়েছি। একটা কথা কি জানো, আইম্যা...'

'দাঁড়ান। বোতলটা নিয়ে আসি।' আইম্যা শেড্-এর ভিতর ঢুকে গিয়ে একটা বিয়ারের বোতল এনে তার ছিপিটা খুলে নিল। তারপর বোতলটা মুখে দিয়ে ঢকঢক করে আধ বোতল বিয়ার শেষ করল।

আইম্যার দিকে ভ্রূকুটি করে চ্যাটার্জি বললেন, 'একেই কি বলে ব্যাভিচার ?'

বোতলের মদটুকু খেয়ে আইম্যা বলল, 'ব্যাভিচার হবে কেন? এটাই তো স্বাভাবিক।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'তাই বলো। এর মধ্যে ভালোবাসাবাসি বলে কোনো পদার্থ নেই।' আইম্যার কথাগুলো কেমন যেন অপবিত্র বলে মনে হল তাঁর কাছে।

আইম্যা হেসে বলল, 'আপনার দেখছি ধর্মভাব এসে গেল। এটা করা ঠিক নয়, ওটা করা ঠিক নয়—এইসব করে হিন্দুরা মরল।'

চ্যাটার্জি কোনো জবাব দিল না, আইম্যার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ইতিমধ্যে হুইস্ল বাজল, টিফিনের ছুটি শেষ হল। চ্যাটার্জি কাজে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আইম্যা হেসে হেসে বলল, 'আপনারা সব কেমন যেন!'

এবার রেগে গিয়ে চ্যাটার্জি বললেন, 'দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে আজেবাজে কথা বলছো কেন ?' তারপর পকেট থেকে এক কপি ইশতাহার বের করে আইম্যার হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটা দিলাম। কাউকে ধরে করে পড়িয়ে নিয়ো।' এই বলে তিনি দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেলেন। কপিখানা হাতে করে আইম্যা নির্বিকার বসে রইল। ইতিমধ্যে ড্রিল পাইপের মাথায় আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। গিয়াসুদ্দীন চেঁচিয়ে বললেন, 'এই আইম্যা! দেখ কত অল্প খুঁড়েই তেল বেরোল। সায়েব বলছিল ছ' হাজার ফুট পর্যন্ত যেতে হবে। এখুনি গিয়ে সায়েবকে খবরটা দে।'

আইম্যা একটি ছোকরা পিওনকে ডেকে বলল, কালবিলম্ব না করে যেন টেইন্স সায়েবের বাংলোয় গিয়ে খবরটা দেয়। গিয়াসুদ্দীন এলেন আইম্যার কাছে। যে জায়গায় নিজের কোটটা ছেড়ে রেখেছিলেন, তার কাছাকাছি বসে ঘাসের উপর সটান হয়ে পড়লেন। বললেন, 'শোন আইম্যা, একটি বিয়ারের বোতল আন তো।'

আইম্যা উঠে গিয়ে দুটি বিয়ারের বোতল এনে একটা গিয়াসুদ্দীনকে দিল, একটা নিজেই নিল। গিয়াসুদ্দীন শুয়ে শুয়ে বিয়ারের বোতলে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'চ্যাটার্জি এসে কি কিছু বলে গেল ?'

'হ্যাঁ। গোসাঁই না বলাইচাঁদ বলে সেই দু'জনকে শহর থেকে বের করে দিয়েছে। ওরা নাকি টেরোরিস্ট! আর একখানা ইশতাহার দিয়ে গেছে।' গিয়াসুদ্দীন আবার বোতলে মুখ দিয়ে এক ঢোক বিয়ার খেয়ে নিয়ে বললেন, 'সায়েব এদিকে আর আসছেন না মনে হচ্ছে। কোন্ ক্লাবে মাতাল হয়ে পড়ে আছে কে জানে ? এদিকে তেল পাম্প করে বের না করলে বিপদ হতে পারে। বুঝেছিস তো ? আমাকেই যেতে হবে সায়েবকে ধরে আনতে। আগুনটা নেবাতে হবে। তুই পাম্প চালাবার জন্যে বলে দে।'

ইতিমধ্যে সেই পিওনটা ফিরে এসে খবর দিল যে টেইন্স সায়েব আসতে পারবে-না। সায়েবদের নাকি একটা মিটিং আছে।

গিয়াসুদ্দীন শ্লেষের সুরে বললেন, 'বুঝেছি কিসের মিটিং। খুব যাহোক টেরোরিস্ট পেল ওই দুজনাকে—একজন গোসাঁই বাড়ির ছেলে, আরেকজন নেহাতই ভদ্রলোক। কেবল বক্তৃতা দিতে পারে, একটাও গুলি কখনো ছোড়েনি নিশ্চয়। এ সব আর কিছু নয়, সায়েবদের চাল। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ওরা অন্য কোনো অঘটন ঘটিয়ে তোলার ফন্দী আঁটছে, নিশ্চয়।'

আইম্যা বলল, 'ওরকম না বলাই ভালো, আজকাল অনেক ভদ্রলোকই টেরোরিস্ট হচ্ছে।'

আইম্যা উঠে দাঁড়াল আর পাম্প হাউসের দিকে পা বাড়াল। খানিক বাদে গিয়াসুদ্দীনও উঠে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে তিনি তাকালেন আইম্যার দিকে। লোকটা মিছে কথা বলেনি, ক্ষুদিরাম ছিল ভদ্রলোকের ছেলে। ভগত সিংও নিশ্চয়। অবশ্য গোসাঁই ও বলাইচাঁদকে উগ্রপন্থী বলে ভাববার কোনো প্রমাণ নেই।

টেরোরিষ্টরা যেমন শান্ত চিত্তে মৃত্যু বরণ করতে পারে, তেমন শক্তি আছে কত জনের ? ওরা যেসব কাজ করে থাকে, সে সব কাজ না করতেও পারত—কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আনবে বলেই এসব কাজ করে এরা। তবে আসামে টেরোরিস্ট এসেছে বলে এখনো তিনি কোনো খবর শোনেন নি। প্রায় বছর দুই আগে কয়েক-জন নাকি এসেছিল। গৌহাটি পৌঁছতেই নবীন বরদলৈ ও অন্য নেতারা নাকি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আসামে যে আন্দোলন হচ্ছে তা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। একদিন গোসাঁইয়ের মুখেই একথা গিয়াসুদ্দীন শুনেছিলেন। সুতরাং টেরোরিস্ট অনুপ্রবেশের কথাটা নিতান্তই সাজানো কথা।

খুব সম্ভব এই গুজব রটিয়ে থাকবে ওই নরাধমটা—বীরভদ্র সিং। সায়েবরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে এই ঘটনায় কান দিয়ে থাকবে।

তের

গিয়াসুদ্দীন নূতন ধর্ম গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু আর কিছুতে নূতন হলেন না। রোজার দিন এল, তিনি রোজা ধরলেন না। শুক্রবার দিন মসজিদে নামাজ পড়তেও অবহেলা। আর মদ এমন খেতে লাগলেন—বুঝিয়ে দিলেন ছাড়বেন না। কিছু-দিন বাদেই জাহানারা বুঝে নিল যে ওর স্বামীর কাছে ধর্মান্তরের কোনো মূল্য নেই। কেবল জাহানারাকে বিয়ে করার জন্যই মুসলমান হয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও জাহানারা ওঁর স্বভাব ও অভ্যাস কিছুমাত্র বদলাতে পারল না।

সংসার বলতে যেমন হওয়া উচিত জাহানারার সংসার তেমনটা হয়ে উঠল না। কাজকর্ম, ঘোরাফেরা, স্নান-পান, আহার-নিদ্রা কোনো কিছুতেই গিয়াসুদ্দীন নির্ধারিত সময় ধরে চলেন না। পোশাক পরিচ্ছদেও পারিপাট্যের অভাব। ট্রাউজারে ইস্ত্রি না থাকা তো মামুলি ব্যাপার, কখনো কখনো শার্টটা ট্রাউজারের মধ্যে গুঁজতেও ভুল হয়ে যায়। শরীরের মাপজোকের সঙ্গে কোটপ্যান্টের মাপজোক মেলানোর বালাই নেই। সাধারণত গিয়াসুদ্দীন দোকানের রেডিমেড দিয়ে কাজ চালান। কখনো সেগুলি হয় লম্বায় বা বহরে ছোট কিংবা বড়ো। তাছাড়া, আচার ব্যবহারেও কোনো নিয়মশৃংখলার ধার ধারেন না। পোশাক পরিচ্ছদে যেমন অগোছাল, কথাবার্তাতেও তেমনি।

গিয়াসুদ্দীনের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেননি। শার্টটা ফাটা ছেঁড়া, কোটের ওপর রক্তের দাগ। সেদিন জাহানারার রোজা। ওর খাওয়ার সময় পার হয়ে গেল, তবু সে স্বামীর পথ চেয়ে বসে ছিল। স্বামীর চেহারাটা দেখে ওর অন্তরটা যেন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল, গলাটা শক্ত করে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন? ঘর সংসার একটা যে আছে, সে বোধহয় মনেও নেই। রক্ত লাগল কেমন করে?'

গিয়াসুদ্দীন কোট খুলে মেঝের উপর ফেলে দিলেন। জুতো জোড়া খুলতে খুলতে বললেন, 'লছমীর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে কোটে রক্ত লাগল, শার্ট ছিঁড়ে ওকে ব্যাণ্ডেজ করতে হল, কাপড় চোপড়ে কাদা লাগল। ওদিকে খনি খুঁড়ে তেল পাওয়া গেল। পাইপ থেকে উপচে পড়া প্রথম কয়েক ফোঁটা তেল প্যান্টটা ভিজিয়ে দিল। সমস্ত শরীরটা তবু যেন জুড়িয়ে গেল। ওখানে বসেই এক বোতল বিয়ার খেলাম, পেট ভরে গেল। তারপর গেলাম লছমীর খবর

করতে। শুনলাম, সে নাকি ক্রমাগত আমার খোঁজ করছে। হাসপাতালে দেখা হতে দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানাল। ওখান থেকে আস্তে আস্তে চলে এলাম তোমার কাছে। কেমন কাটল আজ তোমার রোজা?'

জাহানারার মনে হল যেন কোনো নাটক শুনছে। ভিতরে ভিতরে সে খুশিও হল। সে বলল, 'খুব ভালো করেছেন মেয়েটাকে বাঁচিয়ে। এই তো আজ সকালেই ওকে আর পান্নুকে আমি পড়াচ্ছিলাম। লছমী খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওরা চলে যাবার পর আজ সারাটা দিন একা একা কাটল। প্রধানের ঘর থেকে ওর মেয়ে নয়নমণির গানের সুর ভেসে আসছিল, দুর্গা সেখানেই ছিল। তারপর আমার মামা এসে অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষায় বসে রইলেন। ওঁদের বাড়িতে আমরা যাই না বলে রাগ করেছেন। আপনি রোজা ধরেন নি, নামাজে যান না বলে মনে খুব আঘাত পেয়েছেন। আর বলে গেছেন আপনি যেন খামখেয়ালি ত্যাগ করে একটু সংযত হন। টেইন্স নাকি আপনার নামে খুব ভালো রিপোর্ট দিয়েছে. কেবল টাওলার সায়েব একটু বিরক্ত—আপনি য়ুনিয়ন গড়ে তুলতে চাইছেন বলে। তা না হলে নাকি কেউ আপনার প্রমোশন রুখতে পারত না। আর এসেছিলেন বরুয়ার স্ত্রী। খবর দিয়ে গেলেন যে তাঁর বাবা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বরুয়া ঘর তৈরি করায় লেগেছেন, স্ত্রী গিয়েছিলেন একবার হাসপাতালে।'

তারপর হঠাৎ, জাহানারার কথায় ছেদ পড়ল। সে দেখল গিয়াসুদ্দীন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তার নাক ডাকছে। উঠে গিয়ে জাহানারা বাইরের দরজাটা বন্ধ করে এল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল ওর। স্বামীকে একটা সুখবর দিতে ওর খুব ইচ্ছা। আজ তিনচারদিন ধরে খবরটা মনের মধ্যে চোখ রেখেছে, বলতে পারেনি। বরুয়ার স্ত্রী তার নিজের খবরটা দিয়ে গেল বলে জাহানারারও ইচ্ছা হয়েছিল স্বামীকে বলতে। এখন ওর উচিত লেডি ডাক্তারকে দেখানো। গিয়াসুদ্দীন যে-উদ্দেশ্য নিয়ে মাধুরীকে তালাক দিয়ে জাহানারাকে বিয়ে করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—জাহানারা এখন সন্তানসম্ভবা।

খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকল জাহানারা, তারপর গিয়াসুদ্দীনের কাছে গিয়ে বসল বিছানার ধারে। আস্তে ধীরে মাথায় কপালে হাত বুলোতে লাগল। পরে কপালে একটা চুমু খেল। স্বামীর হৃষ্টপুষ্ট শরীরখানা দেখে ওর অন্তর গর্বে ভরে গেল। মানুষটা যেন বিরাট একটা শিশু। খানিক বাদে স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল—ওর বুকের স্পন্দন নিজের বুকে অনুভব করে অপার শান্তি অনুভব করল।

গিয়াসুদ্দীনকে ভালো করবার জন্য জাহানারার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু এখনো সে সফল হতে পারেনি। এইটাই ওর দুঃখ। স্বামীকে জাগাবার জন্য ওর সকল রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল। মানুষটা ভীমকর্মা, কাজ করে অসুরের মতো, তারপর শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে শিশুর মতো। তখন ওকে জাগাতেও খারাপ লাগে।

রান্নাঘরে মোহনভোগ, চাপাটি ও মুরগীর মাংস—সেই কখন থেকে রান্না হয়ে পড়ে আছে। ঘুম থেকে না-ওঠা পর্যন্ত না পারে স্বামীকে দিতে, না পারে নিজের রোজা ভাঙতে। খুব খিদে পেয়েছিল বেচারীর। তাই নিরুপায় হয়ে স্বামীকে জাগাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। জাগাতে না পেরে আবার স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

জাহানারার খুব ইচ্ছা করছিল স্বামীর সঙ্গে কথা বলে, গল্পগুজব করে। পান্নু আজ তার বাবা চণ্ডী আহিরের কথা বলে দুঃখ করছিল। আজ কাল ওর বাপ খুব মদ খায়। কোনো কোনো দিন রাতে বাড়ি ফেরে না। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙালী বাবুর কাছে গিয়ে ধর্মচর্চা করে। পান্নুর পক্ষে বাবাকে সামাল দেওয়া শক্ত। দুর্গা নিজেদের ঘরের চেয়ে ভালোবাসে প্রধানের ঘরে নয়নমণির সঙ্গে গল্পগুজব করতে। দুজনের প্রেম দিন দিন গভীর হতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো বিয়ের নামগন্ধ নেই। রামুর প্রস্তাবে লছমী এখনো সায় দেয়নি, সায় দিলেই বোধন রক্ষা পায়। কন্ট্রাকটার সিং আজকাল আর ওকে বাড়ির কাজ করার জন্য ডাকতে আসে না, এলেও লছমীর কাছ থেকে উচিত কথা ওকে শুনতে হয়।

এসব ছাড়াও আরো অনেক খবর ছিল। বকুয়ার স্ত্রীর ছেলেপুলে হবে বলেই সে এখন ঘন ঘন হাসপাতালে আসা যাওয়া করছে। সব চাইতে বড়ো খবরটা হল এই যে জাহানারা নিজেও সন্তানসম্ভবা। আজ সেকথাটা সে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছে। সেই কথাটা বলতে যেতেই তো গিয়াসুদ্দীন নাক ডেকে নিদ্রামগ্ন হ'লেন। এই সব কারণেই স্বামীকে মাঝে মাঝে ওর খারাপ লাগে। লোকটা কোথাও বেড়াতে বেরোবে না, সিনেমায় নিয়ে যেতে বললেও ঘোরতর অনিচ্ছা, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াবেনা। মামার বাড়ি যে যাবে, তাও হয়ে ওঠে না জাহানারার। পর্ব, ধর্মানুষ্ঠান, খেলাধূলো ইত্যাদিতে গিয়াসুদ্দীনের কোনো স্পৃহা নেই বললেই হয়। কেবল কিছু উৎসব এলে একটু যেন গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু জাহানারা এ-বাড়িতে আসার পর কিছু হয়নি। সে দিন নাকি অন্যদের সঙ্গে নাচগান হৈ হল্লাও করে।

এভাবে বুকের মাঝখানে শুয়ে থাকতে থাকতে জাহানারাও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে কোনো একটা সময় গিয়াসুদ্দীনের ঘুম গেল ভেঙে, বুকের উপর জাহানারার শান্ত, স্নিগ্ধ, ছোট্ট মুখখানা দেখে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর এখন বেশ খিদে পেয়েছে। তাঁর মনে হল, জাহানারা হয়তো অভিমানে রোজা না ভেঙে শুয়ে পড়েছে। আস্তে করে তিনি জাহানারাকে পাটির উপর শুইয়ে দিলেন, তারপর তাকে টেনে নিলেন বুকের মাঝখানে। কিন্তু জাহানারার শিথিল দেহে কোনো আকুল প্রাণের উচ্ছ্বাস নেই, স্পর্শ করলে পুলক জাগেনা দেহে, বুকে নেই কোনো পাগল করা উত্তাপ। জাহানারা যেন শুকনো মাদার গাছ, কেমন করে প্রাণোচ্ছলতা জাগবে তার মধ্যে ?

অনেক দিন আগের একটি চোখে-দেখা ঘটনার কথা গিয়াসুদ্দীনের মনে পড়ে গেল। তখন সে ডিম্বেশ্বর, গিয়াসুদ্দীন নয়। হঠাৎ ফিল্ড-এ কাজ করার সময় একটা যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটার ফলে ইঞ্জিনিয়র সায়েবকে ডেকে আনার দরকার হয়। তখন সায়েবের ক্লাবের সময়। ফোন করে কিছু ফল হল না। ক্লাবের কীপার জানাল তখন নাচ চলছে, সুতরাং সায়েবকে ফোনে পাওয়া যাবে না। ডিম্বেশ্বরের স্বভাবটাই সব কাজ তড়িঘড়ি করে করা। একটা ট্রাকে চড়ে তিনি তো চলে গেলেন ক্লাবে। কীপারকে বললেন, 'সায়েবকে ডেকে দিন।' কীপার সভয়ে বলল, 'নাচের মাঝখানে সায়েবকে যদি ডাকতে যাই, সায়েব খুব চটে যাবেন। আপনি বরঞ্চ আপনার ফিল্ড-এ ফিরে যান।'

'কী করে যাই? সায়েবের সঙ্গে যে জরুরী দরকার। একবার ডেকে দিন না ইঞ্জিনিয়র সায়েবকে?'

কীপার বললেন, 'অসম্ভব! সায়েব এখন নাচে মগ্ন।'

ডিম্বেশ্বর বললেন, 'দেখি, কোথায় সায়েব নাচছেন?' তাঁর কৌতূহল হল। কীপার হেসে বললেন, 'তাই বলুন। নাচ দেখতে চান? আসুন।' কীপার তাঁকে নিয়ে গেলেন বার-এর সংলগ্ন লাউঞ্জে। সেখানে আছে একটা সাইপ্রিস গাছ—নিচে একটা কাঠের আসন। আসনটা সর্বদা খালি থাকে। সেখান থেকে নাচ দেখা যায় ভালো করে।

নাচের দৃশ্য দেখে ডিম্বেশ্বর তো অবাক। ইঞ্জিনিয়র সায়েব একটি মেমের সঙ্গে যন্ত্রসংগীতের তালে তালে নাচছে। তালে মানে সংগীতটা বেশ উত্তেজক। নাচ যখন চলছে, দু' চার পাক নাচবার পর, ওরা দুজন বলরুমের সংলগ্ন একটা করিডরে ঢুকল। জায়গাটা একটু নির্জন। ইঞ্জিনিয়রকে দেখা গেল, মেমসায়েবটিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। মেমের মুখের ভাবেও একটা অদ্ভুত আকুলতা। দুজনের দেহের গ্রন্থিগুলি যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। দুজনের মুখে লজ্জা কিংবা ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই—দ্বিধা নেই একটুও। সর্ব অঙ্গে যেন একটা মিলনের উচ্ছ্বাস। মেমসায়েবের বুক দুটো নাদুস নুদুস হাঁসের বুকের মতো কাঁপছে। সংগীতের তালমান তখন উঠেছে চরমে। হঠাৎ করিডরের বিজলি বাতিটা সাদা থেকে নীল হয়ে গেল। সেখানে কী ঘটছে আর দেখা গেল না। বলরুমে তখনো নাচ চলছে।

ডিম্বেশ্বরের গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ। আসনটা ছেড়ে উঠে এসে তিনি কীপারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কার মেম?'

কীপার বললেন, 'বিলেত থেকে এসেছেন। এঁদের দুজনের বিয়ে হবার কথা কিছু দিনের মধ্যে। শুনলাম, মেমটি আমাদের কোম্পানীর ডাইরেক্টরের মেয়ে।'

ডিম্বেশ্বর বললেন, 'একটু মদ থাকে তো দিন, গলাটা ভিজিয়ে নি—একেবারে শুকিয়ে গেছে।' কীপার এক গেলাস স্কচ্ আর সোডা এনে দিলেন। ডিম্বেশ্বর হুইস্কিটা শেষ করে বললেন, 'ইঞ্জিনিয়র সায়েবকে বলুন ইঞ্জিনটা বিগড়েছে। দেরি না করে ফিল্ড-এ যেতে হবে।'

ইতিমধ্যে ডিম্বেশ্বর নিজে একবার ফিল্ড ঘুরে এলেন। রাত একটার সময় সায়েব বেরোল ক্লাব থেকে, সঙ্গে সেই বাগদত্তা মেম। সায়েব জিজ্ঞেস করল, 'কাজ বন্ধ রয়েছে কতক্ষণ ?'

'প্রায় ছয় ঘন্টা।'

'গুড গড! আমায় খবর দিলে না কেন ?' সায়েব জিজ্ঞেস করল।

'এসেছিলাম খবর দিতে। কিন্তু...' ডিম্বেশ্বরের মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। সে তাকিয়ে রইল মেমটির দিকে। সোনালী চুলগুলো ঝুলে ছড়িয়ে আছে মুখের উপর, লাল ঠোঁটের উপর পুষ্ট দুটি লাল গোলাপের মতো গাল।

সায়েব হেসে বলল, 'ইনি আমার বাগদত্তা।'

'গুড মর্নিং'—ডিম্বেশ্বর বললেন।

মেমসায়েব মাথা একটু নামিয়ে প্রতিনমস্কার করল।

□

কিছু কিছু মেয়ে কেন এমন আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয় এবং কিছু মেয়ে কেনই যে এমন জোলো, বিস্বাদ ও প্রাণহীন হয়—গিয়াসুদ্দীন জানে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি জাহানারাকে বুক থেকে সরিয়ে দিলেন। জাহানারা জেগে উঠল, চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ?'

'কিছু হয়নি।' গিয়াসুদ্দীন আবার তাকালেন ওর দিকে। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'খাবার কিছু থাকে তো দাও। তুমিও তোমার রোজা ভাঙো।'

জাহানারা হেসে বলল 'একটা খবর আছে।'

'কি ?'

জাহানারার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। গিয়াসুদ্দীন ওর মুখখানা নিরীক্ষণ করে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

গিয়াসুদ্দীনের মনটা যেন গলে গেল। আবার তিনি জাহানারাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন।

এইজন্যেই তো বিয়ে করেছেন তিনি।

চোদ্দ

ডিগবয়ে ইশতাহার বেরিয়েছে। শহরের পথে পথে আসাম লাইট ইনফেন্ট্রির সায়েবরা ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে মাকুম ছাউনি থেকে

আসাম রাইফেল্স-এর সেনারাও আসছে যাচ্ছে। এক হাজার খনি মজুর ছাঁটাই করার পর সায়েবরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। পুলিশ কমিশনারকে ঘন ঘন আসতে হচ্ছে। শহরের সকল মজুরের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাবুর্চি খানসামা বেয়ারা মালী—কাউকেই বাদ দেওয়া হচ্ছে না। সকলের চলাফেরার নিয়মিত হিসাব নেওয়া হয়। কণ্ট্রাক্টার বীরভদ্র সিং এদিকে সর্বত্র মিথ্যে গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে ডিগবয়ে নাকি টেরোরিস্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

গিয়াসুদ্দীনের ধারণা ছিল যে সায়েবরা আর যাই হোক না কেন, ভয় পাবার পাত্র নয়। কিন্তু শ্রমিকদের ভয়ে তারা এতটা হতবুদ্ধি হবে –সে তিনি ভাবতে পারেন নি। টেরোরিস্ট আন্দোলন কলকাতায় হচ্ছে, কিন্তু এখানে হয়নি। সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হতে পারে এমন কোনো লোকও এ পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়েনি। সসাগরা পৃথিবীর যারা অধিপতি, তাদের নিঃশঙ্ক বুকগুলো সামান্য শ্রমিক ধর্মঘটের আশঙ্কায় কেঁপে উঠল? গিয়াসুদ্দীন হেসে উঠলেন—তবে তো বৃটিশ সিংহকে কাঁপিয়ে দেবার মতো কোনো গোপন শক্তি এই সব শৃগালপালের মধ্যেও আছে? কীসের ভয় ওদের—সম্পত্তির না প্রাণের? ওদের হাতে আছে বিজ্ঞানের শক্তি; যার ফলে ওরা সুদূর ডিগবয়ে এসে খনি খুঁড়ে তেল নিষ্কাশন করছে। ওদের হাতে আছে অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি, যার ফলে ওরা পৃথিবী জয় করে সর্বত্র ওদের য়ুনিয়ন জ্যাক্ ওড়াচ্ছে। তবু সেই প্রচণ্ড শক্তি জনবলের ভয়ে কেঁপে উঠবে কেন?

সায়েবরা কিন্তু ভয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। ওদের ইচ্ছা য়ুনিয়ন যেন না হয়। এইমাত্র আহমেদ সাহেবের বাড়িতে গিয়াসুদ্দীন সব কথা শুনে এসেছেন। সায়েবদের প্রতি আহমদ সাহেবের অসীম ভক্তি। সায়েবদের মর্জি হলেই এখানে চাকরিতে উন্নতি হয়। আর ওদের মর্জি পেতে গেলে ওদের প্রতি অচলা ভক্তি থাকা দরকার। এই কথাটাই তিনি ইসমাইল ও গিয়াসুদ্দীনকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। য়ুনিয়ন গড়লে পর সায়েবরা এখন যেটুকু দিচ্ছে, সেটুকুও দেবে না। যারা য়ুনিয়ন করতে চায় তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—হয় প্রমোশন বন্ধ হবে নয়তো, চরম ক্ষেত্রে, বরখাস্ত পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং সায়েবদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি বড় সায়েবকে ওদের দুজনের কথাই বলে রেখেছেন। ইসমাইলের প্রমোশন হবে এবং গিয়াসুদ্দীনেরও পদোন্নতি ঘটবে। ইশতাহার হাতে এলেই আহমদ সাহেব তা পুড়িয়ে ফেলছেন। আহমদ সাহেবের সেই ঘরোয়া আলোচনায় বুড়ো নাসিরুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন, তিনি কিন্তু সায়েবদের উপর খড়্গহস্ত। কালা আদমীকে ওরা বিশ্বাস করে না, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কাজিয়া লাগিয়ে দিয়ে ওরা য়ুনিয়ন ভেঙে ফেলতে চাইছে। সায়েবদের প্রতি বুড়োর অসীম সন্দেহ।

ইসমাইল আহমদ সায়েবকে কড়া কথা শুনিয়ে এসেছে, 'একবার ওদের চক্রান্তে পড়ে যা হবার হয়ে গেছে। দু'বার কি আর ওদের ফাঁদে পড়তে হয়?' ইসমাইলের

স্পষ্ট কথা শুনে আহমদ সায়েব রুষ্ট হলেন, কিন্তু ইসমাইল কারো মুখ তাকিয়ে কথা বলার মতো ছেলে নয়। গিয়াসুদ্দীন কোনো কথা না বলে কেবলই হাসছিলেন, 'সায়েবদের খাতির করতে যাবেন তিনি ? কখনো যাবেন না। ইশতাহারে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তো মিথ্যা নয়, সব সত্য কথা। য়ুনিয়ন একটা গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে সামান্য অজুহাতে শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেবে, আর তারা অসহায় ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।'

আহমদ সাহেবের ওখান থেকে বাড়ি ফিরে গিয়াসুদ্দীন সামনের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিলেন। ভিতর বাড়িতে জাহানারা পড়াচ্ছে পান্নুকে। লছমী এখনো হাসপাতালে, ছাড়া পাবে কয়েকদিন পরে।

বারান্দা থেকে গিয়াসুদ্দীন দেখলেন, বরুয়া সাইকেল চেপে কাজের শেষে বাড়ি ফিরছেন। খাকী হাফ প্যান্ট, শাদা শার্ট, পায়ে জুতো মোজা। সবল সতেজ যুবক, দ্রুত প্যাডেল চালিয়ে চলেছেন। গিয়াসুদ্দীন হঠাৎ ওকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। বরুয়া সাইকেলটা বেড়ার কাছে রেখে গিয়াসুদ্দীনের বাড়ি ঢুকলেন। বরুয়ার মুখে হাসি, ঠোঁটে পানের লাল রঙ।

'মাছ খাওয়াবেন কবে ?' গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

বরুয়া দিলখোলা হাসি হেসে একটা চেয়ার টেনে বসলেন, বললেন, 'আপনি খাওয়াবার আগেই।'

গিয়াসুদ্দীন খুব খুশি হয়ে বরুয়াকে একটি সিগারেট দিয়ে বললেন, 'ঘর বানানো শেষ হয়েছে কি ?'

বরুয়া বললেন, 'ঘরটা তো উঠেছে। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি। জিনিসপত্র পাওয়া খুব শক্ত।'

গিয়াসুদ্দীন হাসতে হাসতে বললেন, 'কেন ? এই যে শুনলাম সিং-জী জিনিসপত্রের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করছে ?'

বরুয়া এবার আর হাসলেন না। গুজবটা মজুরদের মুখে মুখে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সাফাই একটা দিতে গিয়ে বরুয়া আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, গোড়ার দিকে সিং-জী কিছু সাহায্য করেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর একটা কোনো মতলব ছিল। একদিন কথায় কথায় তিনি যখন য়ুনিয়ন গঠন না করার জন্য আমায় উপদেশ দিলেন, আমি চুপ করে গেলাম। ভেবেছিলাম ঘর থেকে বের করে দেব। সেদিন থেকে যোগাযোগ শেষ। কিন্তু গুজবে তিল থেকে তাল হয়। তা হোক, ঘরটা আমি শেষ করে ছাড়ব।'

বরুয়ার হাতে ছিল এক কপি 'তিনদিনীয়া অসমীয়া'। গিয়াসুদ্দীন সেখানা নিয়ে দেখলেন প্রথম পৃষ্ঠায় খবর বেরিয়েছে 'তেলনগরে সন্ত্রাসবাদী'—কোনো কৌতূহলী সাংবাদিকের আবিষ্কার। আর আছে বরুয়ার শ্বশুরের জেল থেকে মুক্তির খবর, কারো কারো গ্রেফতারের খবর। গিয়াসুদ্দীন দু-চার মিনিট হেড লাইনের উপর চোখ বুলিয়ে কাগজখানা বরুয়াকে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইশতাহারের

কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে না হয়নি? সিংহের ভয়ে শেয়ালগুলো বুঝি থ' মেরে গেছে? য়ুনিয়ন গড়ে তুলতে পারবে কি? চণ্ডী তো কালীপূজোর নাম করে সিং-জীর কাছে টাকা পেয়েছে। সে নাকি য়ুনিয়ন টুনিয়ন নিয়ে মাথা ঘামাবে না। পান্নুর কাছে সব খবর পাই। ওদিকে দুর্গা তো নয়নমণিকে নিয়ে মশগুল।'

বরুয়া কৌটো থেকে একটা পান বের করে গিয়াসুদ্দীনকে দিলেন, নিজেও একটা মুখে পুরলেন। পান চিবোতে চিবোতে গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এ দেশী তামাকপাতা ভালো যদি থাকে, আমাকেও কিছু দেবেন তো? বেশ ভালো লাগছে গন্ধটা। কোথা থেকে আনিয়েছিলেন?'

'শ্বশুর বাড়ি থেকে। তিনি আসবেন যখন নিশ্চয় কিছু নিয়ে আসবেন। তখন আপনাকে দেব—কেমন?' বরুয়া বললেন।

গিয়াসুদ্দীন বরুয়ার সরল মুখের দিকে তাকিয়ে দিলখোলা হাসি হাসলেন। বরুয়াও দেখলেন গিয়াসুদ্দীনের মুখের ভাবে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনের চিহ্ন তার চোখে মুখে সর্ব অঙ্গে। আগেকার সেই কঠিন ভাবটা যেন নরম হয়ে এসেছে, গুমোট গেছে কেটে। সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনেই কি এই পরিবর্তন? সম্ভবত তাই। সন্তান হবে শুনে বরুয়া নিজেও মনের মধ্যে একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করেছিল।

হঠাৎ ওদের ভাবধারা প্রবাহিত হল অন্য একটা খাতে। পান্নু বেরিয়ে এল—ওর চোখে মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া। কী একটা দুঃখ যেন ওর বুকের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।

বরুয়া পান্নুকে শুধোলেন, 'কী হয়েছে তোমার পান্নু?'

'কই, কিছু তো হয়নি।' পান্নু ধরা গলায় জবাব দিল। তারপর একটু অভিমানের সুরে বলল, 'আপনারা কেউ দেখি আমাদের বাড়ির দিকে পা মাড়াতে চান না। বাড়িটার যা অবস্থা—কখনো কখনো মনে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

গিয়াসুদ্দীন পান্নুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। উনি ভাবতেই পারেন নি যে, মেয়েকে উনি নিত্য চোখের সামনে দেখছেন, হঠাৎ তার মনে একটা স্বাধীন ইচ্ছার আবেগ ফুটে উঠতে পারে। 'কী হল তোমার, বলো তো?' গিয়াসুদ্দীন শুধোলেন. পান্নু চুপ করে রইল। একটা কথায় বলে, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। গিয়াসুদ্দীন কখনো সেকথার তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামান নি। দু' দুইবার সংসার করা সত্ত্বেও এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি। অনুভব না করারই কথা। মেয়েদের হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্য পুরুষের যে একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, সে-ক্ষমতা যে তাঁর নিজের মনেও সুপ্ত হয়ে ছিল, সে তিনি বুঝতেও পারেননি। আজ পান্নুর হাবভাব ও কথাবার্তায় হঠাৎ যেন সেই অনুভূতি জাগ্রত হল।

পান্নু বলল, 'এ শহরে যুবতী মেয়েদের কি অন্য কোনো মূল্য আছে? সায়েব

থেকে শুরু করে চাপরাসী পর্যন্ত, সকলে নজর করে এই দেহটাকে। কিন্তু মেয়েদের যে একটা মনও থাকে, সেদিকে কেউ নজর দেয় না—না বাপ-দাদা, না প্রতিবেশী।'

মনে হল কথাগুলি বলতে পান্নুর খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু সে তার মনের সব কথা বলতে পারল না। মেরু সমুদ্রে যে বরফের পাহাড় দেখা যায় তার বেশির ভাগই থাকে নাকি জলের তলায়, উপরে কেবল মাথাটুকু ভেসে থাকে। পান্নুর মনের কথা যেন মনের গভীরেই রয়ে গেল, যা বলল তা যেন নিতান্তই ভাসাভাসা গুটিকত কথা।

গিয়াসুদ্দীন কী যেন একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন, এমন সময় জাহানারা চা নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বরুয়ার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে জাহানারা বলল, 'আপনারা পুরুষ মানুষ বুঝতে পারেন না। যুবতী মেয়েকে একা ঘরে রেখে বাড়ির পুরুষ মানুষেরা যেখানে সেখানে যদি ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কেমন লাগে মেয়েটির? আর পান্নুর মত মেয়ে! সেইজন্যেই তো ওকে বলেছি, 'তুই পড়াশুনো কর। তা না হলে...'

'তা না হলে কি হবে?' বরুয়া চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তা না হলে কি হবে আবার?' জাহানারা পান্নুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। জাহানারা জানে কি হতে পারে, কিন্তু বলতে ভয় করল। পান্নু আজ তাকে সব কথা খুলে বলেছে। পাড়ার সকল মেয়ের আদর্শ এখন নয়নমণি। তারা সবাই চায় নয়নমণির মতো কারো সঙ্গে প্রেম করতে, মা-বাবা যদি বাধা দেয় তাহলে ছোট ছেলেমেয়ের মতো নাকি-কান্না জুড়তে, এবং তেমন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বাপের বাড়ি ছেড়ে নিজের বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদের সঙ্গে ঘর বাঁধতে। কিন্তু এসব কথা না জানে বরুয়া না গিয়াসুদ্দীন। যুবতীদের হৃদয় আজকাল নেচে উঠেছে নারীমুক্তির ছন্দে।

পান্নু বেশীক্ষণ থাকল না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পান্নু চলে যেতে বরুয়া জাহানারাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কি হয়েছে, বলুন দেখি?'

জাহানারা হেসে বলল, 'কি হবে আবার, নয়নমণির রোগ ধরেছে। নয়নমণি কি করেছে শোনেন নি?'

'কি করেছে?' বরুয়া শুধোলেন, গিয়াসুদ্দীনেরও কৌতুহল হল।

'কোথায় আছেন আপনারা? শোনেন নি নয়নমণি বাপের ঘর ছেড়ে দুর্গার সঙ্গে আছে গতকাল থেকে। প্রধানের অবস্থা পাগলপারা, একবার নাকি কুকরী বের করে দুর্গাকে কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। নয়নমণি নিজের গলাটা বাড়িয়ে দিতে ক্ষান্ত হল।'

বরুয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেল। কী সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটতে লেগেছে শহরটাতে! একটা কাণ্ড করলেন ডিম্বেশ্বর, এবার নয়নমণি ঘটাল আরো একটা। জেবউন্নিসা হঠাৎ নিজেকে শুধরে নেবার কাজে লেগেছে। এইবার পান্নু না জানি কি করে বসে? প্রাচীন সব সংস্কার যেন ভেঙে যাচ্ছে শহরে।

গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'নয়নমণি তাহলে কি করছে এখন?' জাহানারা জবাবে বলল, 'ওর গানের গলাটা তো খুব ভালো, মিসেস ফ্লেমিংকে ও নেপালী গান শেখাচ্ছে। লোকসংগীত। মেয়েটার ভাগ্য ভালো। মিসেস ফ্লেমিং তো এদিক ওদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। জেনারেল ম্যানেজার হলেন তাঁর স্বামী। স্বামীকে বলে তিনি দুর্গাকে নিজেদের বাংলোর ড্রাইভার করে নিয়েছেন। সর্বদাই মোটরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, নয়নমণি সঙ্গে থাকে। ওকে দেখে পান্নুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার মতো—ও বোধহয় কাউকে ভালোবাসে।'

'কাকে?' গিয়াসুদ্দীন চমকে উঠল। তারপর হাসতে হাসতে একটা সিগারেট ধরাল।

বরুয়া বললেন, 'শুনেছি ও নাকি ভালোবাসে ইসমাইলকে।' গিয়াসুদ্দীন চুপ করে রইল।

জাহানারা বরুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার অন্তরে তখন তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব। পান্নু কাকে যে ভালোবাসে সে কথা খুলে বলা সহজ নয়। সে খুবই জটিল ব্যাপার। ভালোবাসা, বিয়ে করা—এগুলি মনুষ্য জীবনের ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ সব সময় তার কার্যকারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। জাহানারা আর কোনো কথা না বলে অন্দরে ঢুকে গেল।

বরুয়া গিয়াসুদ্দীনের কাছ থেকে কোনো জবাব পেলেন না। অবশ্য তাঁর যে এবিষয়ে খুব কৌতূহল ছিল—এমনও নয়।

এমন সময় হঠাৎ অনতিদূরে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল শোনা গেল। ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। বরুয়া দেখলেন চণ্ডী আহির ও চ্যাটার্জি ছুটে আসছেন আগেভাগে এবং তাদের পিছনে রিফাইনারীর প্রায় দশ বারোজন লোক। গেট খুলে তারা দাঁড়াল গিয়াসুদ্দীনের সামনে। চ্যাটার্জি হাঁপাচ্ছেন, চণ্ডীর বুকটাও ঘন ঘন উঠানামা করছে।

'কী ব্যাপার?' গিয়াসুদ্দীন শুধোলেন।

'ব্যাপার আবার কি! কথা নেই, বার্তা নেই পঞ্চাশ জন লোকের উপর সায়েব বরখাস্তের নোটিশ জারি করেছে। সবাই রেগে লাল, এক মুহূর্তে রিফাইনারীর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কাজ করবে না, সবাই বেরিয়ে এল রিফাইনারী থেকে। ওদিকে খনির শ্রমিকেরাও খবর পেয়ে খুবই অবাক হয়ে গেছে, তারা যে কী করে কিছু ঠিক নেই। বড় সায়েবের বিমূঢ় অবস্থা। আজই নাকি এক হাজার গ্যালন তেল কোথায় পাঠাতে হবেই, তা না হলে কোম্পানীর মোটা লোকসান। আপনাকে আর বরুয়া বাবুকে বড় সায়েব একবার ডেকে পাঠিয়েছে।' চণ্ডী বলল।

গিয়াসুদ্দীন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি গিয়ে কি করব? কেন ওরা তাড়াতে গেল মজুরদের? এই তো সেদিন একদল তাড়াল। তাতেও বুঝি আশ মেটেনি?'

চণ্ডী জবাবে বলল, 'নতুন মেশিন এসেছে। তার ফলে লোক কম লাগে। আগে

ইঞ্জিন চালাবার জন্য কত লোক লাগত—এখন পাঁচজনের জায়গায় একজন হলেই যথেষ্ট।'

বরুয়া বললেন, 'তাই বলে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে কেন?'

'না তাড়িয়ে কি করে বলুন?' চণ্ডী জিজ্ঞেস করল। 'কোম্পানীর এখানে তো অনেক লোককে দেবার মতো অঢেল কাজ নেই।'

বরুয়া এর কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কোম্পানী ভালো ভালো মেশিন এনে বসাবে নিশ্চয়, কারণ তার ফলে পর্যাপ্ত তেল বেরোবে আর মাইনে দেবার জন্য প্রতিমাসে মোটা টাকা গুণতে হবে না। ওরা মানুষের হিতাহিত চিন্তা করতে যাবে কেন, ওদের লক্ষ্য হল বেশি বেশি টাকা উপার্জন। টাকার খাতিরে ওরা মানুষকে চিতার আগুনে ঠেলে দিতেও পিছপা হবে না। মানুষের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক দরদ থাকে, কোম্পানীর তা থাকতে যাবে কেন? কিন্তু বড সায়েবের কাছে গিয়ে বরুয়া কি করবেন? বড় সায়েব বলবে, 'বরুয়া, এদের তুমি শান্ত করো।' কিন্তু কী শক্তি আছে বরুয়ার? তবু অধস্তন কর্মচারী যখন, বড় সায়েব ডেকে পাঠালে যেতেই হয়। বরুয়া চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও গিয়াসুদ্দীনকে বলল, 'চলুন, শুনে আসা যাক বড সায়েব কি বলে।'

গিয়াসুদ্দীনের কপাল থেকে দরদর ঘাম ছুটছে, তাঁর পক্ষে ঘটনাটা চিন্তার বিষয়। সায়েবকে বলবার মতো একটি কথাই আছে গিয়াসুদ্দীনের—'নো রিট্রেঞ্চমেণ্ট।' কিন্তু সায়েব কি শুনবে সে কথা—বিশেষত টাওলার সাহেব? ওই সায়েবই তো গণ্ডগোলের মূলে। গিয়াসুদ্দীন শুধোলেন, 'কয়জনকে নোটিশ দিয়েছে?'

'পঞ্চাশ জনকে'।

'এই পঞ্চাশ জনকে তো সহজেই ফিল্ড-এর কাজে নিয়ে নেওয়া যেত। ফিল্ড ছাড়া কোথায় আর কাজ আছে ডিগবয়ে?' গিয়াসুদ্দীন একটু চুপ করে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'চলুন বরুয়া, কথাটা একবার পেড়ে দেখা যাক।'

বরুয়া ও গিয়াসুদ্দীন চণ্ডীদের সঙ্গে সঙ্গে বড় সায়েবের অফিসের দিকে চলতে লাগলেন।

পনের

মেমসায়েব একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন, নয়নমণি লক্ষ্য করল। রক্তাভ মুখখানা, মাথার সোনালী চুলগুলি যেন মুগার সুতোর মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বুটিদার লাল গাউনটার নিচে পাতলা ছিপছিপে দেহখানা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বড় সায়েব এখনো বাংলোয় ফেরেনি।

তখন নয়নমণির গান শুনতেও তার অনাগ্রহ। দুর্গা মোটর নিয়ে গিয়েছিল বড় সায়েবকে আনতে, সেও এখনো ফিরল না। ফোন করেও সায়েবকে পাওয়া গেল না। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে থাকবে। রিফাইনারী আর খনির সব শ্রমিক কাজ কর্ম ছেড়ে অফিসের সামনে জমায়েত হয়েছে।

মার্ঘেরিটায় যাবার জন্য মেমসায়েব তৈরি হচ্ছিলেন। সপ্তাহে একদিন ওদিকে যাওয়া তার শখ। ওদিকে গিরিজন জাতিদের বসতি আছে। সেখানে গিয়ে ছবি তোলেন। তারপর ঘরে ফিরে কীসব যেন লেখালেখি করে। কি লেখে নয়নমণি জানে না, কেবল জানে সেসব লেখা কোন যেন কাগজে ছাপাবার জন্য পাঠায়। মেমসায়েবের মন ও মেজাজ দরাজ—এটুকু জানাই নয়নমণির পক্ষে যথেষ্ট। কাগজের কথা সে কী করে জানবে?

খানিক বাদে খালি মোটর নিয়ে দুর্গা ফিরে এল। এসে বলল 'বড়সায়েব যেতে পারবে না। মেমসায়েব যদি যেতে চান, একলাই যেতে বলে দিয়েছে।'

'কি হয়েছে?'

'পঞ্চাশ জন মানুষ ছাঁটাই করেছে।'

মেমসায়েবের মুখখানা কালো হয়ে গেল। শ্রমিকদের ধর্মঘট—এই জিনিসটাকেই তিনি খুব ভয় করেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তোমরা যেতে পারো।'

মেমসায়েব উপরে উঠে গেলেন। তারপর বাংলোর সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

নয়নমণি দুর্গাকে বলল, 'মেমসায়েব কি জিগ্যেস করছিলেন, জানো?'

'কি'?

নয়নমণির মুখখানা লজ্জায় লাল, বলল, 'জিগ্যেস করছিলেন বিয়েটা কবে হবে।'

দুর্গার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলল, 'পুরুত বামুনের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু বলল তোর-আমার বাবাকে জিগ্যেস না করে কিছু করতে পারবে না। কেবল পান্নু একটা খবর দিল।'

'পান্নুর সঙ্গে তোমার দেখা হল কখন?'

'আজকেই সকালবেলা। সে একটা কাণ্ড করে বসেছে ইতিমধ্যে—বলল বাড়ির কারো কথায় নাকি কান দেবে না, বিয়েও করবে না...'

নয়নমণি জিভ কাটল। কথা নেই বার্তা নেই—বিয়ে করবে না পণ করে বসল। এ যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড—হরি হরি! কৌতূহল ভরে শুধোল, 'তা তুমি কি বললে?'

'কি আবার বলব? বুঝাতে চেয়েছিলাম। তা বললে কি জানো? বলল, তুই কি করছিস? প্রধান বাগে পেলে তোকে কুকরী দিয়ে কাটবে, জানিস তো? আমি বললাম, জানি, কিন্তু কি করি বল, মন যে মানে না। পান্নু বলল, আমারো একই কথা—আমার মনও মানে না। কথাটা সত্যি। প্রেম জিনিসটা ধর্ম বা জাতের তোয়াক্কা করে না। গ্রামে জাতপাতের বালাই থাকলেও, এই শহরে ওসব টিকে থাকবে কি করে? শুনেছো তো মেমসায়েব কি বলেন—প্রেমের কাছে

বাপ মা ছার। বিয়েটা হয়ে গেলে ভালো হয়। কিন্তু এটা তো আর সায়েবদের দেশ নয়—ওদের রাজ্য মাত্র। এখানে প্রেমের পথ অত সহজ নয়। হ্যাঁ, পান্নু আরো একটা কথা বলল, এইসব ব্যাপারে একমাত্র বুঝদার লোক নাকি ডিম্বেশ্বর বাবু। কী গভীর প্রেম দেখলি তো।'

নয়নমণি শুধোল, 'পান্নুর প্রেম কার সঙ্গে? ইসমাইলের সঙ্গে কি?'

দুর্গা বলল, 'আমায় কিছু বলেনি।'

নয়নমণি চুপ করে রইল। বিয়ের জন্য মেয়েটা পাগল হয়ে উঠেছে। বলল, 'দেখো দুর্গা, এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। বিয়ে না হয়ে এভাবে থাকা, আমার উচিত হয় না। তুমি আজই গিয়াসুদ্দীনবাবুর কাছে যাও। শুনেছি আদালতে গিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। তোমার দুটো দিন ছুটি নিতে হবে। মেমসায়েব বলেছেন গাড়ি দেবেন।'

'গাড়ি দেবেন বলেছেন?' দুর্গা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ'।

'মেমসায়েব যেন মেমসায়েব নয়, করুণাময়ী মায়ের মতো। তাঁর আশ্রয়ে আছি বলেই বাঁচোয়া, তা না হলে প্রধান আমায় আস্ত রাখত না। একমাত্র পান্নু আমাদের বিয়েটা খুব সমর্থন করেছে। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনবাবু তো এখন টাওলার সায়েবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন,—নিশ্চয় বলছেন ছাঁটাই করা পঞ্চাশ জন লোককে আবার কাজে নিতে হবে। জিলাপসী সায়েব টাওলার সায়েবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কী দুর্দান্ত সাহস মানুষটার, গড়গড় করে ইংরেজী বলে, ভয়ডর বলে কোনো পদার্থ নেই ওঁর মনে। বড় সায়েব আপিসের ভেতরে বসে আছেন, একেবারে মন মরা। এসব গণ্ডগোল ওঁর ভালোলাগে না। চারিদিকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। দেখবি নাকি? তাহলে চল, নাসিরুদ্দীনের বাংলোর টিলা থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।'

দু'জনে চটপট উঠে গেল পাশের বাংলোর টিলার উপরে। সেখানে নাসিরুদ্দীনের ঘরের কাছে বসে, নিচের দিকে অপিস প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে দেখল। হাজার দুই লোক জমায়েত হয়েছে, সকলেই গলা ফাটিয়ে অসম্ভব চেঁচামেচি করছে। গিয়াসুদ্দীন তার শার্টের আস্তিন গুটিয়ে জনতাকে কী সব যেন বলছেন। সামনে মালা সিং দাঁড়িয়ে আছে—বিরাট বপু শিখ সর্দারের মাথার পাগড়িটা রোদে ঝলমল করছে। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডী আহির, বরুয়া ও চ্যাটার্জি। ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে কী থেকে কী হতে চলেছে সে বিষয়ে ওরা কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

দুর্গা বলল, 'দেখবি, গিয়াসুদ্দীন সাহেব না জিতে ছাড়বে না। কিছুতে পেছ পা হবার মানুষ নয়, জানিস তো ওকে ছাড়া খনির কাজ অচল। তাই জিলাপসী সায়েব সমীহ করে চলে, বড় সাহেবের তো কথাই নেই। এরকম সুদক্ষ লোক

নাকি আমাদের কোম্পানীতে আর দ্বিতীয় নেই। সায়েবের সুনজরে আছে যখন তখন কি ভয়?'

কথাবার্তা, তর্কাতর্কি কি চলছে নয়নমণির খুব শোনবার ইচ্ছা। জনতার মধ্যে সে তার বাবাকেও খুঁজে বের করতে চাইছিল। চণ্ডীর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে প্রধান। নয়নমণির মনটা খারাপ, আজ প্রায় দু' সপ্তাহ হল ঘরবাড়ির সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই। সব বাঁধন যেন ছিঁড়ে গেছে, আবার কখনো জোড়া লাগবে কিনা কে জানে? প্রধানেরা নেপালী ক্ষত্রিয়—মহাকালের পূজারী, ওরা জানে অনাচারের শাস্তি হল বলিদান। সেইজন্য ওর মনে মনে বিশেষ উদ্বেগ—যাতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। দুর্গার একটু সাহস কম, গত দু' সপ্তাহে কিছু করে উঠতে পারল না। নয়নতারা অধীর হয়ে পড়েছে।

নয়নমণি বলল, 'দেখো দুর্গা, আজ রাতটাই কেবল এখানে আমি থাকব। এভাবে বসে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য। আর কিছু যদি না হয় তাহলে জেবউন্নিসার মতো নার্স হয়ে যাব। এ তুমি ঠিক জেনে রেখো।'

দুর্গা ওর হাতখানা ধরতে চাইল। নয়নমণি বাধা দিয়ে বলল, 'এখনো নয়। যখন নিজেকে পুরুষ বলে প্রতিপন্ন করতে পারবে, তখন আমায় স্পর্শ করতে পারবে। এখনো সময় হয়নি।'

দুর্গার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে পড়ল। যখনই সে নয়নমণিকে স্পর্শ করতে চায়, তখন এইভাবে সে বাধা দেয়। মেয়েরা কী করে এত নিষ্ঠুর হয়? দুর্গা তো আদালতের হালচাল আইন কানুন কিছুই জানে না। সেখানে কাকে গিয়ে ধরবে? উকিলকে বলতে হবে। চেনাজানা সভ্যভব্য একজন মুরুব্বী না পেলে, একা সে কী করে উকিলের কাছে যাবে? গিয়াসুদ্দীন সহায় হলে অবশ্য আর কোনো কথা নয়। সিং-জী আশ্বাস দিয়েছিল সত্যি—কিন্তু সে জানোয়ারটার নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না নয়নমণি। স্বয়ং মেমসায়েব বলেছেন বিয়ে রেজিস্ট্রি হলে তিনি সাক্ষী হবেন। একি কম ভাগ্যের কথা! তৎসত্ত্বেও দুর্গা এখনো কোনো যোগাড়যন্ত্র করতে পারেনি। নিজের উপরেই ওর ধিক্কার হয়। পান্নুও তো বলছিল 'এভাবে চলাটা তোর পক্ষে ভালো হচ্ছে না, দাদা। সমাজ বলে তো একটা পদার্থ আছে। মেমসায়েব তোকে প্রধানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু ইজ্জত বাঁচাবে কেমন করে?'

পান্নুর কথা শুনে দুর্গা চটে গিয়ে বলেছিল, 'তুই-ই বা কি ইজ্জৎ রক্ষা করে চলছিস, পান্নু? সারা শহর জানে ইসমাইলের সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে। জানিস, জেবউন্নিসা ওর পথ চেয়ে আছে? জিলাপসী সায়েবের বাংলো ছেড়ে সোজা ডিব্রুগড় চলে গেল। দু' মাস পরে যখন নার্স হয়ে ফিরবে তুই তখন কি করবি? ওর রূপ আর গুণের সঙ্গে পাল্লা দিবি কি করে?'

মৃদু হেসে পান্নু জবাবে বলেছিল, 'তুই নিজের চরকায় তেল দে, দাদা। এত সহজে লোকের কথা বিশ্বাস করতে পারিস কী করে? এসব মিছে কথা। তাছাড়া আমি কি করি না করি সেটা আমার ব্যাপার। তুই নিজেরটা সামলে চল।'

দুর্গা অবাক হয়ে গিয়েছিল পান্নুর কথা শুনে। বুঝতে পেরেছিল যে তার এই কমনীয়কান্তি লাবণ্যময়ী ভগ্নীটি এখন তারুণ্যের রসে ভরপুর—কেবল দেহে নয়, মনেও। ওদের পরিবারে এরকম মনের অধিকারী হওয়া অভূতপূর্ব। কিন্তু পান্নু বিয়ে করবে না শুনে দুর্গার মন ভয়ে কাঁপতে থাকে। সংস্কারের বেড়া ভাঙবার সাহস কোত্থেকে পেল মেয়েটা! দুর্গা জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবাকে জিগ্যেস করেছিলি ?'

'কেন জিগ্যেস করতে যাব ? তুই করেছিলি ?' পান্নু সোজা ওর মুখের ওপর বলে দিল।

'আমার জিগ্যেস না করা আর তোর জিগ্যেস না করা, আলাদা ব্যাপার। তুই যে মেয়ে মানুষ!' আমতা আমতা করে দুর্গা বলেছিল।

'ওইটেই তো তোদের ভুল। মেয়েদের বুঝি স্বাধীনতা নেই ? দেখিস আমি কি করি...' এই বলে পান্নু চলে গিয়েছিল।

দুর্গা ভাবে, কি আছে এই মেয়েটার মনে ? মার কথা ওর মনে পড়ল। মা যদি বেঁচে থাকতেন পান্নুকে এতখানি স্বাধীনতা দিতেন কি ? দাদা ও বোনের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল অনেকদিন বাদে। কিন্তু মা-বাবা কিম্বা মৃত ভাই দুটির কথা একবারও এল না ওদের কথাবার্তায়। যেন কোথাকার কোন পূর্ব পরিচিত দুজন লোকের মধ্যে দৈবাৎ দেখা হল চৌরাস্তার মোড়ে। পান্নু তখন প্রতিদিনের পড়াশুনো সেরে জাহানারার বাড়ি থেকে ফিরছিল। দুজনের কথাবার্তায় লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলই না। মেয়েদের আবার লেখাপড়া! শুনলে অসহ্য মনে হয়। সাতপুরুষে যা ঘটেনি পান্নু তাই করতে লেগেছে। কি হবে পড়াশুনা করে ? মেয়েদের একমাত্র সমস্যা হল বিয়ে। পান্নু, জাহানারা, জেবউন্নিসা, নয়নমণি—সবার পক্ষেই খাটে এই সত্যি কথাটা।

নয়নমণি একদৃষ্টে দুর্গার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কি ভাবছো তুমি ? ভয়ে বুক কাঁপছে না তো ?'

অকারণ সন্দেহ। নয়নমণির মধ্যে এই এক নূতন ধরণের অস্থিরতা দুর্গা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছে। দেখেও বিরক্ত হয়। প্রেমের মধ্যে অবিশ্বাস থাকা ঠিক নয়। মেয়েরা সব এই একই রকম। পাখির মতো বাসা না বাঁধা পর্যন্ত যেন এদের রক্ষা নেই।

হঠাৎ নয়নমণি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো, দেখো, কী হচ্ছে। দেখছো সায়েবদের ঘোড়াগুলো কেমন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু একটা হবে বুঝি...'

আসাম লাইট ইনফেন্ট্রির অশ্বারোহী সায়েবরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে অফিসের সামনে। বছরে একবার করে ওদের এই ধরণের কুচকাওয়াজ ও প্যারেড হয়। এরা সবাই চা বাগানের সায়েব। ওদের এইভাবেই সামরিক শিক্ষা নিতে হয়। সব সময় নিজেদের তৈরি রাখার চেষ্টা। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে এই রেওয়াজ চলে

আসছে। কোম্পানীর সায়েবদের ভাগ্য ভালো যে ঠিক এই গণ্ডগোলের মুখেই কুচকাওয়াজের জন্য চা বাগান থেকে এইসব অশ্বারোহী সায়েব ডিগবয়ে জমায়েত হয়েছে। অশ্বারোহীরা সার বেঁধে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে টাওলারের মেজাজ গরম হতে লেগেছে, ঘন ঘন হাত নাড়িয়ে কী যেন সে বলছে। জিলাপসী হাসছে। বলির পাঁঠা হঠাৎ চমকে গিয়ে যেমন উর্ধশ্বাসে পালায়, জনতা তেমনি ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। কেউ কেউ দৌড়তেও শুরু করল। একমাত্র গিয়াসুদ্দীন সায়েব তখনো নির্ভয়ে তাঁর কথা বলে চলেছেন, আর সকলের মুখ শুকনো। নয়নমণি দেখছে প্রধানকে, দুর্গা দেখছে চণ্ডীকে। দুজনেরই মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। সায়েবদের হাতে চাবুক আর কাঁধে তাদের বন্দুক ঝোলানো। কিছু একটা কাণ্ড ঘটবে বুঝি...

নয়নমণি মনের আবেগে বলল, 'বাবারা সবাই ওখান থেকে চলে যাচ্ছেনা কেন ?'

দুর্গা উত্তর দিল না। নেতারা পালালে তো সর্বনাশ। অন্যেরা সবাই পালিয়েছে।

নয়নমণি আর যেন ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না, বলল, 'কখন যে কী হয় তার ঠিক নেই।'

তর্কাতর্কি চলছে। কিছু সময় এইভাবে কাটল। ঘোড়াগুলো গিয়াসুদ্দীনের দিকে এগিয়ে এল। চণ্ডী পালাতে চাইছিল, কিন্তু হঠাৎ কে একজন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল 'এক পা-ও পিছু হটা চলবে না। পরীক্ষা চলছে। সায়েব আমাদের মেরেও যদি ফেলে ভয় কোরো না।'

দুর্গা অস্ফুটস্বরে বলল, 'দেখেছো নয়নমণি লোকটা কে ? ইসমাইল। সেদিন পর্যন্ত ছিল কোম্পানীর খয়ের খাঁ। এবার ওর কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেল। জাতে উঠল।'

নয়নমণি একবার ভালো করে দেখে নিল ইসমাইলকে। সে দু' হাত বাড়িয়ে নিবৃত্ত করল চণ্ডীকে। চণ্ডী থেকে গেল। প্রধান, বরুয়া আর চ্যাটার্জি—যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সায়েবরা এখনো ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে গিয়াসুদ্দীনের দিকে। কী হয়ে যায় তার ঠিক নেই।

নয়নমণিরা কথা কিছু শুনতে পারছিল না। কিন্তু কী কথা হতে পারে, অনুমানে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। সায়েবরা তাদের হাতের চাবুক ঘোরাতে লাগল, মনে হল এখুনি সপাং করে কারো পিঠে গিয়ে পড়বে বা। নয়নমণি ভয়ে চোখ বুজল।

হঠাৎ দুর্গা চেঁচিয়ে বলল, 'বড় সায়েব বেরিয়েছেন! দেখ, হাত নেড়ে কী যেন বলছেন।'

নয়নমণি আবার চোখ মেলল।

এক নিমেষে কী যেন একটা হয়ে গেল। টাওলার ভিতরে ঢুকে গেল—তার পিছনে পিছনে জিলাপসী। বড় সায়েব গিয়াসুদ্দীন, বরুয়া ও মালা সিংকে ডেকে নিয়ে গেলেন আপিসের ভিতরে। অশ্বারোহী সায়েবরা আর এগোচ্ছে না—দাঁড়িয়ে গেছে।

নয়নমণি বলল, 'বড় সায়েব যেন হাসছেন।'

দুর্গা বলল, 'হ্যাঁ। হাসছেন মনে হচ্ছে। একটা কিছু মীমাংসা তা হলে হবে।

এই কোম্পানীর ওপরওয়ালাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি লোকের দরদ আছে মানুষের প্রতি—তিনি হলেন বড় সায়েব। কেমন কি না?'

নয়নমণি বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এবার দেখছি সবাই ঢুকল ভিতরের আপিসে। কিছু একটা হল না কি?'

দুর্গা বলল, 'একটা কিছু মীমাংসা হয়ে যাবে নিশ্চয়।'

দুজনেই অফিসের বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে বসে রইল।

দুপুর বারোটার সময় প্রতিদিন রিফাইনারীতে জলখাবারের ছুটি হয়। সেই সময় সাইরেন বাজে। আজ আর বাজল না। লেক-পাহাড়ের তলার রাস্তায় কেবল মানুষেরা দল বেঁধে যাওয়া আসা করছে। সায়েবদের বাংলোবাড়িগুলোতেও আজ খানা বন্ধ। তাই নাসিরুদ্দীন বাইরে বেরিয়েছিল। একদিনের জন্য জেবউন্নিসার আসার কথা—বুড়ো স্টেশন গিয়েছিল তাকে আনবার জন্য। স্টেশন থেকে তাকে এনে জাহানারার জিম্মা করে দিয়ে বুড়ো টিলার উপর উঠছিল। নয়নমণিকে দেখে হেসে বলল, 'সারা কারখানার চাকা আজ চলছে না, আর তোরা দুজন এখানে আনন্দে মশগুল হয়ে আছিস। বেশ হয়েছে বটে। যৌবন একবার চলে গেলে ফিরে আর পাবি না। কিন্তু এখনো তোরা বিয়ে করলি না বলে মনটা একটু বেজার হয়ে আছে।'

দুর্গা বলল, 'নাসিরুদ্দীন সাহেব, আপনার কথায় খুব খুশি হলাম। কিন্তু কি জানেন, অগ্নি সাক্ষী করে আমাদের বিয়ে হওয়া শক্ত।'

'কি ভাবে অনুষ্ঠান করবি, সে তো তোরা ঠিক করবি।'

নাসিরুদ্দীনের কথায় ছেদ পড়ল, হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল অফিসের সামনের দিকের দৃশ্যে। তিনি ইসমাইলের দিকে তাকালেন, ইসমাইলও একবার তাঁর দিকে নজর করল। নাসিরুদ্দীন হাত তুলে ওকে কী একটা যেন সংকেত দিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন।

নয়নমণি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'ওকে আনতে– নাতনীকে।'

'কাকে? জেবউন্নিসাকে? ওর তো আরো দু' মাস পরে ফেরবার কথা।'

'তুই দেখছি অনেক খবর রাখিস'। তারপর বুড়ো হেসে বললেন, 'ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বলছে, কী যেন একটা দরকারী কথা আছে।'

নয়নমণি হেসে বলল, 'ইসমাইলের হৃদয়টা তা হলে দু' ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ তো পান্না নিয়ে নিয়েছে।'

নাসিরুদ্দীন বুড়ো রসিক মানুষ। নয়নমণির কথায় সায় দিয়ে বলল, 'কেবল একটা ভাগ কেন, এখন তো গোটা হৃদয়টাই পান্নার দখলে। ভাগাভাগি যদি হয় তো এবার হবে—তারই মীমাংসা করার জন্য এসেছে জেবউন্নিসা। আমি ওর মনের

খবর রাখি বলে বলতে পারি। হ্যাঁরে দুর্গা, বল দেখি, তোরা পান্নুর বিয়ে দিবি না?'

দুর্গা বলল, 'সেদিন কি আর আছে নাসিরুদ্দীন সাহেব? মা যেদিন মরল, সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের বাড়িতে সবাই যে যার মতে চলে।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু চণ্ডীর কি মত?'

দুর্গা হাসতে লাগল, 'বাবার আবার কি মত হতে পারে? পান্নুর সঙ্গে বাবার দেখাই হয় না। মত নিশ্চয় নেই, কিন্তু না থাকলেই বা কি? পান্নু এখন একেবারে স্বাধীন হয়ে পড়েছে—সে বলে সে নাকি বিয়ে করবে না।'

নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুনেছি তোদের বাবার কথা। একটা কোনো হোটেলে না কি খায় দায় আর থাকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে। শুনছি মদও ধরেছে। কিন্তু তবু বাপের মন তো, এদিকে হিন্দু। মেয়েকে এভাবে চলতে দেবে কি?'

দুর্গা মৃদু হেসে বলল, 'পান্নু শাসন বারণ মানে না। সে যদি নিজের থেকে বিয়ে করবে বলে, তা হলে আলাদা কথা। তা না হলে কার সাধ্য ওকে সামলায়। ও একেবারে বদলে গেছে...'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'শুনেছি। তবে পান্নু মেয়েটি ভালো। সে কখনো ভুল বা অন্যায় কাজ করবে না। বোধনের মেয়েটা কেমন ছিল সে তো তোরা দেখেছই ছিলি। সিং-জী খুব লেগেছিল লছমীর পিছনে। পান্নু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে কাজে কর্মে লাগিয়ে দিয়েছে। সেটা কি চাট্টিখানি কথা। হ্যাঁ, যা বলেছিস, মেয়েদের চালচলন ধরণধারণ হাবভাব বদলে গেছে। এ শহরে কি না হয় আজকাল! আমার কেবলি কি মনে হয় জানিস?'

'কি'? দুর্গা শুধোল।

'পান্নু ইসমাইলকে বিয়ে করবে না। ইসমাইল নিজেই একথা আমায় বলেছে। ওকে নাকি হিন্দু হতে হবে।'

'কি জানি।'

নাসিরুদ্দীন হাসতে হাসতে বলল 'এই তেলের শহরে কী না হয়। এখানে হিন্দু মুসলমান হয়, মুসলমান হিন্দু হয়। বেশ্যাও সতী হয় আবার সতীও হয় বেশ্যা। বিচিত্র শহর। কিন্তু একটা কথা জানিস, ইসমাইলের তেমন পৌরুষ নেই, গিয়াসুদ্দীন সাহেবের মতো ও নয়।'

দুর্গার মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। এত সব গভীর সমস্যার মধ্যে ও ঠিক প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু পান্নুর সাহসের কথা ভেবে হঠাৎ ওর মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হল। পান্নু এ কি করতে চলেছে? ইসমাইল হিন্দু হলেও ও তাকে বিয়ে করবে না, সে দুর্গা জানে। ও নিশ্চয় অন্য কোথাও ওর মনপ্রাণ দিয়েছে। সেকথা পান্নু ওকে খুলে বলেনি বলেই ওর মনে অনবরত দুশ্চিন্তা।

নাসিরুদ্দীন বলল 'আর ইসমাইলের মনের কথা যে কি—সে নিজেও জানে না। কোনো বিষয় স্থির নিশ্চয় করতে পারে না। ভোমরার মতো ওর মন— কখনো

জেবউন্নিসার রূপ দেখে ভোলে আবার কখনো পান্নুর প্রেমে মজে, কখনো আবার লছমীর হালকা হাসি শুনে সব কিছু ভুলে যায়। নিজের মনকে মাপজোক করতেও জানে না।'

'লছমীও এর মধ্যে ঢুকে গেছে নাকি? নয়নমণি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

দুর্গার আরো বেশি ভাবনা হয়।

নয়নমণি আবার শুধোয়, 'পান্নু কি লছমীর বিষয়ে জানে?'

'বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানে না কি করে আর বলি?'

দুর্গা বলল, 'ইসমাইলের উচিত মনস্থির করা। আচ্ছা, জেবউন্নিসা কেন এসেছে?'

'ইসমাইল ওর একটা চিঠি পেয়েছিল। গতকাল সে-ও নাকি ইসমাইলের একটা জবাব পেয়েছে। তাতে কি লিখেছে না লিখেছে, সে আমি জানি না, জানতে চাইও না। জানিস, এই হৃদয় জিনিসটা ঋতুর মতো, ক্রমাগত বদলাতে থাকে।'

নয়নমণি বলল, 'অসম্ভব। বদলাতে যাবে কেন?'

নাসিরুদ্দীন হাসতে লাগলেন, 'তোর আর কতই বা বয়স। কী করেই বা বুঝবি?'

নয়নমণি প্রতিবাদের সুরে জবাব দিল, 'আমি তো জানি হৃদয় হাটের জিনিস নয় যে বেচা কেনা করা যায়—ইসমাইলের ব্যবহারটা ঠিক হচ্ছে না।'

নাসিরুদ্দীন কোনো জবাব দিলেন না। অবাক হয়ে নয়নমণির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ও যে কথা বলল তা যে একেবারে সত্য নয় এমনটা বলা যায় না। তা নাহলে নিজের স্ত্রীকে এখনো ও ভুলতে পারেন নি কেন? ইসমাইল প্রেমের ব্যাপারে এখনো শিশু। প্রেমের আলো এখনো সে দেখেনি, মেয়েদের মনের কথা সে বুঝতে পারে না। চোখের সামনে একাধিক পথ দেখে হকচকিয়ে গেছে। এবার বুঝতে পারছে একটা কোনো পথ বেছে নিতে হবে। কে জানে তিনজনের মধ্যে কার কেমন চুম্বক শক্তি। নাসিরুদ্দীন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

নয়নমণি বুড়োকে হাসতে দেখে বলল, 'ইসমাইলের উচিত মনস্থির করা। তিন জনাকে এভাবে খেলানো—ভালো কথা নয়।'

নাসিরুদ্দীন জবাব দিলেন, 'শিশু বড়ো না হওয়া পর্যন্ত খেলা নিয়েই মেতে থাকে।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বেশির ভাগ পুরুষই কামাসক্ত। পশুর মতো। আসল কথাটা কি জানিস, নয়নমণি? যাদের প্রচুর টাকা পয়সা, তারা থাকে লোকনিন্দার উর্ধে, তাই তারা দেহসম্ভোগে অসংযত। জিলাপসীর মতো কটা নরপশু আছে এ সংসারে, কিন্তু কোনো নিন্দাই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু ইসমাইল তো ওভাবে চলতে পারবে না, সুতরাং তাকে বেছে নিতেই হবে।'

নয়নমণি চুপ করে রইল। ইসমাইলের প্রতি ওর বিরূপ মনোভাব দূর হল না। জিগ্যেস করল, 'জেবউন্নিসা সত্যিই ওকে বিয়ে করতে চায় নাকি?'

'হ্যাঁ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাসিরুদ্দীন বলল, কিন্তু ওর নামে কলঙ্ক আছে। সেই কারণে ইসমাইল ওকে গ্রহণ করতে চায় না। লছমীরও একই দশা। একদিন না

দুদিন ইসমাইল তাকে দেখেছে ঠিকাদার বীরভদ্র সিং-এর সঙ্গে তার মোটরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অল্পতেই ইসমাইলের মনোভঙ্গ হয়। আর পান্নুর শর্ত সে মেনে নিতে চায় না, হিন্দু হতেও চায় না।'

নয়নমণি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'তাহলে ওর হৃদয়ে সত্যিকার প্রেম নেই। পৌরুষ নেই, পুরুষের অভিমান আছে। এই রকম দরদস্তুর করাটা আমার ভালো লাগে না।'

দুর্গা চুপ করেই ছিল, এবার নয়নমণি দুর্গার সমর্থন লাভের জন্য ওর দিকে তাকাল। দুর্গা তখন পান্নুর বিষয় গভীরভাবে ভাবছে। সে যে ওর সহোদর, ওর বড়ো ভাই—একথা সে ভুলবে কেমন করে? বাবা তো নির্বিকার, আজ বাদে কাল সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে হয় তো। কিন্তু পান্নুও তো স্বাধীনচেতা মেয়ে। ইসমাইলকে সে যে বিয়ে করবে না—সে কথা দুর্গা জানে। নাসিরুদ্দীন মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন। দুর্গা যে বিয়ে করবে না বলে সংকল্প নিয়েছে, সেকথা উনি হয়তো জানেন না। কিন্তু বিয়ে না করে সে কি চিরকাল থাকতে পারবে? এই নিয়ে দুর্গার ভারি ভাবনা। একটা সিগারেট ধরাল দুর্গা, বুড়োকেও একটা দিল।

দুর্গার কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে নয়নমণি বিরক্ত হল। মাঝে মাঝে দুর্গার মনোভাবটা ঠিক ধরতে পারে না বলে সে খুবই বিব্রত বোধ করে। সে জানতে চায় দুর্গার প্রাণের কথা। নয়নমণি তো কোনো কথা ওর কাছ থেকে গোপন করে না, সমস্ত অন্তর উজাড় করে দেয় ওর কাছে। দুর্গা নয়নমণির অসন্তোষ অনুমান করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি পান্নুর কথা ভাবছিলাম। সে যে কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। ওর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।'

'এতকাল বাদে হঠাৎ কর্তব্যের কথা মনে হল। বড়ো দেরি করে ফেলেছো...' নয়নমণির কথায় একটা কৃত্রিম শ্লেষের সুর। সেটাকে শুধরে নিতে গিয়ে বলল, 'অবশ্য তোমার একটা কর্তব্য আছে নিশ্চয়।'

□

টিলার নিচে সেই অফিসের বন্ধ দরজা এখনো খোলেনি। বাইরে অশ্বারোহীরা পাথরের মূর্তির মতো অপেক্ষা করে আছে। রাস্তায় জনতার ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। সমগ্র শহর শান্ত। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। সায়েবরা এখন কি করবে, সেই ভেবে সব কিছু যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। যদি ওই পঞ্চাশজনকে পুনর্নিয়োগ না করে, তাহলে গণ্ডগোল হবেই। একমাত্র গিয়াসুদ্দীন কিছু যদি করতে পারেন—তাঁর উপর সকলের আশা, সায়েবরা তাঁর কথায় কান দেয়, তিনি কোম্পানীর প্রিয় কর্মচারী।

নিচের রাস্তা দিয়ে একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল দুর্গাবাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে। নয়নমণি হেসে বলল, 'নিশ্চয় বরুয়ার স্ত্রী। জানো দুর্গা, উনি খুব ভালো গান গাইতে পারেন। আমায় দেখলে খুব হাসেন।'

'কেন'? দুর্গা জিগ্যেস করল।

'কেন জানো না বুঝি? বাবাদের স্কুলে কিছুদিন মাস্টারনী ছিলেন। তখন থেকে ওঁর সঙ্গে চেনাজানা। আর কিছুদিন বাদে ওঁর প্রসব হবে, তাই হাসপাতালে আসা যাওয়া করছেন, স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছেন। একদিন আমায় কানে কানে ফিসফিস করে বলেছেন বিয়ের পর যেন ওঁদের বাড়ি বেড়াতে যাই...'

'কিন্তু বরুয়া তো বাবাদের পক্ষ নিয়েছেন।'

'পুরুষেরা সব এক জাতের। মেয়েদের জাত আলাদা।' নয়নমণি হাসতে লাগল।

নাসিরুদ্দীন রসিকতা করে বলল, 'কেবল জাতে আলাদা নয়, মেয়েরা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। পুরুষেরা কি মেয়েদের মতো প্রেমের ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারে? প্রেম হল নারীর প্রাণ। পুরুষের প্রেম মনের খেয়ালখুশি। পুরুষেরা কাউকে তাদের প্রাণ দিতে চায় না।'

বুড়োর কথা শুনে দুর্গা-নয়নমণি হাসতে লাগল।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর অফিসের দরজা খুলল। সবার আগে দেখা গেল বড় সায়েবের মুখ। তাঁর পিছনে জিলাপসী—বাদবাকি জিলাপসীর পিছু পিছু। কেবল টাওলার সায়েবকে দেখা গেল না।

এদিকে মেমসায়েবের মুখখানা দেখা গেল বড় সায়েবের বাংলো বাড়ির দোতলার বারান্দায়। সোনালী চুলগুলি তখনো উজ্জ্বল হয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। দুর্গা বুঝতে পারল এবার ওদের উঠতে হবে, বলল, 'চল, নয়নমণি। মেমসায়েব ডাকছেন।'

দুজনে টিলার নিচে গেল, তারপর বড় সায়েবের বাংলো বাড়ির টিলায় উঠল। তারপর নাসিরুদ্দীন ওদের আর ঠাহর করতে পারল না।

নাসিরুদ্দীনের মনে হল, বড় সায়েব গিয়াসুদ্দীনকে কি যেন বলছেন। দুজনেরই মুখে হাসি। নিশ্চয় কিছু একটা মীমাংসা হয়ে গেছে, তা না হলে হাসবে কেন? অশ্বারোহীরা সরে গেছে অফিসের সামনে থেকে।

হঠাৎ বেজে উঠল রিফাইনারীর সাইরেন। নাসিরুদ্দীন খুশি হয়ে ভাবল, নাটকের একটি দৃশ্য এবার সমাপ্ত হল। এর পর কী ঘটবে কে জানে?

ষোল

জেবউন্নিসা জাহানারাদের বাসায় ইসমাইলের জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। গিয়াসুদ্দীনের ওখানে ইসমাইলেরা সবাই এসে জুটেছিল। বড় সায়েবের মিষ্টি কথায় ওরা সবাই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেছে। টাওলারকে বড় সায়েব একটা কথাও বলতে দেন নি। কেবল গুরুগম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, 'সেই পঞ্চাশজন লোককে

অন্য কাজে নিযুক্ত করে দিন।' সকলের মুখে আনন্দের ভাব। কিছু সময় গিয়াসুদ্দীনের বারান্দায় আড্ডা দিয়ে অন্য সব লোকেরা চলে গেল। ওদের চলে যাবার পর জাহানারা বেরিয়ে এসে ইসমাইলকে বলল, 'ইসমাইল, জেবউন্নিসা এসেছে।'

ইসমাইল বলল, 'হ্যাঁ, টের পেয়েছি। নাসিরুদ্দীন খবর দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করো। এখানেই খেয়ে দেয়ে ফ্যাক্টরীতে যেতে পারবে।'

জাহানারার কথা শুনে চণ্ডী একবার ইসমাইলের দিকে তাকাল। তারপর ওকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ইসমাইল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'কি কথা?' ইসমাইলের স্বর গম্ভীর।

চণ্ডী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইসমাইলের দিকে তাকাল, বলল, 'শুনেছি সম্প্রতি পান্নুর সঙ্গে তোমার মেলামেশা খুব বেড়েছে। কিন্তু দেখো, পান্নুকে তুমি নিজের বোন বলে মনে কোরো। তা না হলে অঘটন ঘটতে পারে।'

ইসমাইলের মুখখানা কালো হয়ে গেল, সে হেঁট মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। পান্নুকে বোন বলে ভাবা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি, হবেও না। ও তো ভগ্নী নয়—প্রেমিকা।

চণ্ডী এবার রুক্ষ স্বরে বলল, 'বুঝেছি। কিন্তু পান্নুকে আমি বলে দিয়েছি আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়েকে বিধর্মীর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারব না।'

ইসমাইল এবার চটে গেল, বলল, 'না জেনে শুনে এইসব কী তুমি বলতে লেগেছো চণ্ডীদাদা। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার একটু যে ভাব না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু বিয়ে হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

এই বলে সে ফিরে গিয়ে বৈঠকখানায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। চণ্ডী ফিরে গেল। গিয়াসুদ্দীন ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'এই পান্নুর কথা।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'চণ্ডী বুঝি বারণ করছে?'

'হ্যাঁ। কেবল চণ্ডী নয়। একটা বিষয়ে বাবা মেয়ে একমত—আমায় নাকি হিন্দু হতে হবে। তাতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।'

গিয়াসুদ্দীন হাসতে হাসতে বললেন, 'ধর্ম আর সংস্কার হল জামাকাপড়। প্রেমই হল আসল শরীর বস্তু। এক ধরণের জামাকাপড় পরিহার করে অন্য ধরণের জামাকাপড় ধারণ করলেই হল। সাহস নেই?'

'সে রকম করা আমার পক্ষে শক্ত।'

'কেন?'

'না, পারব না।'

'বুঝেছি।'

গিয়াসুদ্দীন একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর স্নান করতে চলে গেলেন। জাহানারা ইসমাইলের কথা ভিতর থেকে আড়ি পেতে সব শুনছিল। সব কথা জেবউন্নিসাকে গিয়ে বলার পর, তার মনের সন্দেহ ঘুচল। জাহানারা তাকে ঠেলেঠুলে বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, 'চলে যা, কথা কয়ে দেখ।'

জেবউন্নিসা এল বসবার ঘরে। আগের চেয়েও যেন সুন্দরী হয়েছে দেখতে। রূপের জৌলুস দেখে ইসমাইল চোখ তুলে যেন তাকাতে পারল না ওরা দিকে। পান্নুর এই আকর্ষণী শক্তি নেই। সে যেন মনের অন্দর মহলে ঢোকে চোরের মতো, একেবারে অন্তরে প্রবেশ করে। আর লছমীর মধ্যে আছে হৃদয়ের ভার লঘু করে দেবার মতো পরিহাস-রসিক চঞ্চল স্বভাব। তার কাছে গেলে সংসারের বোঝা যেন হালকা হয়ে যায়। কিন্তু জেবউন্নিসাকে দেখলে ওর চোখ ঝলসে যায়, মুখে কথা সরে না—এমনি তার রূপের জমক। অনেকটা সময় সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না।

জেবউন্নিসা জিগ্যেস করল, 'আমার চিঠি পেয়েছো?'

'হ্যাঁ'

'কোনো উত্তর আছে কি?'

'মনস্থির করতে পারিনি।'

'কবে মনস্থির করতে পারবে?'

প্রশ্নবাণে ইসমাইলের মনটা যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। জেবউন্নিসার মূর্তি যেন বাঘিনীর মূর্তি। প্রশ্নের ধরণে ফুটে উঠছে একটা তীব্র অভিযোগ। অধিকার থাকলেই মানুষ অভিযোগ করতে পারে—জেবউন্নিসার কি সে অধিকার আছে, ইসমাইলকে আপন করে নেবার অধিকার? ইসমাইল বলতে চাইছিল, 'পারব না, তোমায় আমি গ্রহণ করতে পারব না জেবউন্নিসা। বিবেকে বাধে—তুমি কলঙ্কিনী।' কিন্তু জেবউন্নিসার মুখ দেখে সে একটি কথাও বলতে পারল না। এই রূপের পসরায় তার কোনো প্রয়োজন নেই—কী করে সে বলবে এমন কথা। আহা, ভারি সুন্দর। এক গুচ্ছ গোলাপ ফুলের মতো। হাতে নিতে ইচ্ছে করে। ইসমাইল বলল, 'ভেবে দেখি।'

জেবউন্নিসা বলল, 'না, আজই আমার উত্তর চাই। তুমি মনস্থির না করলে কী করে কী হবে? তিনজনকে তো আর বিয়ে করবে না—একজনকেই তো করবে।'

'এত তাড়া কিসের?'

জেবউন্নিসা তিক্ত স্বরে বলল, 'বুকখানা চিরে যদি দেখাতে পারতাম, দেখাতাম কীসের তাড়া। বুকটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছ তুমি...' তারপর কথাটা সহজ করে দেবার জন্য একটু হাসল। বিয়ে না হলেও সপত্নী যন্ত্রণায় মেয়েরা যে ভুগতে পারে—এই প্রথম সে কথাটা ও যেন বুঝতে পারল। ইসমাইলকে না পেলে ওর চলবে না।

পান্নু এই ধরণের কথা বলে না কখনো। তার মনে সর্বদা কেমন একটা উদাস উদাস ভাব। ওকে কাছে পেলে ইসমাইলের মনেও একটা অভিনব বিষাদের উৎপত্তি হয়। আর লছমীকে পেলে মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেই প্রজাপতির পিছু পিছু দৌড়ানোর কথা। লছমী এসব কথা মুখেও উচ্চারণ করতে পারে না। একদিনও বিয়ের কথা পাড়েনি। হাতের কাছের মুহূর্তটাকে উপভোগ করেই ওর

আনন্দ। ইসমাইল বা আর কাউকে ধরে রাখতে গেলে যে চেষ্টাযত্ন করতে হয়, সে ওর মধ্যে নেই। সিং-জী, রামু, ইসমাইল—সকলের সঙ্গে সমানে হাসি ঠাট্টা করতে পারে। ওর মনটা ভারি পরিষ্কার, রূপসী হলেও ওর স্বভাবটা সরলা বালিকার মতো। কিন্তু জেবউন্নিসা ওকে ধরে রাখতে চায়, ওর চোখ দুটো যেন বাঘিনীর চোখ।

ইসমাইল বলল, 'কিছুদিন অপেক্ষাই করো না।'

'না। আর এক দিনও অপেক্ষা করা চলেনা।'

ইসমাইল এবার খুবই বিরক্তি বোধ করল, বলল, 'জাহানারা বৌদি কি কিছু তোমায় বলেন নি?'

'সব কথাই বলেছেন।'

'তাহলে তাই।'

'তার মানে?'

'মনস্থির করতে পারিনি এখনো।'

'হিন্দু হওয়া-না-হওয়া নিয়ে?'

'না।'

জেবউন্নিসা এবার হেসে ফেলল—'এখনো তুমি ছেলেমানুষ রয়ে গেছো। আচ্ছা, ওসব তো তোমার নিজের কথা। আমার কথাটার জবাব আজই আমার পাওয়া দরকার। আমি জানি আমি যেমন তোমায় চাই তুমি তেমন করে আমায় চাও না, কিন্তু একেবারেই চাও না বলে তো এখনো কিছু বলোনি। সুতরাং স্পষ্ট একটা জবাব দিতে হবে তোমায়। তুমি তো জানো, আমি অনাথিনী। আমার বাপ-মা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। মিথ্যা আশার জালে বন্দী হয়ে থাকার মতো আমার ধৈর্য নেই। তুমি যদি আমায় না চাও, আমায় অন্য কোনো একটা পথ নিতে হবে...'

'অন্য কোনো পথ, না অন্য কোনো পুরুষ?' শ্লেষের সুরে ইসমাইল শুধোল।

'পুরুষ! পুরুষ কই? এ পর্যন্ত তো পুরুষের মতো একটি পুরুষেরও দেখা পাইনি। ভবিষ্যতে পাব কিনা কে বলতে পারে?'

ইসমাইল বলল, 'অপেক্ষা করতে নাই যদি পারো, নাই করলে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলার কোনো সংগত কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

এই কথাটায় জেবউন্নিসা প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, যেচে কোনো পুরুষের কাছে আসাটা ঠিক নয়—এবার সেটা বুঝলাম। আর কখনো তোমার দ্বারস্থ হব না—আমি ভিখারিণী নই। তোমার যদি প্রয়োজন হয় আমার কাছে এসো, আমি পথ চেয়ে থাকব।'

হঠাৎ যেন জেবউন্নিসার মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে চলে গেল অন্দর-মহলে। ইসমাইলের বুকে প্রবল আঘাত লাগল। এ যেন অন্য কোন জেবউন্নিসা—এ স্বপ্নে দেখে এমন এক প্রেমিককে যে নাকি পৌরুষের শক্তিতে দৃপ্ত।



সন্ধ্যাবেলা ইসমাইল যখন নিজের বাসায় ফিরে এল, ওর মনে মনে আশা ছিল অন্য দিনের মতো আজও হয়তো পান্নুর দেখা পাবে ওদের বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে। দেখা কিন্তু পেল না। পরিবর্তে শুনতে পেল পাশের বাড়িতে চণ্ডীর গলা। বুঝল, পান্নু আজ কেন বেরোতে পারেনি। আজ সারাদিন চণ্ডী ঘর থেকে বেরোয়নি, মেয়ের সঙ্গে বাড়িতেই আছে।

ইসমাইল এক কাপ চা ঢেলে খেল, তারপর পাড়ার জলের কলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এ সময়ে প্রতিদিন পান্নু জল নিতে আসে। খানিকক্ষণ বাদে দেখল পান্নুর বদলে স্বয়ং চণ্ডী আসছে জল নেবার জন্য। বালতিতে জল ভরে চণ্ডী একবার মুখ তুলে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইসমাইল, এদিকে এসো।'

ইসমাইল চণ্ডীর কাছে এল। চণ্ডী জিগ্যেস করল, 'আমার মুখটাতে কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ?'

সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না। তবে মনে হল, চণ্ডীর মুখখানা যেন খুব শুকনো মতো। ইসমাইল জিগ্যেস করল, 'আজ কিছু খাওনি বুঝি ?'

'না, ভাবছি অনশনেই মরব।'

ইসমাইলের বুকে কথাটা যেন শেলের মতো বিঁধল। চণ্ডী বলল, 'তোমরা ছেলেমানুষ, কী করে বুঝবে সংসার কি জিনিস, বাপ হওয়া কত দুঃখের।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চণ্ডী বলে চলল, 'একে তো দুর্গা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, এবার মেয়ে আমার বুক ফাটাবে। আর বেঁচে কী লাভ ? মৃত্যু আসুক, এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। তোমরা কিছু বুঝতে পারো না। মেয়েটার জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। কে যে তাকে নিয়ে কি করেছে জানি না ইসমাইল, মেয়ে বলছে বিয়ে সে করবে না। তুমিই কিছু করেছো হয়তো।'

ইসমাইলের খুব খারাপ লাগল। পান্নুর কথাবার্তা ও আর আজকাল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চণ্ডীর কথা শুনে ইসমাইল সেখানে আর থাকতে পারল না। চণ্ডী এখন সাব্যস্ত করতে চায় যে ইসমাইলই পান্নুর ব্যাপারে অপরাধী। কিন্তু পান্নু যে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে, ইসমাইল জানে তার জন্য ও দায়ী নয়। এর পিছনে অন্য কোনো রহস্য আছে। ইসমাইল রাস্তা ধরে চলতে লাগল। সেদিন দশ দিক অন্ধকার—সামনে পিছনে সর্বত্র অন্ধকার। ওর মনে হল নিশ্বাস নিতে হলে ওকে কোথাও খোলা মেলা জায়গায় যেতে হবে। সেই ভেবে নিজের অজ্ঞাতসারেই ও গিয়ে দাঁড়াল পাশের বস্তিতে—বোধনের ঘরের সামনে। দরজার কাছে গিয়ে ও ডাকল 'লছমী, লছমী !'

কেউ উত্তর দিল না।

ইসমাইল ফিরে যাবে ভাবছিল। এমন সময় কোথা থেকে যেন রামু এল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। এসেই বলল, 'কে, ইসমাইল ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন আসো তোমরা এখানে ? লজ্জা লাগে না ভিন জাত মেয়ের মন ভাঙতে ? ধর্মের ভয় নেই বুঝি ? জানো, হাসপাতালে ঢোকবার পর থেকে সেই পিশাচটা ওর পিছনে লেগেছে। কী যে বলব—তোমাদের একটুও বিবেচনা নেই।'

'কোন পিশাচ ?'

'সেই সিং-জী।'

ইসমাইলও খুব ক্ষুণ্ণ হল। রামুর কথার কোনো জবাব দিল না। কিন্তু ওর মনটা আগের চেয়েও বিষণ্ণ হল। রামুকে ওখানে রেখে ইসমাইল আবার চলে এল বড় রাস্তায়। এইবার সোজা পা চালাল মদের দোকানের দিকে। সিং-জীর দোকানে ভালো হুইস্কি পাওয়া যায়। আজ ও তাই খাবে। তাতে যদি মন একটু শান্ত হয়। একই দিনে তিন-তিনটা আঘাত তার পক্ষে সহ্য করা শক্ত। লছমীর বিবেক নেই, পান্নুর সাহস নেই, জেবউন্নিসার দয়া মায়া নেই, আর সে নিজে মনস্থির করে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। চণ্ডী আর পান্নু দুজনেই ওকে এমন ভাবে বাধা দিচ্ছে যে পান্নুকে সহজে আগের মতো করে কাছে পাওয়া শক্ত হবে। আর জেবউন্নিসাকে ও তো চায়ই না। তাই এসেছিল লছমীর কাছে, কিন্তু লছমীর দেখা তো পেলই না, উপরন্তু শুনতে হল কতকগুলো কুৎসিৎ কদর্য কথা। মনের যন্ত্রণা উপশম করার জন্য ইসমাইল এক বোতল হুইস্কি কিনে নিল। হ্যাঁ, এবার সে নিজের বাসায় ফিরতে পারে।

সতের

শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। টাওলার সায়েবের 'অর্ডার' বড় সায়েব দিলেন রদ করে। এর চেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর কি আর হতে পারে ? ছাঁটাই হয়ে যাওয়া সেই পঞ্চাশজন শ্রমিক পুনর্নিযুক্ত হল। তার চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর দিয়ে গেল জনার্দন গোস্বামী। সায়েবের চেয়েও বড় সায়েব ভারত কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু এই শহরে আসছেন। গোস্বামী কেবল শ্রমিক ও বাবুদের সঙ্গে দেখা করে চলে গেছেন যে এমন নয়, বড় সায়েবের সঙ্গেও দেখা করেছেন। একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। সেই খবরের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি খবর প্রচারিত হয়ে সকলের মনে অধিকতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এই খবরটি হল, দুর্গা-নয়নমণির রেজিস্টার্ড বিবাহ, স্বয়ং মেমসায়েব সেই বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন, আর সাক্ষী ছিলেন গিয়াসুদ্দীন সায়েব।

প্রধানের মাথা হেঁট হয়ে গেল। বড় সায়েবের মেম যদি নয়নমণির দিকে থাকেন, তা হলে তার ফোঁস ফোঁসানির কি কোনো মূল্য আছে ? কিন্তু নিজের বাড়ির

লোকদের সাবধান করে তিনি বলে দিল, নয়নমণিকে যেন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ঢুকলেই কুকরী দিয়ে কেটে দু'টুকরো করে দেবেন।

দুর্গা আর নয়নমণি যথারীতি সংসার শুরু করল। বিয়ের পর বন্ধুবান্ধব আর প্রতিবেশীদের প্রীতিভোজনে আপ্যায়নও করল। প্রীতিভোজে বরুয়ার স্ত্রী এলেন, কিন্তু বরুয়া এলেন না, প্রধান কি মনে করবেন এই ভয়ে। পান্নু এল কিন্তু চণ্ডী সময় করে উঠতে পারল না। লছমী এল, কিন্তু বোধন কি যেন একটা অজুহাতে এল না। মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা এই রেজিস্টার্ড বিয়েটাকে সত্যিকার রীতিমাফিক বিয়ে বলে মেনে নিতে পারলেন না। গিয়াসুদ্দীন, জাহানারা, ইসমাইল ও নাসিরুদ্দীন অবশ্য যোগদান করেছিল। আরেকজন অপ্রত্যাশিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন, বড় সায়েবের মেম।

গিয়াসুদ্দীন সেখানেই নয়নমণিকে বলে রেখেছিলেন, 'দেখ নয়নমণি, এখন আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। জওহরলাল নেহরু আসছেন। তোমায় গান গাইতে হবে—সমবেত সংগীত। আর মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের মধ্যে তোমাদের সবাইকে—মানে তুমি, পান্নু, লছমী, বরুয়ার স্ত্রী, জাহানারা—সবাইকেই নানারকম কাজ করতে হবে।

কিন্তু নয়নমণি বলল, 'বরুয়ার স্ত্রী এঁরা কি করে কাজ করবেন—ওঁর তো ছেলে-পুলে হবে।'

'না যদি পারেন—পারবেন না। বাকী সবাইকে করতে হবে। টাকা তুলতে হবে, সময় খুব বেশি নেই। দিনের বেলা মেয়েরা সবাই নিজ নিজ বাড়িতেই থাকে। তখন তোরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায় করতে পারবি।'

নয়নমণি যেন হাতে স্বর্গ পেল। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বাপের ভয়ে তাকে যেন পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছিল। বিয়ের পর হঠাৎ সে হয়ে গেল শহরের গৃহিনীদের একজন। লোকজন আসছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, গল্পগুজব করছে ওদের বাড়ি এসে। এরই মধ্যে এসে গেল এই অভিনব প্রস্তাব। নয়ন বলল গিয়াসুদ্দীনকে, 'কাকাবাবু, সেই 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' গানটা গাইলেই সব চেয়ে ভালো হবে—না?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ঠিক বলেছিস।'

□

ইসমাইল কোনো কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে পান চিবোচ্ছিল। দুর্গার সঙ্গে তার কোনো কথাই হল না বললেই ঠিক হয়। পান্নু দুয়েকবার ওর নাম ধরে ডেকেছিল, কিন্তু সে যৎসামান্য কথা। পান্নুকে দেখে মনে হল আরো যেন বিষণ্ণ। ইসমাইল পান্নুর সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল।

অবশেষে একবার পান্নুকে একা পেয়ে জিগ্যেস করল, 'পান্নু, তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। আমায় ত্যাগ করলে নাকি?'

পান্না ম্লান হেসে বলল, 'তোমায় তো সব কথা আমি বলেই রেখেছি। যেদিন আমার কথা মতো কাজ করতে পারবে বলে মনে হয়, সেদিন এসো।'

ইসমাইল বলল, 'নয়নমণিদের মতো হলে কেমন হয়?'

'না। তা হতে পারে না। স্বর্গথেকে মা অভিশাপ দেবেন। ধর্মত্যাগ করা অসম্ভব।'

'বাঃ।'

'তুমি যাই করো না কেন, ধর্ম আমি ছাড়তে পারি না।'

ইসমাইল চুপ করে রইল। নয়নমণিদের রেজিস্টার্ড বিবাহ ওর মনে যে সামান্য আশার আলো জ্বালিয়েছিল সেটা নিমেষে নিভে গেল। তৎসত্ত্বেও সে বলল, 'তুমি আজকাল এত দূরে দূরে থাকো কেন? শুনলাম আজকাল নাকি জাহানারা বৌদির ওখানে লেখাপড়া করতেও যাও না।'

পান্না উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কখনো কি খবর নিয়েছিলে কী ঘটেছিল? বাবা আত্মহত্যা করে মরবেন ঠিক করেছিলেন। কয়েকটা দিন আমি কোথাও বেরোইনি। তারপর বাবাকে বললাম যে তিনি যদ্দিন বেঁচে থাকবেন আমি কিছু করব না। তারপর বাবা উপোস ভাঙলেন। না, বাবাকে আমি কথা দিয়েছি, আমার সে-প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারব না।'

কবে চণ্ডী মরবে আর কবে পান্না বিয়ে করবে! এ তো সবই আকাশকুসুম। সে কাতর হয়ে শুধোল, 'কেন এমন প্রতিজ্ঞা করলে, পাগলের মতো?'

ম্লান হেসে পান্না বলল, 'আমি লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছি। জাহানারা দিদির কাছে খুব কমই যাই, কিন্তু বাড়িতে পড়ছি। আমি এখন চিঠি লিখতে পারি।'

'ভালো কথা। কিন্তু তোমার পরীক্ষায় আমার পাশ করা সহজ হবে না।'

'পাশ করতে না পারলে ফেল করা ভালো।' একটু হেসে পান্না এই উত্তর দিয়ে চলে গেল।

'পাশ করতে না পারলে ফেল করা ভালো!' এ কি শ্লেষ না পরিহাস?

□

ইসমাইলের উপর ভার পড়েছিল নেহরুর আসার বিষয়ে কতকগুলি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বের করার। প্রচারপত্রের কপি সিং-জীর ছাপাখানায় দিয়ে যখন সে ফিরে আসছে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল লছমীর সঙ্গে।

ইসমাইল আত্মসংযম হারিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'লছমী, একটু দাঁড়াও।'

লছমী দাঁড়াল। হাতে একটা খিলি পান। খিলিপানটা ইসমাইলের হাতে গুঁজে দিয়ে হেসে হেসে বলল, 'তুমি নাকি কয়েকদিন এসেছিলে আমার খোঁজে?'

'কে দিল খবরটা?'

'কে আবার? রামু। ওর ঈর্ষার কি অন্ত আছে? আমি কোনো পুরুষ

মানুষের সঙ্গে গেলেই কৈফিয়ৎ তলব করে। তবু তো এখনো বিয়ে হয়নি। হলে পর পুলিশের টিকটিকির মতো সর্বদা পিছনে লেগে থাকবে।

ইসমাইল বলল, 'মোটরে চড়ে ঘোরাঘুরি—আমারো দেখে ভালো লাগেনি...'

লছমী হাসতে লাগল, 'কেন গাডিতে বেডাতে বেরোলে কি হয়? তুমি কি মনে করো সিং-জী আমায় সিংহের মতো জ্যান্ত গিলে ফেলবে? তুমিও তো যখন তখন আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করো, কখনো কি তোমায় আশ্‌কারা দিয়েছি? লাঠির ডগায় বেঁধে বাঁদরকে যদি নাচানো যায়—না নাচাবো কেন?' লছমীর হাসি ক্রমেই যেন বাডতে লাগল।

'তোমার বিবেকবুদ্ধি বলে কিছু নেই।' ইসমাইল বলল।

'কার আছে এই শহরটাতে—বলো তো? তোমার আছে?'

প্রশ্নটা সুঁচের মতো বিঁধল ইসমাইলের মনে। সে শক্ত করে লছমীর হাতটা ধরে বলল, 'আর বলবে কখনো?'

লছমী খিল খিল করে হাসতে লাগল, 'বলব নিশ্চয় বলব, হাজার বার বলব। ইসমাইলের দিল নেই, ইসমাইলের প্রেম গভীর নয়, ইসমাইল বুঝতে পারে না কাকে সে চায়। নিতান্তই ছেলেমানুষ। হলো?'

ইসমাইল লছমীর হাতখানা ছেড়ে দিল। ওর সারা শরীর ঘামে নেয়ে উঠল। লছমীও ওর দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। তাকে হয় কাউকে বেছে নিতে হবে, নয় তো সবাইকে হারাতে হবে। একজন একজন করে সকলেই তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কেউ ধরা দিতে চাইছে না।

লছমী হেসে বলল, 'চলো, সিং-জীর চায়ের দোকানে যাই। চা খাব।'

ইসমাইল পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ফেলল। লছমী বলল, 'তুমি একটা মস্ত ভীরু। দিল নেই। আমার সঙ্গে বেরোতে ভয় লাগে—না? আমি তো খারাপ মেয়ে—না? আর আমার সঙ্গে একা একা ঘরে ঠাট্টা ইয়ারকি মারতে খুব ভালো লাগে—কেমন কিনা? ছি ছি এই সব ছাড়ো। যাকে বিয়ে করতে চাও—বিয়ে করো। মনস্থির করো। তিনজনের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ানো কি ভালো?'

ইসমাইল অবাক হয়ে গেল। এই মেয়েটি কি করে ওর মনের গোপন কথাগুলো টের পেয়েছে? নিজেকে সামলে নিয়ে লছমীকে বলল, 'চলো যাই চায়ের দোকানে।'

□

সেদিন অনেক রাত অবধি দু'জনে ঘুরে বেড়াল। পরদিন ছিল রবিবার, কাজেই ইসমাইলের কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু লছমীর সাহস দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। এতটা নির্ভয়ে কী করে সে এত রাত অবধি তার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে পারল? অথচ দিনের বেলা দু'জনের মধ্যে যতটা ব্যবধান ছিল, রাতেও তার

একচুলও কমল না। ইসমাইলের মনে হল লছমী অপরাজিতা, কোনো পুরুষই ওকে সহজে পরাভূত করতে পারবে না।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা গেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। লছমী বলল, 'চলো, একটা বেঞ্চে বসি গিয়ে। মনের কথা খোলসা করে বলতে পারবে তাহলে।'

বেঞ্চে বসল দু'জন। লছমী খিলি পানটা ইসমাইলের মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, 'পান্নুকে বলেছি তোমার কথা।'

ইসমাইল বলল, 'কি বলেছো তাকে?'

'তোমার ইচ্ছা নেই বলেছি।'

'কেমন করে জানলে ইচ্ছা নেই?'

'প্রেম জিনিসটা কেমন জানো? নয়নমণি বুঝেছে প্রেম কি। তোমার তো ভয় আছে মনে। হিন্দু হতে এত ভয় কিসের?'

ইসমাইল কিছু জবাব দিল না।

লছমী আবার বলল, 'হবার হলে হয়। পান্নুর মনেও ভয়—তা না হলে শর্ত দিল কেন? এসব প্রেমের নামে ফাঁকি। জেবউন্নিসার বরং সাহস আছে, কিন্তু তোমার আবার তার প্রতি ঘৃণা আছে—বেশ্যা বলে। আমাকে গ্রহণ করতেও তো তোমার খুব ভয়—কেমন কিনা?'

লছমী হাসতে শুরু করল। ইসমাইলের সংকোচ হঠাৎ যেন ঘুচে গেল। সে লছমীর বাঁ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যি সত্যি একা আমাকেই ভালোবাসতে পারবে? মানে তুমি আর কারো হবে না—কেবল আমারি হবে? পারবে হতে—বলো!'

'তোমার সাহস আছে আমাকে বিয়ে করার মতো?' লছমীর মুখে হাসি।

ইসমাইল বিব্রত বোধ করল এই প্রশ্নে—তার অন্তরে তুমুল আলোড়ন চলল কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে সে শান্ত হল; বুঝল এই মেয়েটি তার মনের সমস্ত গোপন কথা একটু একটু করে বের করতে চাইছে। এবার তাকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে, ইসমাইল বলল, 'আছে। আছে। তোমায় আমি ভালোবাসতে পারব।'

লছমী ইসমাইলের হাতটার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মুখের কথায় কোনো আশ্বাস দিল না। ইসমাইল বুঝতে পারল একপ্রকার নিজের অজ্ঞাতসারেই সে এই দুঃসাহসী রঙ্গিনী মেয়েটির হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। প্রথম প্রথম মনে একটা অসম্ভব বেদনা অনুভব করেছিল, তারপর ধীরে ধীরে ওর মনটা ভরে গেল একটা মুক্তির স্বাদে। সে বিহ্বল হয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি, তুমি কি আমার হবে লছমী?'

লছমীর হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

আঠার

একমাস বাদে আর একটি চাঞ্চল্যকর খবরে সারা শহর তোলপাড় হয়ে গেল—ইসমাইলের সঙ্গে লছমীর রেজিস্টার্ড বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে প্রীতিভোজনে সকলেই উপস্থিত ছিলেন—কেবল পান্নু, নাসিরুদ্দীন, প্রধান, বোধন, ও বরুয়ার স্ত্রী বাদ দিয়ে। প্রসবের বেদনা ওঠায় বরুয়ার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। জাহানারাও কী-একটা অসুখ হওয়ায় বাড়িতে শয্যাগত ছিল, তার জায়গায় এসেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। বোধন একেবারে মর্মাহত, আর রামু তো পাগল প্রায়। জেবউন্নিসার কথা মনে করে বুড়ো নাসিরুদ্দীন মনের দুঃখেই এলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে কালবিলম্ব না করেই এ-ভাবে লছমীর হাতে ধরা দেওয়াটা ইসমাইলের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হয়েছে। প্রধানের না আসাটা খুব যে ভালো কাজ হয়েছিল—কেউ বলবে না।

পান্নু আসতে পারল না কিছুতেই। তার মনে হয়েছিল বিয়ে করে ইসমাইল খুব ভালোই করেছে। এখন তা নিয়ে রাগ বা দুঃখ করার কোনো অর্থ হয় না। চণ্ডী ও দুর্গা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন। চণ্ডী তো প্রীতিভোজনে হাজির হয়ে দু-হাত তুলে ইসমাইলকে আশীর্বাদ করল।

বরুয়া এসেছিলেন অল্পক্ষণের জন্য। ডিগবয়ে এভাবে একের পর এক রেজিস্টার্ড বিয়ে হওয়াটা ওর খুব মনঃপূত হয়নি। কে জানে কখন কী হয়। মেমসায়েবদের দেখাদেখি আমাদের মেয়েরাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে, তাহলে তো মুশকিল।

ইসমাইল নিজে গিয়ে জেবউন্নিসা ও পান্নুকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। দু'জনের কেউ নিমন্ত্রণরক্ষা করল না। বিয়ের পর সেজন্য ওর একটু খারাপ লেগেছিল এবং অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করতে গিয়েও কেমন যেন মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়ছিল। কিন্তু লছমী তার স্বভাবসিদ্ধ প্রগলভতায় সকলের সঙ্গেই রঙ্গ রসিকতা করছিল। হেসে হেসে সবার সঙ্গে আলাপ করছিল—এমন কি সিং-জীর সঙ্গেও।

সিং জী প্রচুর উপহার এনেছিলেন এবং তদুপরি এনেছিলেন শুভ ইচ্ছা। কিন্তু ইসমাইল তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারেনি। লছমী হেসে হেসে আলাপ করেছিল, নিজে সিং-জীকে বসিয়ে খাইয়েছিল।

চ্যাটার্জি এসেছিলেন, কিন্তু সভার এককোণে বসে আপনমনে একটা প্রচারপত্র পড়ছিলেন। বিয়ের ব্যাপারটা তাঁকে যেন স্পর্শই করেনি। য়ুনিয়ন গড়ে তোলার কাজটা ভালোভাবে এগোচ্ছে না বলে মনে তাঁর খুবই অসন্তোষ। সায়েবরা তলায় তলায় য়ুনিয়ন গড়ার কাজে বাধা দেবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে। সেই পঞ্চাশ জন ছাঁটাই কর্মীকে পুনর্নিয়োগ করার পর থেকে সকলেই বড় সায়েবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখন সবাই বিয়ের ভোজ খেতে ব্যস্ত। কিছুদিন পরেই আসবেন জওহরলাল নেহরু। নেতারা সবাই এখন চাঁদা তোলা, সভার আয়োজন ও গানবাজনার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত। য়ুনিয়নের কথা এখন কারো মনেও নেই।

প্রচারপত্রে মজুরদের সাবধান করে বলা হয়েছে য়ুনিয়ন গঠনের কথা তারা যেন না ভোলে। কাগজটা জনার্দন গোস্বামীর হাত দিয়ে এসেছিল বরুয়ার কাছে। কোম্পানীর নীতির বিরুদ্ধে মজুরদের সতর্ক করে দেওয়াটাই প্রচারপত্রের লক্ষ্য। পঞ্চাশজন মজুর ছাঁটাই করাটা তো সবে কলির শুরু, আরো অনেক মজুর ছাঁটাই হবার সম্ভাবনা আছে। কোম্পানী নূতন নূতন মেশিন বসিয়ে মজুরের সংখ্যা কমাতে চায়। এ শহরের রিফাইনারী পৃথিবীর প্রাচীন রিফাইনারীগুলির অন্যতম। কিন্তু তাহলে কি হয়? আমেরিকায় রিফাইনারীর নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। এইসব কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তাছাড়া খনিতে যে-পরিমাণ তেল আছে সে পরিমাণ তেল নিষ্কাশন করাটাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশি করে তেল নিষ্কাশনের জন্য নূতন ড্রিলিং মেশিন বেরিয়েছে—স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও উদ্‌ভাবিত হয়েছে। এই রকম অবস্থায় কোম্পানী বসে থাকবে না, আরো মজুর ছাঁটাই করবে। য়ুনিয়ন গঠন না করলে এই ছাঁটাই বন্ধ করা যাবে না।

চ্যাটার্জি প্রচারপত্রটি বরুয়াকে পড়তে দিলেন। বরুয়া পড়ে বললেন, 'একেবারে খাঁটি সত্যি কথা।'

'কিন্তু বরুয়া, শুনেছি সায়েবরা নাকি মজুরদের জন্যে ঘরবাড়ি তৈরি করারও প্ল্যান হাতে নিয়েছে? বেছে বেছে মানুষ দেখে প্রমোশন দেবারও না কি ব্যবস্থা হয়েছে? এ সবের ফলে অসন্তোষ যদি কমে যায়, য়ুনিয়ন কে তৈরি করতে যাবে?'

বরুয়া প্রচারপত্রটা চ্যাটার্জিকে ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'সুখসুবিধার ভালো ব্যবস্থা যদি সায়েবরা করে, তাহলে য়ুনিয়ন করার আর দরকারটা কি?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'য়ুনিয়ন করতে হবে রাজনীতিক কারণে। একদিন সায়েবরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তখন শ্রমিকদেরই চালাতে হবে কোম্পানীর কাজ।'

বরুয়া কৌটো থেকে একটা পান মুখে দিয়ে হেসে হেসে বললেন, 'কর্মীরা কারখানা চালাবে, আমাদের সুখের দিন ফিরে আসবে—এসব ঘটতে এখনো অনেক দিন। গাছে কাঁঠাল ঝুলছে দেখে গোঁপে তেল মেখে এখন কি হবে?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'না না, তা নয়। শোনেননি রুশ দেশে কি হয়েছে? সেখানে স্থাপিত হয়েছে প্রোলেতারিয় রাষ্ট্র। চেষ্টা করলে আমাদের দেশেও হতে পারে। কেন হবে না? ওদের মতো আমরাও তো রক্তমাংসের মানুষ।'

বরুয়ার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, 'আমার শ্বশুরমশাইও ওই কথা বলেন। জনার্দন গোস্বামীরও একই মত। কিন্তু কেবল এখানে য়ুনিয়ন হলে কি হবে? চা-বাগানে কোথায় য়ুনিয়ন? রেলওয়েতে?'

'সেই তো বলছি। অনেক অসুবিধা।' চ্যাটার্জি বললেন, 'কিন্তু......'

চ্যাটার্জি কথাটা গুছিয়ে বলতে পারেন না। উনি কেবল স্বপ্ন দেখেন—শোষণের অবসানের স্বপ্ন।

এমন সময় অন্য একটা জগৎ থেকে চ্যাটার্জিদের সামনে গিয়ে হাজির হল সিং-জী। এসেই বলল, 'বরুয়া, আপনার বাড়ি হল। এবার ছেলে হবে। ওদিকে সেদিনকার সেই আলোচনার পর থেকে সায়েবদের সুনজরে পড়েছেন আপনি। চারিদিকে আপনার জয় জয়কার। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

চ্যাটার্জি উঠে যেতে চাইছিলেন। ওঁর ধারণা এই সব কথার মধ্যে শয়তানী চক্রান্ত একটা কিছু আছে।

বরুয়া বললেন, 'বসুন চ্যাটার্জি। গিয়াসুদ্দীন সায়েবের ওখানে যেতে হবে। কাজ আছে।' তারপর সিং-জীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সায়েবের প্রশংসাকে আমি উন্নতি বলে মনে করি না। উন্নতি হবে তখন যখন সকল শ্রমিক উন্নত হবে।'

সিং-জী হাসতে হাসতে বলল, 'মানুষের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল বুঝি সমান হয়? কিছু লোক সায়েব হবে, কিছু বাবু হবে, আর কিছু হবে খেটে-খাওয়া মজুর।'

বরুয়া বললেন, 'না না, সকল মানুষই সমান।'

সিং-জী চ্যাটার্জির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'এইসব ভাব কিন্তু বেশ ছড়িয়ে পড়ছে শহরে। শুনেছি প্রচারপত্র কোথা থেকে আসে, সে আপনি জানেন।'

'কে না জানে সে কথা। আপনিও জানেন।' চ্যাটার্জি জবাব দিল।

'কিন্তু সায়েবদের দিকটাও দেখা দরকার—সেদিন বড় সায়েব কিছু কম করেননি।' সিং-জী বলল।

বরুয়া বললেন, 'বড় সায়েবের দিকটা বড় সায়েব দেখুন, আমাদের দিক আমরাই সামলাব। এটাই ট্রেড য়ুনিয়নের রেওয়াজ।'

বরুয়া উঠে পড়লেন।

সিং-জী আবার জিগেস করল, 'কোথায় চললেন আপনারা?'

'নেহেরুজীর অভ্যর্থনার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে।' বরুয়া বললেন, 'কংগ্রেস কমিটি থেকে একখানা চিঠি এসেছে বলে শুনেছি।'

সিং-জী আক্ষেপের সুরে বলল, 'নেহেরুজী আসবেন খুব ভালো কথা। কিন্তু আমায় সেবার সুযোগ দিলেন কই? অনেক টাকা তুলে দিতে পারতাম কিন্তু।'

বরুয়া ও চ্যাটার্জি ইসমাইলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তায় পা দিলেন। চ্যাটার্জি বললেন 'এর আক্ষেপটা কেন বুঝলেন তো! অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করা হয়নি বলে।' চ্যাটার্জি সিং-জীর প্রতি খুবই বিরক্ত।

□

বড় রাস্তা দিয়ে যেতে হলে পথেই পড়ে পান্নুদের বাড়ির সামনের উঠোন। হঠাৎ পান্নুর কথা মনে হল বরুয়ার। 'পান্নু' বলে তিনি একবার ডাকলেন। কিন্তু পান্নুর সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ সদর দরজা খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় আবার ডাকলেন, 'আমি বরুয়া, একবার বাইরে এসো, পান্নু।'

খানিকক্ষণ বাদে পান্নু বেরিয়ে এল। শুকনো মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, চোখ দুটো ফোলা।

'কি ব্যাপার বরুয়াদা, অসময়ে হঠাৎ আমায় মনে পড়ল যে বড় ?'

'অসময়ে নয়, ঠিক সময়েই এসেছি। আমি জানি, তুমি ভুল করতে পারো না। যা ঘটেছে, ভালোর জন্যই ঘটেছে।' ধরা গলায় বরুয়া বললেন।

পান্নু ম্লান হেসে বলল, 'ভালোর জন্যে হয়েছে না মন্দের জন্য, সেকথা বলা কঠিন। আমায় অনেক কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। বৌদি কেমন আছেন ?'

'ভালোই।'

পান্নু এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শুধোল, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ?'

বরুয়া বললেন, 'চ্যাটার্জি।'

পান্নু চুপ করে গেল।

চ্যাটার্জি মানুষটা চুপচাপ থাকেন, কিন্তু মন ওঁর তেমন নীরব নয়। তিনি এগিয়ে এসে একেবারে পান্নুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানো পান্নু, কেন তোমাদের বিয়ে হতে পারল না ? তোমরা দুজনে দুটো আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলে। সমতলে না দাঁড়ালে এ রকম মিলন সম্ভবপর হবে কেমন করে ?'

পান্নু বলল, 'আমিও বুঝেছি সেকথা।'

চ্যাটার্জি বলে চললেন, 'লছমী কেন বিয়ে করতে পারল, বলতে পারো ?'

'কেন ?'

'কোনো সংস্কারকে সে মানে না। সে একেবারে সংস্কারমুক্ত মানুষ।'

পান্নুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চ্যাটার্জির এই অহেতুক সহানুভূতিতে ওর অন্তরটা নরম হয়ে গেল। পান্নু বলল, 'আরেক দিন আসবেন। তখন আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

বরুয়া হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আসবেন বৈকি একদিন। তবে আজ কিন্তু চলে যেতে হচ্ছে। তোমাদের টাকা তোলার কাজটা কেমন এগোচ্ছে ? আর নয়নমণির গান ?'

পান্নু বলল, 'টাকা বেশ কিছু উঠেছে। আর নয়নমণির গানের মহলা চলছে ঠিক মতো।'

দু'জনে এবার চলে গেল।

□

গিয়াসুদ্দীনের বাসায় পৌঁছবার আগেই অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে। বিশেষ আলোচনা করার মতো কিছু ছিল না। নেহেরুজী আসবেন আসছে মাসে। তাঁর কি প্রোগ্রাম হবে তখন সেকথা বিশদ ভাবে জানা যাবে। চাঁদা যথেষ্টই উঠেছে। প্যাণ্ডেল খাড়া করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে কিছু খরচপত্র করতে হবে না। বড় সায়েব স্বয়ং প্যাণ্ডেল করিয়ে দেবেন বলে কথা

দিয়েছেন। স্বয়ং মালা সিং গিয়ে শুনে এসেছেন নয়নমণির গান। খুব নাকি ভালো গাইছে। গার্ড অব অনার দেবার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠিত হয়েছে। তাদের য়ুনিফর্ম এবং জাতীয় পতাকা ইত্যাদির জন্য ডিব্রুগড়ে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কাজকর্ম সুচারুভাবেই অগ্রসর হচ্ছে।

য়ুনিয়নের বিষয় আলোচনা করার সময় পাওয়া গেল না। রোগশয্যায় শুয়ে জাহানারা ক্রমাগত পান্নুর নাম ধরে কাতর হয়ে ডাকছে, 'পান্নু, পান্নু!' বোধ করি পান্নুর জন্যে আজ তার মন খুব কাঁদছে। অতিথিদের বিদায় করে তাই গিয়াসুদ্দীন বেরোচ্ছিলেন পান্নুকে ডেকে আনার জন্য।

বরুয়াদের আদ্যোপান্ত বললে পর, বরুয়া গিয়াসুদ্দীনকে বললেন, 'আমরা পান্নুর সঙ্গে এইমাত্র দেখা করে এসেছি। তাকে ভালই...'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'আসুন তাহলে আমার সঙ্গে। এখন যদি ওকে নিয়ে হাজির না করতে পারি, তাহলে ঘরের মানুষের অশান্তি দূর হবে না। ওদিকে আজ আবার নাইট ডিউটি।'

'রোগিনীকে একা ফেলে কী করে যাবেন আপনি?'

'না যেতে পারলে সর্বনাশ! আরো একটা নূতন খনির জন্য ড্রিলিং শুরু হয়েছে। আমি না থাকলে কে যে কী করে বসে—তার ঠিক নেই। আহমেদ সাহেবকে খবর দিয়েছি—জাহানারার মাসী এসে থাকবেন রাতটা।'

বরুয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলুন তবে। আমায় একবার হাসপাতাল যেতে হচ্ছে। এঁর অসুখটা কি—ডাক্তার বলেছেন কি?'

'কিছু ধরতে পারেন নি এখনো।' গিয়াসুদ্দীনের গলাটা বসা, কথার সুরে গভীর উদ্বেগ। 'আপনি ডাক্তারকে একবার জিগেস করে দেখবেন তো, বরুয়া। আমার ইচ্ছা জাহানারাকে হসপিটালাইজ করা। আমায় ডাক্তার কিছু বললেন না।'

বরুয়ার মুখখানা গম্ভীর।

তিনজনে আবার চলতে লাগলেন বড় রাস্তা দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠল গিয়াসুদ্দীনের টর্চখানা।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'চ্যাটার্জিটা য়ুনিয়ন য়ুনিয়ন করে মরবে। তোমার কি য়ুনিয়ন ছাড়া মনে আর কোনো চিন্তা নেই—বিয়ে-থা, খাওয়া-দাওয়া, প্রেম-ট্রেম...?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'প্রয়োজন অনুভব করিনি এখনো। কেবল একটি উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রাণ ধারণ করে আছি। জানেন তো, এক সময় টেরোরিস্ট ছিলাম। তখন শরীরের রক্ত দিয়ে শপথ বাক্য লিখে দিয়েছিলাম, 'স্বাধীনতা আনবোই।' কত কমরেড মরে গেল, আমি বেঁচে আছি তাদের প্রারব্ধটুকু সম্পূর্ণ করার জন্য। একটা কিছু করতে পারি তো চলে যেতে বাধা নেই।'

অন্য দুজনেই আশ্চর্য চ্যাটার্জির কথা শুনে। সিং-জী ও থানার ও. সি. মিশ্র তাহলে মিছে কথা বলেনি। এই শহরে টেরোরিস্ট না থাক, প্রাক্তন টেরোরিস্ট অন্তত একজন রয়েছে।

বরুয়া বললেন, 'তাহলে এত গোপনে আছেন কেন? আমরাও তো জানতাম না।'

'জানিয়ে কি লাভ?' চ্যাটার্জি বললেন, 'আপনারা জেনেই বা কি করবেন? কিন্তু পরাধীনতার যন্ত্রণা আমি হাড়ে মজ্জায় অনুভব করি। জানি না কবে কেমন করে দেশ স্বাধীন হবে। সেই আশাতেই বেঁচে আছি। বিয়ে-থাওয়া, কিংবা সুখে ঘরকন্না করা আমাদের মতো লোকের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে আছে শুধু সংগ্রাম। য়ুনিয়ন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমায় কাজ করে যেতে হবে। য়ুনিয়ন হলে এখানে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—সে স্বাধীনতা হবে, প্রোলেতরীয় রাজত্ব।'

গিয়াসুদ্দীন এসব কথা শুনে মুগ্ধ। মানুষটা সত্যিই একনিষ্ঠ—সর্বক্ষণ য়ুনিয়নের কথা, বইয়ের কথা আর দেশপ্রেমের কথা। একটা বিষয় নিয়ে সব সময় মেতে আছে। সকলের ধারণা চ্যাটার্জি নিরীহ শান্ত গোবেচারী গোছের মানুষ। তার অন্তরে যে মহান ব্রত উদযাপনের জন্য হোমাগ্নি জ্বলছে—এই সত্যটা এই প্রথম উপলব্ধি করলেন গিয়াসুদ্দীন।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর বরুয়া বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তখন চ্যাটার্জি বললেন, 'হঠাৎ কী যেন হল, মনের কথাগুলো বলে ফেললাম। কিন্তু এসব আমার দুর্বলতার লক্ষণ নয়, সবলতারও না। এখন সময় এসেছে সকলের একসঙ্গে কাজ করার। নেহেরুজী এলে আমাদের মজুরদের মনোবল নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সেই সুযোগে য়ুনিয়ন গঠন করতেই হবে। জানেন তো য়ুনিয়ন কেন দরকার—একদিন মেহনতী মানুষেরাই সব কলকারখানা চালাবে বলে।'

গিয়াসুদ্দীন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে একবার দেখলেন চ্যাটার্জির দিকে। সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যে শ্রমিক রাজ্য গঠিত হতে পারে—সে সম্ভাবনা মেনে নেবার মতো দূরদৃষ্টি গিয়াসুদ্দীনের নেই।

উনিশ

টেরোরিস্টদের ভয়ে সায়েবরা সবাই নাকি ত্রস্ত। নাসিরুদ্দীন খবর আনলেন যে দু'পাশে দুটি টোটা-ভরা বন্দুক না থাকলে নাকি জিলাপসী সায়েবের রাত্রে ঘুমই হয় না। কেবল জিলাপসী নয়, কালো সায়েব সিং-জী নাকি তিন তিনটা বন্দুক রেডি করে রাখে তার বিছানার পাশে। আর শোনা যায় যে থানার ও. সি. মিশ্রকে সারা রাত থানাতেই কাটাতে হয়। কোন মুহূর্তে কি যে হয় তার কিছু ঠিক নেই। এটাও এক চাঞ্চল্যকর খবর শহরের।

এইসব উড়ো খবরের কোনো দাম থাকুক বা না থাকুক, মিশ্র কিন্তু কড়া নজর

রাখছে চ্যাটার্জি, গিয়াসুদ্দীন ও বরুয়ার উপর। সিং-জী কোথা থেকে কী-সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর আনে। অভ্যর্থনা সমিতিতে স্থান না পাবার পর থেকে ওর এসব কুচক্রী রটনার মাত্রা বেড়ে গেছে। চ্যাটার্জির বাসায় ক্রোক হওয়া তো মামুলী ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বরুয়া, গিয়াসুদ্দীন, মালা সিং এমন কি চণ্ডী আহিরের ঘরেও আজকাল ঘন ঘন খানাতাল্লাসী হয়। কিছুই পায় না—কেবল অনর্থক সন্দেহ।

ইতিমধ্যে মজুরদের একটা সাধারণ সভাও হয়ে গেছে, য়ুনিয়ন গঠনের প্রস্তাবও পাশ হয়েছে সেখানে। তারপর থেকেই উদ্যোক্তাদের ওপর টাওলার সায়েব বেশি করে নজর রাখছে। টাওলারের ডান হাত হল সিং-জী, সিং-জীর ডান হাত ও. সি. মিশ্র। তবু আস্তে আস্তে য়ুনিয়ন গঠনের কাজ অগ্রসর হতে লাগল। যথাসময়ে সেই বিষয়ে আবেদনপত্র পাঠানো হল। কিন্তু দরখাস্ত পাঠালে কি হবে—যদি সরকার তার কোনো মূল্য না দেন। শিলং থেকে কোনো জবাবই পাওয়া গেল না।

ইসমাইলের বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে চণ্ডীর চিন্তা কী করে পান্নুকে কোথাও পাত্রস্থ করা যায়। লছমী সম্বন্ধে হতাশ হবার পর রামু চণ্ডীর কাছে আসাযাওয়া করেছিল। কিন্তু পান্নু এক কথায় বলে দিয়েছিল, 'কিছুতেই হতে পারে না'। রামু বাজপাখির মতো ছোঁ মারতে এসেছিল, পান্নুর কথা শুনে লজ্জায় গা ঢাকা দিল পেঁচার মতো। চণ্ডী আরো দুয়েক জায়গায় পাত্রের সন্ধান নিয়েছিল, কিন্তু পান্নু বলে দেয় তাদের সে বিয়ে করতে রাজী নয়। অনুপায় হয়ে চণ্ডী মেয়েকে জিগ্যেস করল, 'তা হলে তুই কী করবি ?'

পান্নু বলেছিল, 'পড়াশুনো করব।'

চণ্ডী আর কিছু শুধোয়নি। আবার আগের মতো চণ্ডী ঘরছাড়া হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে ঘরে ওর আর মন টেঁকে না।

পান্নু আবার জাহানারার কাছে নিয়মিত পাঠ নিতে আরম্ভ করেছিল। আজকাল সে বেশ পড়তে পারে। কিন্তু জাহানারার শক্ত ব্যামো হবার পর পান্নুর কোনো শিক্ষক না থাকায়, সে কিছুদিন ঘরে বসে নিজে নিজে পড়বার চেষ্টা করেছিল। গিয়াসুদ্দীন ওকে বলে দিয়েছিলেন বুঝতে অসুবিধা হলে যেন চ্যাটার্জিকে জিগ্যেস করে নেয়। চ্যাটার্জি পান্নুদের বাসার কাছেই থাকে।

জাহানারা সেদিন যে তাকে ডাকিয়ে এনেছিল তার একটা কারণ ছিল। জাহানারা ভেবেছিল, ইসমাইলের বিয়ের পর বুঝি পান্নুর হৃদয় একেবারে ভেঙে গিয়ে থাকবে। সেই অনুমানে পান্নুকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশে জাহানারা তাকে ডাকিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পান্নু নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে শান্ত হয়ে গেছে, সেকথা জাহানারার জানা ছিল না। পান্নুই জাহানারাকে প্রবোধ দিয়ে বরঞ্চ বলল, 'লছমী যেমন করে ইসমাইলকে আপন করে নিল, তেমন হয়তো আমিও পারতাম। কিন্তু আমি ওকে হিন্দু হতে বলেছিলাম। ও হল না। সুতরাং দুঃখ করে লাভ নেই।'

জাহানারার রোগটা কি জানা গেল না, ডাক্তারেও বলতে পারলেন না। কিন্তু এই অজানা রোগের ফলে সে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেল। জাহানারা তার মনের গভীরে একটা যেন শূন্যতা অনুভব করছিল। সর্বদা ওর মনে হত ও যেন জীবনমরণের মাঝখানে একটা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পান্নুকে ডেকে এবার বলেছিল, 'পান্নু, তুই লেখাপড়া করে যা। তোর জন্যে আমার ভারি দুশ্চিন্তা, সর্বদা তুই আসবি আমার কাছে।'

পান্নু বুঝেছিল কি হেতু জাহানারা ওকে ডেকেছিল। পড়াশুনো করতে করতে দু'জনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয়। জাহানারা বন্ধুকে ডেকেছিল তার মনের ভার লাঘব করতে।

গিয়াসুদ্দীনের গৌরবের নাগাল পাওয়া ভার। তাঁর ধরণধারণ কথাবার্তা কাজ-কর্ম সবকিছুতেই তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেত। এসব ব্যাপারে জাহানারা কণামাত্র তার স্বামীকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ভালোবাসার ব্যাপারে গিয়াসুদ্দীন নির্ভীক, কিন্তু তাঁর ভালোবাসার গভীরতা নেই। সেদিক থেকে তাঁর সঙ্গে ইসমাইলের অনেকখানি মিল। মাধুরী চলে গেল, কিন্তু তার জন্য ওঁর মনে একটুও দুঃখ নেই। রেল কামরা থেকে সহযাত্রী নেবে গেলে যেমন যাত্রীর মনে দুঃখ হয় না, ঠিক তেমনি একজনের পর একজন রমণী ওঁর জীবন থেকে অপসৃত হয়ে গেলে, গিয়াসুদ্দীনের প্রাণে বাজবে না।

জাহানারা বুঝতে পেরেছিল গিয়াসুদ্দীন স্বেচ্ছাচারী হলেও সৎ, নির্ভীক ও নানা গুণে গুণবান। কিন্তু প্রেম তাঁর ভাসা ভাসা, তার মধ্যে গভীরতার অভাব। তাঁর ধারণা স্ত্রীলোক অঙ্কশায়িনী মাত্র। এক শয্যায় ছাড়া, অন্য কোনো সময়ে তার সঙ্গে স্বামী বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলেছেন বলেও জাহানারার মনে পড়ে না। রোগ-শয্যায় পড়ে থাকলেও সেই একই রকম অনাদর।

অসহ্য হওয়ায় জাহানারা মনের দুঃখ হালকা করার জন্য পান্নুকে এই সব কথা বলছিল। এসব শুনে প্রথম দিকে পান্নু খুবই আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে বুঝতে পেরেছিল বিয়ে করলেই দাম্পত্য সুখ হয়না, প্রেম বললেই প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে না।

সেদিন জাহানারা ফিসফিস করে বলেছিল, 'একটা কথা চিন্তা করে মনে খুব দুঃখ হচ্ছে।'

'কি কথা ?'

তখন কোঠাটাতে কেউ ছিলনা। মাসী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন আর গিয়াসুদ্দীন চলে গেছেন খনিতে। জাহানারা বলল, 'ইনি আমায় বিয়ে করেছিলেন কেবল সন্তানের আশায়। কিন্তু এখন আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে সন্তান হবার আগেই আমি মরে যাব। কি অসুখ কেউ ধরতে পারছে না। কী-যেন একটা আমার সমস্ত দেহটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনটা ক্রমাগত যেন ঘূর্ণিপাকের মতো পাক খাচ্ছে। তুই শুধু আমায় ছেড়ে যাস না—আমার মৃত্যু পর্যন্ত থাকিস আমার কাছে।'

এসব কথা শুনে পান্নুর যেমন দুঃখ হচ্ছিল রাগও হচ্ছিল সেই সঙ্গে। পান্নু বলল, 'এসব কথা ওঁকে বলো না কেন? সব কথা খুলে বললে মনে শান্তি পাবে। আমি তো সামান্য মেয়ে...'

জাহানারা খুব কাতর হয়ে বলেছিল, 'না না না ওঁকে বলব কেমন করে? সময় সুযোগ পাই কোথায়? দু-দণ্ড আমার কাছে বসলে তো...!'

পান্নু আশ্চর্য হল জাহানারার কথা শুনে।

□

পড়া বুঝবার জন্য চ্যাটার্জির বাসায় গিয়ে পান্নু লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে চ্যাটার্জিকে বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সায়েব মানুষটা এ-রকম কেন?'

'কি রকম?'

'জাহানারা বৌদির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। খুবই খারাপ অবস্থা। মনেও খুব দুঃখ। গিয়াসুদ্দীন সায়েব তাঁর সঙ্গে একটা কথাও বলেন না। সেই পুরনো কালের পতি দেবতাদের মতো গুরুগম্ভীর হয়ে থাকেন।' পান্নু একটু হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু চ্যাটার্জির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে একটু লজ্জাও পেল। ছিঃ, এইসব কি কথা বলতে লেগেছে ও, এবং কার কাছে? হাজার হোক চ্যাটার্জি অবিবাহিত মানুষ, কে জানে কি ভাবে নেবেন কথাটা! কিন্তু কথাটা বলে পান্নু যেন একটু হালকা বোধ করল।

সেদিন চ্যাটার্জির মনটা একটু খারাপ ছিল, টাওলার ফন্দীফিকির করে তাঁকে খনির কাজ থেকে সরিয়ে রিফাইনারীর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এই নতুন কাজে চ্যাটার্জি একটু অনভিজ্ঞ, সেজন্য মনে মনে তিনি একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন, বুঝেছিলেন অবশ্য এটা তাঁর য়ুনিয়ন করার দরুন শাস্তি, এবং সেজন্য শহীদের মতো শাস্তিটা মেনেও নিয়েছিলেন।

পান্নুর কথা শুনে চ্যাটার্জি ঠিক ধরতে পারলেন না পান্নুর এসব কথা বলার উদ্দেশ্যটা কি। দাম্পত্য কলহের প্রসঙ্গ তোলা খুবই অশোভনীয়। তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'গিয়াসুদ্দীন সায়েব পৃথিবীর সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, স্ত্রীর সঙ্গে বলতে পারবেন না কেন? এ তো খুবই আশ্চর্য!'

পান্নু বলল 'সত্যিই আশ্চর্য। কিন্তু জাহানারা বৌদির অবস্থা খুবই খারাপ— ডাক্তার বলেছেন।'

'ডাক্তার বলেছেন? কাকে বলেছেন?'

'বরুয়া দাদাকে। বরুয়াবৌদি আমায় বলেছেন। সেইজন্যেই তো বলছি। গিয়াসুদ্দীন সায়েব তো সব দিক থেকেই ভালো, কিন্তু জাহানারাবৌদির সঙ্গে একেবারে কথা বলেন না। লোকে বলে মরবার সময় লোকে যদি আশাভঙ্গ নিয়ে মরে তা হলে ভূত হয়ে ভয় দেখায়। তখন মজাটা টের পাবেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব!'

চ্যাটার্জি হাসতে আরম্ভ করলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিরকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত

তা তাঁর ধারনার বাইরে। এ পর্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গ থেকে তিনি দূরে দূরে আছেন বললে ভুল বলা হবে না। পান্নু এসে তাঁর সামনে একটা নতুন সমস্যা তুলে ধরল— জাহানারার ঘরোয়া সমস্যা। নারী পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে চ্যাটার্জির কোনো কৌতূহল নেই বলাটা ঠিক হবে না, কিন্তু জাহানারা-গিয়াসুদ্দীন প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি পান্নুকে বললেন, 'পরের সমস্যার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার নিজের বিষয়ে কোনো কথা বুঝি বলার নেই ?'

পান্নু এবার হাসি চাপতে পারল না, বলল, 'কথা যদি থাকেও, যাকে তাকে কি বলতে পারি ?'

চ্যাটার্জিও হেসে বললেন, 'এসব কথার মানে আমি কি বুঝব, পান্নু ? আমার মতো অকৃতদার লোককে কেন টানা ? গিয়াসুদ্দীনকে সোজাসুজি বলাই তো ভালো।'

চ্যাটার্জির গলার সুরটা কেমন একটু মোলায়েম হয়ে উঠল। পান্নু যে তাঁকে এমন একটা খবর দিতে এল, এইটাই তো তাঁর প্রতি পান্নুর বিশ্বাসের চিহ্ন। ভিতরে ভিতরে তিনি খুশি হলেন।

পান্নু বলল, 'আমি যদি পারতাম তাহলে হয়তো বলতাম। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন সায়েবকে এসব কথা বলতে আমি পারব না।' 'গিয়াসুদ্দীন সায়েব' কথাটা উচ্চারণ করতেও তার অন্তরটা যেন কেঁপে উঠল। কেন কাঁপল তার কারণটা একমাত্র সে-ই জানে।

চ্যাটার্জি হেসে হেসে বললেন, 'কথাটাতে বিশেষ কিছু আছে কি ? পুরুষ ও নারী তো সমান।'

'আপনি সে কথা মানেন ?'

'হ্যাঁ, মানি বই কি।'

'এই শহরে আর কেউ মানে না। এমন কি বড় সায়েবও...'

'কি করে জানলে ?'

'নয়নমণি বলেছে। নয়নমণিদের সঙ্গে মেমসায়েব এত অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করেন, সায়েবের তা পছন্দ নয়। একা একা গিয়ে মার্ঘেরিটাতে রাত কাটানোটাও তাঁর ভালো লাগে না। মেমসায়েব চটে গেছেন, খুঁটিনাটি ব্যাপারে মন কষাকষি চলছে। পুরুষের হুকুম মতো চলা নাকি মেয়েদের পক্ষে ভারি শক্ত—দুজনকে পরস্পরের না কি সমান হতে হবে...'

'কাকে বলেছে এসব কথা মেম সায়েব ?'

'নয়নমণিকে।'

'আশ্চর্য ! ওদেরই যদি এরকম অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থা আরো অনেক খারাপ।'

পান্নুর খুব ভালো লাগল চ্যাটার্জির কথা শুনে। সে বলল, 'বাবা তো আমায় নিজের ইচ্ছামতো চলতে ফিরতেও দিতে চান না।'

'দিতে চান না ? তুমি তো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ ।'

'সেইটাই তো আমার অপরাধ । বিয়ে করার জন্য কিরকম চাপ দিচ্ছেন, কি বলব ? যেমন তেমন কাউকে নাকি বিয়ে করতেই হবে । রামুর কথা বলেছিলেন, আমি বললাম "ও বুড়োকে আমি বিয়ে করতে পারব না ।' তারপরেও আরো দু'একজনের কথা তুলেছিলেন—তাদের একজন হল সিং-জী ।' পান্নু এবার খিল খিল করে হেসে ফেলল ।

'সিং-জী ? ও হরি ! তাকে কি ভূতেপেল ? তার তো এক স্ত্রী বর্তমান !'

'টাকা পয়সা হয়েছে তো, তাই আরেকজন যুবতী স্ত্রী দরকার । লছমীকে পাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ওর মুখের ওপরে জুতো মেরেছে...'

'জুতো মেরেছে ?'

'না না, ঠিক জুতো মারেনি, মানে বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়েছে । এখন আমার পিছু পিছু ঘুরতে লেগেছে । সময় নেই, অসময় নেই, বাড়ি এসে কেবল পান্নু, পান্নু বলে ডাক ছাড়ে ।' বিরক্তিতে ও ঘৃণায় পান্নুর নাকটা কুঁচকে গেল ।

চ্যাটার্জি এবার একটা সিগারেট ধরালেন । পান্নুকে ভালো করে লক্ষ্য করার জন্য একবার তিনি মুখ তুললেন । কিন্তু লজ্জা লাগল । পাশের একটা বাসাতেই একজন প্রাণোচ্ছল যুবতী যে বসবাস করে, সে কথা তিনি যেন আজ প্রথম বুঝতে পারলেন । তিনি বললেন, 'বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন একজন কাউকে বিয়ে করাটাই তো ভালো ।'

'তা আমি করতে চাই না । জল তেষ্টা পেয়েছে বলে পথের পাশের নর্দমার জল খাব নাকি ? তাতে তেষ্টা মেটে না ।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'নির্মল জল পাওয়া খুবই শক্ত ।'

পান্নু বলল, 'হ্যাঁ, শক্ত তো বটেই । কিন্তু নির্মল জলেরও তো অভাব নেই । খুঁজে বের করতে জানলেই হল ।'

'তা হলে খুঁজে দেখো না কেন ?'

পান্নু হাসতে লাগল, 'পচা ডোবাই বেশির ভাগ । নির্মল জলের সরোবর যে দু'-একটা আছে, তার কাছাকাছি যেতে পারি না । রাস্তায় কাঁটা বিছানো আছে ।'

'পথের কাঁটা সরিয়ে ফেললেই তো হয় ।'

'কাজটা অত সহজ নয় ।'

আলাপটা ক্রমেই সহজ হয়ে আসছিল । চ্যাটার্জিও একটা যেন আত্মীয়তার সুর শুনতে পাচ্ছিল পান্নুর কথাবার্তায় । চ্যাটার্জি জিগ্যেস করলেন, 'কেন সহজ নয় ?'

'একজনাকে তো দেখলেনই । আর...'

'আর কেউ আছে ?'

পান্নু কিছু না বলে চ্যাটার্জির মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল । চ্যাটার্জি ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, যেন পালাতে পারলে বাঁচেন ।



সেইদিনই একটা ঘটনা ঘটল রিফাইনারীতে। চ্যাটার্জি গ্লাভস্, গগল্‌স, এপরন্ আর টুপি পরে বয়লারের তাপ নিয়ন্ত্রণ করছিল। খানিকটা দূরে ইসমাইল গ্যাসমাস্ক আর গাম বুট পরে গ্যাসপ্ল্যাণ্টে কাজ করছিল। এদিকে ফায়ারম্যান, ওয়েল্ডার ও হ্যামারম্যান—এই তিনজন মিলে পরামর্শ করছিল বয়লারের একটা ছিদ্র কীভাবে বন্ধ করা যায়—সেই বিষয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের পচা ডিমের মতো গন্ধটা নাকে আসছিল ক্রমাগত। সেই গন্ধ অসহ্য হওয়ার ফলে চ্যাটার্জি চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এক নিমেষে ইসমাইল তাঁর কাছে চলে এল। বয়লার পাইপের ফুটো দিয়ে ক্রমাগত গ্যাস বেরোচ্ছে। রিফাইনারীতে গ্যাস মাস্ক ছিল কম। অনভিজ্ঞ চ্যাটার্জি পরবার মতো মাস্ক না পেয়ে বিনা মাস্কেই কাজে নেবেছিল।

সকলেই হন্তদন্ত হয়ে বয়লারের কাছে ছুটে এল। ইসমাইলের খুবই খারাপ লাগল যে চ্যাটার্জিকে সে আগের থেকে কেন সাবধান করে দেয় নি। দু'জনে রিফাইনারীতে আসবার সময় সারা পথ পান্নুর বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিল। চ্যাটার্জির মুখে পান্নুর প্রশংসা শুনে ইসমাইল অস্বস্তি বোধ করেছিল—সে একটা কথাও বলতে পারে নি। কথা না বললেও চ্যাটার্জির প্রতি একটু যে ঈর্ষা অনুভব করেনি—এমন নয়। মুখে কিন্তু বলেছিল, 'ওর জন্যে আমার চিন্তা হয়, জানেন চ্যাটার্জি বাবু।'

'কেন?'

'ও হল গভীর জলের মাছ। বাইরেটা যেমনই হোক না কেন, মনটা ওর খুব সুন্দর।'

'তবে তুমি কেন এমন করলে?'

'হিন্দু হতে চাইনি আমি।'

ইসমাইল ভেবেছিল ফেরবার পথে পান্নুর বিষয়ে আরো কিছু কথা বলবে চ্যাটার্জির সঙ্গে। পান্নুর কাছ থেকে সে ক্ষমা চাইবে আর বলবে সে যেন বিয়ে করতে রাজি হয়।

ইসমাইল একা হাতে চ্যাটার্জিকে চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল রিফাইনারীর বাইরে একটা ঘাসের প্লটের উপর। লোকটা খুবই হালকা ওজনের। তারপর ফোন করে হাসপাতালের ডাক্তারকে বলে দিল একটা এম্বুলেন্স পাঠাতে। কিন্তু ডাক্তার বললেন যে এম্বুলেন্স বাইরে গেছে বলে তখন তখনি পাঠানো যাবে না। ডাক্তার নিজেও খুব ব্যস্ত আছেন, তাই তিনিও আসতে পারবেন না। সুতরাং কেউ যেন রিফাইনারী থেকেই চ্যাটার্জিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

ইসমাইলের খুব রাগ হল, বলল, 'রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, না গ্যাসপ্ল্যান্ট সামাল দেব? এখানে কোনো ডিস্পেন্সারি থাকা তো দূরের কথা, একটা ফার্স্ট এড-এর বাক্সও নেই।'

ইঞ্জিনীয়র সায়েবকে ডাকা হয়েছে, কিন্তু তিনি গেছেন বড়সায়েবের বাংলো বাড়িতে, বড়দিনের উপহার নিবেদন করার জন্য। সর্বনাশ হল। এদিকে গ্যাস বেরোচ্ছেই, ওয়েল্ডরম্যান কিছুতেই মেরামত করতে পারছে না, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। বিষাক্ত গ্যাস যদি রিফাইনারী কলুষিত করে তাহলে বদনাম হবে ইসমাইলের। অতিষ্ঠ হয়ে সে একজন পিওনকে ডেকে বলে দিল যেমন তেমন করে একটা মোটর গাড়ি যেন জোগাড় করে আনে। চ্যাটার্জির শার্টের বোতামগুলো খুলে দিল ইসমাইল, বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো যেন গোণা যায়।

মজুরেরা গ্যাসের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'গ্যাস মাস্ক না দিলে আমরা কাজ করতে পারব না।'

'গ্যাসমাস্ক আমি তৈরি করব নাকি ?' ইসমাইল বলল, 'আমি তো ফোরম্যান মাত্র। কেন যে মরতে শ্রীনিবাসন সায়েব গেছে বড়সায়েবের ওখানে, বড় দিনের উপহার দিতে। এদিকে তো ঘোর হিন্দু, কপালে ফোঁটা না কেটে রিফাইনারীতে পা দেয় না।'

কে একজন ফোঁড়ন কাটল, 'উপহার কে বললে ? উপহার নয়, ঘুষ।'

এত বিপদের মধ্যেও মজুরেরা হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল।

ইসমাইলের মনে ভয় ঢুকেছে। যদি গ্যাসপাইপে আগুন ধরে যায়, তাহলে রিফাইনারী রক্ষা করা অসম্ভব হবে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওয়ার্কশপ থেকে দক্ষ মিস্ত্রি আনতেও ইঞ্জিনীয়রের অর্ডার নিতে হয়। বড় সায়েব বড়ো, না রিফাইনারী বড়ো ?

চ্যাটার্জিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য এখনো গাড়ির ব্যবস্থা হয়নি। পিওন গেছে হেড অফিসে। বাইরে ডিসেম্বরের কনকনে বাতাস। কিন্তু উঁচু কংক্রীটের পাঁচিল ভেদ করে খোলা হাওয়া ঢুকতে পারে না রিফাইনারীতে।

কথার গুঞ্জন সদ্য উঠছিল, ইঞ্জিনীয়র সায়েবের গাড়ি দেখে সবাই মুখ বুজল।

শ্রীনিবাসন অবস্থা দেখে অবাক, বললেন, 'এখানে কেউ কি আছে গাড়ি চালাতে পারে ? এঁকে তা হলে হাসপাতালে রেখে আসুক।' ইসমাইল ছাড়া আর কেউ নেই যে গাড়ি চালাতে পারে। সে কারখানার সাজ পোশাক ছেড়ে, খাকি প্যান্ট-শার্ট পরে মোটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'দিন গাড়ির চাবি।'

'তুমি গেলে অসুবিধা হবে।' শ্রীনিবাসন বললেন।

'না গেলে উপায় নেই। এক মিনিট দেরি হলেও রোগীর বিপদ ঘটতে পারে। আপনি প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিন, তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

ইসমাইল চ্যাটার্জিকে মোটরে শুইয়ে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল। শ্রীনিবাসন গ্যাসের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে রুমাল গুঁজলেন নাকে। হঠাৎ এমারজেন্সী ঘণ্টা বেজে উঠল। ইঞ্জিনীয়র সায়েব কিছু বুঝতে পারলেন না। ইলেকট্রিক্ প্ল্যান্ট থেকে দৌড়ে এসে চোখের নিমেষে বরুয়া বয়লারের ইঞ্জিন ও ক্রুড অয়েলের পাইপ—দুটোই বন্ধ করে দিলেন। তারপর কাছের একটা মেসিনের সঙ্গে হোস

পাইপ লাগিয়ে বরুয়া বয়লারের ফাটলের উপর হুড হুড করে জল ঢালতে লাগলেন।

ফাটল থেকে বেরোবার সময় গ্যাস থেকে এক ঝলক আগুন জ্বলেছিল। সে আগুন নেভাতে আর একটু যদি দেরি হত, তা হলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত রিফাইনারী উড়ে যেত। বয়লারের কাছে একটা পাইপের জোড়াতেও ফুটো বেরিয়েছিল।

বরুয়ার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে শ্রীনিবাসন মুগ্ধ হলেন। তিনি কর্মবিরতির সাইরেন বাজানোর জন্য আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কশপে গিয়ে, সেখান থেকে ফোনে বড় সায়েবকে খবরটা জানালেন। বড সায়েব কাজ বন্ধ করার আদেশ মঞ্জুর করলেন।

আগুন নিবে গেলে পর বরুয়া রিফাইনারীর বাইরে বেরিয়ে এসে বসলেন ঘাসের উপর। মজুরেরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ছুটিব সাইরেন বাজল। বরুয়া একদৃষ্টে দূরের নীল পাহাড়গুলো দেখতে লাগলেন।

চণ্ডী আহির একটা প্রচারপত্র পডতে পডতে আসছিল, বরুয়া দেখেই বুঝলেন সেদিন ইসমাইলের বিয়েবাড়িতে পড়া প্রচারপত্রটাই আহিরের হাতে। পডা হয়ে গেলে পর চণ্ডী সেটি একজন মজুরের হাতে দিয়ে বরুয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি না থাকলে আজ সর্বনাশ হয়ে যেত।'

বরুয়া হাসলেন, কথা কিছু বললেন না। সেই সময়ে পিওন এসে বলে গেল যে ইঞ্জিনীয়র বরুয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বরুয়া নীরবে উঠে গেলেন।

মজুরেরা প্রচারপত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। য়ুনিয়ন গড়তেই হবে। সায়েবরা পুরনো বয়লার সরিয়ে দিয়ে নতুন বয়লার বসাবার ব্যবস্থা করছে। তখন আবার লোকজন ছাঁটাই হবে। এদিকে মজুরদের কত অসুবিধা। রিফাইনারী আর খনি অঞ্চলে কোথাও একটা ক্যান্টিন নেই। বাইরে না বেরোলে এক কাপ চা, এক টুকরো পাঁউরুটি কিম্বা একখানা পুরী পাওয়া শক্ত। অনেকদিন ধরেই ওরা দাবি করে আসছে যে ওদের ক্যান্টিন চাই। সায়েবরা কত আরামে কাজ করে। মোটরে যাওয়া আসা করে। সকালবেলা বেড টি, তারপর ছোটা হাজারি, দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলে চা, রাতে ডিনার। মজুরেরা দিনের বেলা কখনো বাড়ি যেতে পারে না দুমুঠো ভাত খাবার জন্য। টিফিনের ছুটির সময় কাজের জায়গায় একটু গড়িয়ে নেয়।

শুধু ক্যান্টিন কেন, নিয়মিত ছুটি চাই, নিম্নতম বেতন চাই। ফিটার, টার্ণার, ওয়েল্ডর, পিওন, যোগানদার, মিস্ত্রি, ফোরম্যান, ড্রিলার—এদের কারোরই মাইনের কোনো স্কেল নেই। সব নির্ভর করে ওপরওয়ালার মর্জির ওপর। কোম্পানীর রিজার্ভ ফাণ্ডে শোনা যায় পাঁচ কোটি টাকা জমেছে। কোম্পানী যখন গঠিত হয় তখন মূলধন ছিল বাহান্ন লক্ষ টাকা মাত্র। এখন রিজার্ভ ফাণ্ডেই এত কোটি টাকা।

তাছাড়া অন্য একটা কোম্পানীর কাছ থেকে ঋণ বাবদ এই কোম্পানীর প্রাপ্য আছে তিন কোটি নব্বই লাখ। কত টাকা কোম্পানীর!

কোম্পানীর লাভ হয় খুব। সেই লাভের সুবিধা ভোগ করে ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সীনিয়র এসিস্ট্যান্ট—এরা সবাই। এইসব সায়েবরা পায় মোটা বোনাস, দক্ষতা বোনাস, মোটা মাইনে, আর অভাবনীয় সুখ সুবিধা এবং এলায়েন্স। মজুরদের চাকরির পর্যন্ত স্থিরতা নেই। মাইনে বোনাস পাওয়া তো দূরের কথা।

কোম্পানীর টাকা ও উন্নতির খবর বেরোয় হেড অফিস থেকে। সেখানে সব হিসেব করা হয়। এবার নাকি খবর বেরিয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার বহু কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে কোম্পানীকে। অবশ্য কেবল এই কোম্পানীকেই নয়—চা, তেল, কয়লা এবং বড় বড় উদ্যোগ—এইসবের জন্য মোট একশো আশি কোটি টাকার ঋণ। এত টাকা পাওয়া সত্ত্বেও মজুরদের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটেনি। এদিকে এবছর ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছে। হলে কি হবে? নয়া দিল্লীতে সায়েবরাই সব শাসনের লাগাম ধরে বসে আছেন। আসামেও নাকি কোয়ালিশন সরকার হবে। কিন্তু মজুরদের কি হবে? নেহরু আসবেন শহরে। তখন নিশ্চয় এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

কিছুক্ষণ পরেই বরুয়া বেরিয়ে এলেন। তিনি এসেই বললেন, 'খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে এসেছি ইঞ্জিনীয়রকে। কালবিলম্ব না করে রিফাইনারীতে একটা ডিসপেন্সারী বসাতে হবে। গ্যাস মাস্ক-এর অর্ডার দেবার কথাও বলে এসেছি। কিন্তু কি জবাব দিল শুনুন। বলে নাকি ইকনমিক ক্রাইসিস—কোম্পানীর অর্থনীতিক মন্দার পর্ব চলছে। য়ুরোপে যুদ্ধ লাগে লাগে। তেলের বাজার খুব নাকি খারাপ। কোম্পানীর কিছু লাভ হয়নি...' •

'ধাপ্পা দিচ্ছে সাহেব'—চণ্ডী বলল, 'যুদ্ধ হবে বলে তেলের বাজার বরঞ্চ গরম হয়েছে।'

মজুরেরা বলল 'সব ঠকবাজ, স্রেফ গুল!' একজন বলল, 'শ্রীনিবাসন সাহেবকে এখন থেকে শ্রীতৈলমর্দন সাহেব বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।'

এইবার সবাই হো হো করে হাসতে লাগল।

ইতিমধ্যে পিওন ফিরে এল হেড অফিস থেকে, বাইসাইকেল চেপে। বলল 'একটাও গাড়ি পাওয়া গেল না।'

বরুয়া বললেন, 'কী আশ্চর্য, একটাও পেলে না? কোম্পানীর গাড়িগুলো সব গেল কোথায়?'

কোন একজন মজুর বলল, 'হাওয়া গাড়ি হাওয়া হয়ে গেছে। সব ধাপ্পা!'

আরেকজন বলল, 'ধাপ্পাবাজি নয়, চরম অবহেলা। চ্যাটার্জি মরে তো মরল। তাতে হেড অফিসের কী এসে যায়?'

কুড়ি

মিঃ ফ্লেমিং কোম্পানীর বড় সায়েব। একটা প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে, কিন্তু মিসেস ফ্লেমিঙের ওপর তাঁর শাসন চলে না। শহরের চাঞ্চল্যকর খবরের মধ্যে এটা অন্যতম। নয়নমণি-দুর্গার বিয়েতে কেন যে শহরের পয়লা নম্বর লেডি সাক্ষী হলেন! কারণে অকারণে মজুরবস্তি যাওয়াটাও তাঁর অস্থির মতির একটা প্রমাণ। নেটিভদের সঙ্গে এরকম মেলামেশা করাটা টাওলার সায়েবের অসহ্য বলে মনে হয়েছিল। কারণে অকারণে মজুরদের পক্ষ নিয়ে তর্কাতর্কি করাটাও মিসেস ফ্লেমিঙের একটা বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কথায় কথায় তিনি বলে থাকেন যে ইংলণ্ডের মজুরেরা যদি য়ুনিয়ন করতে পারে, ভারতের মজুরেরাই বা করতে পারবে না কেন? আরো অনেক অভিযোগ অনুযোগ বড় সায়েবের মনের মধ্যে ঠেসে গজগজ করতে থাকে—সেগুলো অবশ্য গোপন মনের ব্যাপার। সময়ে অসময়ে পাহাড়ে পর্বতে চলে যান মিসেস ফ্লেমিং। এনথ্রপলজি পড়েছেন, সেইজন্য গিরিজনদের কথা প্রত্যক্ষভাবে জানার আগ্রহে তিনি তাদের বস্তিতেই দুয়েক রাত কাটিয়ে আসেন। কখনো একাই যান, কখনো সঙ্গে লোক নিয়ে যান। এইসব একা একা এদিক সেদিকে চলে যাওয়া, ফ্লেমিঙের পক্ষে অসহ্য হয়েছে।

শ্রীনিবাসনের ফোন পেয়ে মিঃ ফ্লেমিং দুর্ঘটনার কথাটা গোপন করে গেলেন। বড়দিনের অতিথি হয়ে যাঁরা তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসেছেন সেইসব সহকর্মী সায়েবদের কাছে কিছু ভাঙলেন না। তারা তখন সবাই বড়দিনের উৎসব পালনে আত্মহারা। খবরটা পেলে মিসেস ফ্লেমিং যে কী করে বসেন তার স্থিরতা নেই—হয়তো হঠাৎ বলে বসবেন, 'এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে যখন, উৎসব বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

মিঃ ফ্লেমিঙের মনে নানা দুশ্চিন্তার বোঝা। এখানকার জীবন ধরাবাঁধা মসৃণ জীবন নয়, পদমর্যাদার উত্তুঙ্গ শিখরে একটা শূন্যতার মধ্যে তাঁর দিন কাটে। দিনে অফিস, রাতে ক্লাব, ছুটিতে 'হোম'। প্রকাণ্ড বাংলো বাড়িতে দিনগত পাপক্ষয়ের জীবন তাঁর আর ভাল লাগে না। প্রথম একটা মাস বেশ কেটেছিল, সেই একমাস দুজনে যেন রাজসুখে ছিলেন। আঙুল নাড়ালেই সব কিছু পাওয়া যেত নাগালের মধ্যে। যেখানে যায় সেখানেই সেলাম, মান-সম্ভ্রম—সবাই সমীহ করে চলে। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোলেও মজুরেরা সসম্ভ্রমে রাস্তার একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মোটরে বড় সায়েবকে যেতে দেখলে সবাই সিগারেট বিড়ি নিবিয়ে ফেলে। ভাবখানা ছিল যেন 'আই এম্ দ্য মনার্ক অব অল্ আই সারভে' গোছের।

কিন্তু সেই একটা মাসের রাজসুখ যেন ভেসে গেল মার্চ মাসে, যখন প্রবল ধারায় বর্ষা নাবল শহরে। মোটরের চাকা কখনো বা কাদার মধ্যে বসে যায়। সেই সঙ্গে এল ঝাঁকে ঝাঁকে মশা, আর ভ্যাপসা ধরণের গরম। গরমে, ঘামে, চুলকানিতে ছালচামড়া ছিঁড়ে আসার যোগাড়। ঘাম বসে মেমসায়েবের গায়ে ফোঁড়া ফোসকা

বেরোল। বাংলোবাড়িটা একটা নির্জন দ্বীপের মতো, কালেভদ্রে লোক আসে সেখানে। গাছ-গাছড়া, ফুল-ফল, ঘোড়া-কুকুর, চাকর-বাকর নিয়েই ওই প্রকাণ্ড বাংলোতে মেমসায়েবকে একা একা দিন কাটাতে হয়। লেখাপড়া করতেও অবসাদ আসে, ঘুরে ফিরে বেড়ালেও সময় কাটে না, বিছানায় শুলেও ঘুম আসে না। ক্লাবে গেলেও ভালো লাগে না—কৃত্রিম একঘেয়ে জীবনযাত্রা। লণ্ডনে যেমন ট্রামে বাসে টিউবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখানে তেমন করার জো নেই—কারণ তিনি যে শহরের এক নম্বর লেডি—তাঁকে মানসম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে হয়।

পয়লা নম্বর লেডির মুখ্য কর্তব্য হল, পার্টিতে হাজিরা দেওয়া এবং পার্টির রীতি অনুসারে মেপেজুকে হাসা আর কথা বলা, নাচা আর 'হাউ ডু ইউ ডু' বলা। হৃদয়-মনের দেওয়া নেওয়ার কোনো পাটই নেই। এসব দেখে মিসেস ফ্লেমিং বিরক্ত হয়ে মাস দুই পরে স্বামীকে বললেন, 'চলো, এখান থেকে পালাই। এখানে নাম্বার ওয়ান হবার চেয়ে ঢের ভালো লণ্ডনের শপ-গার্ল হওয়া। আর কিছুদিন এখানে থাকলে মনোলিথের মতো হয়ে যাব। শুনেছি, দেবতার অভিশাপে কোনো কোনো হিন্দু দেবী না কি পাথরে পরিণত হয়েছিলেন। আমাদেরও সেই অবস্থা হবে।'

মিঃ ফ্লেমিং কিন্তু ফিরে যেতে রাজি হলেন না। কোম্পানীর তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। হিটলার আর একটা মহাসমর লাগাই লাগাই করছে। এই সময়ে তেলের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। অনর্থক মজুর আন্দোলনের ফলে যাতে উৎপাদন হ্রাস না পায়, সেজন্য কোম্পানী তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলে দিয়েছেন। টাওলারকে সামাল দিতে হচ্ছে—ভারি উগ্রস্বভাবের মানুষ। ভারতবর্ষে রাজনীতিক আন্দোলন চলছে পুরোদমে, সেজন্য স্বেচ্ছাচারিতার পথ ছেড়ে বিচক্ষণ বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন।

কিন্তু মিসেস ফ্লেমিং অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বই আর প্রবন্ধাদি লিখছেন বলে কোনোরকমে টিঁকে আছেন। তা না হলে, কথাবার্তা তো একেবারে বিদ্রোহিনীর মতো—বলেন কি না এদেশে ইংরেজরা হল 'ফরেন' আনটাচেবেলস্, হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যেরা যেমন 'নেটিভ' আনটাচেবেলস। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এদেশেও সেগ্রিগেশ্যন চলছে পুরোদমে।

কেন যে বিলেত থেকে এদেশে পা দিলেই ইংরেজদের চালচলন বদলে যায়। প্রথম প্রথম কিছু ইংরেজ দেশীয় লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে চায়, কিন্তু কোম্পানীর নিয়মতন্ত্র ভারি কঠোর, চালচলনে এক চুলও হেরফের করার জো নেই। কোম্পানী সব সায়েবকে একই ছাঁচে ঢেলে গড়তে চায়। সবাইকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে চায়। সায়েবরা স্থানীয় ভাষা, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এসব বিষয়ে কোনো কিছু জানবার সুযোগ পায় না। মানুষের সঙ্গে ওদের শুধু ফাইলের সম্পর্ক—মানবিক সম্পর্কের লেশমাত্র নেই।

এই শহরের ইংরেজদের দেখে মনে হয় যেন ওদের জন্য ইতিহাস একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকায় তেল শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটছে। রাশিয়া

দ্রুতগতিতে জীবনের সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। দূর প্রাচ্যে জাপান স্বপ্ন দেখছে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার। ইংলণ্ডেই চেম্বারলেন-এর নেতৃত্ব টলোমলো। সারা য়ুরোপ আজ বিভ্রান্ত। হিটলার গ্রাস করেছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে। ফ্যাসিবাদ সংহার মূর্তি ধারণ করেছে। ভারতবর্ষ ও চীন আজ জেগে উঠেছে। উনিশ শতকের ব্রিটিশ প্রভুত্বগৌরব আজ অস্তমিত। টাওলার যে-পদ্ধতিতে শ্রমিকদের শাসন করে দাবিয়ে রাখতে চায় তা একধরনের দস্যুবৃত্তি। ধনিকমালিকদের এই দস্যুতা আজ বৃটেনে পরাভূত। কিন্তু টাওলার অন্ধ, জিলাপসী ও টেইন্‌স্‌—দুজনেই নির্বোধ, কিছুই বোঝেন না তারা। এই তেলের শহরে জওহরলাল নেহরুকে ঢুকতে দেওয়া হবে না —এরকম তাদের মনোভাব। কারখানার সর্বত্র নূতন যন্ত্রপাতি বসাতে হবে— খুবই ঠিক কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিক-অসন্তোষও ঘুচাতে হবে। এটাই হল বৃটেনের কূটনীতি—এই নীতি কাজে লাগাবার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টররা ফ্লেমিংকে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনো তিনি কিছু করে উঠতে পারেন নি। আজ কোম্পানীর সায়েব কর্মচারীদের সবাই আসবে বড়দিনের ভোজে—এই সুযোগে তাদের সবাইকে কোম্পানীর নীতি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু ফ্লেমিং যেন তেমন জোর পাচ্ছেন না মনে, টাওলার ও অন্যান্যদের মুখোমুখি হতে কেমন যেন অনিচ্ছা হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ওরা বদ্ধপরিকর, পদে পদে তাদের কাজে বাধা দেবার মতো শক্তি বা ক্ষমতা ফ্লেমিং সায়েবের নেই।

এক গেলাস মদ নিয়ে মিসেস ফ্লেমিং ঢুকলেন কামরায়। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। চলো এবার।' তিনি বললেন।

ফ্লেমিং সোফা ছেড়ে উঠলেন ও সন্তর্পণে মিসেস ফ্লেমিঙের ঠোঁটে চুমো খেলেন। তারপর মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে লাউঞ্জে প্রবেশ করে তিনি পানের পর্ব শুরু করলেন। প্রথমেই 'মেরি খৃষ্টমাসের' নামে টোস্ট পান করা হল।

□

রেকর্ডে যন্ত্রসংগীত বাজছে। বাগানের চৌহদ্দীর মধ্যে যেসব বার্চ ও পাইন গাছ আছে, তাদের মাথায় দুপুরের মিঠে রোদ যেন সোনা হয়ে পড়েছে। খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মালঞ্চ, সেখানে গোলাপ ও পাইন্‌সেটিয়ার শোভা। ঘরের এক কোণায় একটি প্রকাণ্ড ঝলমলে খৃষ্টমাস-ট্রি—গত রাত্রের উৎসবের অবশেষ। এখনো ডালে ডালে লাল রঙা বাল্ব জ্বলছে। গেলাসের মদে লাগছে সেই লালরঙের ঝিলিক।

টাওলার মানুষটা মাথায় বেশ লম্বা—শক্ত সমর্থ লম্বা চওড়া লোক। সকলের আগে সে-ই কথাটা পাড়ল, 'যুদ্ধ যেন লাগবেই মনে হচ্ছে। জিলাপসী তো আনন্দে ডগমগ—ও তো একজন গত যুদ্ধের ভেটারেন।'

'গত মহাযুদ্ধে কোথায় ছিলেন?' ফ্লেমিং শুধোলেন।

টাওলার বলল, 'মধ্যপ্রাচ্যে।'

ফ্লেমিং আর কিছু না বলে এক চুমুক হুইস্কি খেলেন। ভোজসভায় এই প্রসঙ্গ তাঁর অবান্তর মনে হল, তাঁর ভালো লাগল না।

মিসেস ফ্লেমিং ডাইনিং রুমে টেবিল সাজানো তদারকি করছিলেন। যুদ্ধের কথা শুনে বেরিয়ে এসে বললেন, 'যুদ্ধ জিনিসটা আমি ঘৃণা করি।'

টাওলার বলল, 'ঘৃণা করলে যুদ্ধ হবে না—এমন তো নয়। যুদ্ধ একটা আসছে।'

মিঃ ফ্লেমিং বললেন, 'যুদ্ধ আসাটা অবশ্যম্ভাবী যখন, এখানে আমাদেরও বুঝে সমঝে চলা উচিত। হ্যাঁ, একটা কথা আমার বলে রাখা ভালো। মজুরদের প্রতি নির্দয় হওয়াটা ঠিক নয়। ওদের জন্য ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বাজার জল সরবরাহ—এইসব কথা আমি চিন্তা করে দেখছি। একটা পরিকল্পনা তৈরী করে লণ্ডনে পাঠিয়েছি। কিন্তু এখানে টাওলারকে একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চলতে হবে। না চললে বিপদ হতে পারে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসামেও তো কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার হবে। আর ইংলণ্ডের মজুর আন্দোলনের কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত...'

মিঃ ফ্লেমিং গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে কথাগুলি বলছিলেন। জানতেন, ওরা তিনজন প্রতিবাদ করবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেকের গেলাসে একটু একটু করে নীট হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছিলেন, যাতে কথাবার্তা বেশ সহজে মন খুলে বলা যেতে পারে। সবাইকে দেবার পর নিজের শূন্য গেলাসটা ভরে নিলেন। তারপর বললেন, 'মজুরদের এরকম অশান্তির মধ্যে রাখার চেয়ে ওদের য়ুনিয়ন গঠন করতে দেওয়াটাই ভালো, য়ুনিয়ন হলে দু'পক্ষে আলাপ আলোচনা সহজ হতে পারে।'

টাওলার বলল, 'এ নিয়ে আমরাও আলোচনা করছিলাম'—এই বলে একটু থামল, তারপর এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে বলল, 'এই কোম্পানীতে কাজ করে চুল পাকিয়েছি। একবার য়ুনিয়ন করতে দিলে এদের তখন কে পায়! মাথায় চড়ে বসবে। আমরা আস্তে আস্তে আসল লোকগুলোকে হাত করার তালে আছি। দরকার হলে আমরা বলপ্রয়োগও করব। ঢিলে দিলে সর্বনাশ। এ বিষয়ে আমায় একটা স্বাধীনতা দিলে ভালো হয়। জিলাপসী ও টেইনস—দুজনের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। ওঁরা আমার সঙ্গে একমত। কি বলেন আপনারা?'

জিলাপসী লোকটা যেমন লম্বা চওড়া তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। সে গেলাস থেকে মুখ তুলে বলল, 'আমার ওপর যদি ভার থাকত আমি তাহলে একহাতে বন্দুক আরেক হাতে চাবুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম।'

টেইনস মানুষটা রোগা মতন—মুখখানা লম্বাটে। ঠোঁটের উপর একটা আঙুল দিয়ে টেইনস বলল, 'কেবল বুদ্ধির সাহায্যে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত। সেদিন দেখলেন তো—লাইট ইনফেন্ট্রির দল সার বেঁধে দাঁড়াতেই সব লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।'

মিঃ ফ্লেমিং বললেন, 'আপনাদের মতামত আমি সম্মান করি। কোম্পানীকে পরিষ্কার করে লিখেও জানিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই নীতি অশুদ্ধ। যদি কোম্পানী আমার কথা মেনে না নেন, তাহলে আমার পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভারতের লোকের মধ্যে চেতনা ক্রমেই বাড়ছে। রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তারা লড়তে পারে—এই রকম লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।'

'কী বললেন? এরা লড়বে? গান্ধীর লড়াই? সে যুদ্ধে একটা নেংটি ইঁদুরও মরবে না।' জিলাপসী বলল, 'এদের যুদ্ধকে যুদ্ধ বলে নাকি?'

মিঃ ফ্লেমিং-এর রাগ হল, তবু তিনি হেসে হেসে বললেন, 'আপনার একটু ইতিহাস পড়া উচিত।'

টাওলার বুঝল হুইস্কির ঝোঁকে জিলাপসী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। টাওলার বলল, 'নিশ্চয়, ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের অল্প। আপনি ইতিহাস পড়েছেন কেম্ব্রিজে। কিন্তু এই কোম্পানীর ইতিহাস আমি বোধহয় আপনার চেয়েও বেশি করে জানি। সেই যখন হাতীর সাহায্যে তেল নিষ্কাশন হত—তখন থেকে শুরু করে কোম্পানীর ধীরে ধীরে বড় হবার ইতিহাস আমি তন্ন তন্ন করে পড়েছি। ভারতীয় মজুর ও বিলেতের মজুরদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এরা এখনো রয়েছে সেই সামন্ততন্ত্রের যুগে। এদের মধ্যে ভেদ বিভেদ ঘটিয়ে আপনি বেশ ভালো করে শাসন করে যেতে পারেন। মিসেস ফ্লেমিঙের মতো আমি ফ্রাটার-নাইজেশন-এ বিশ্বাসী নই।'

মিসেস ফ্লেমিং তখন থেকে এক গেলাস হুইস্কি নিয়েও শেষ করতে পারেন নি, এবার তিনি একচুমুকে সবটুকু পান করে তাঁর গেলাসটা সশব্দে টেবিলের উপর রেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আমি ইংলণ্ডের মজুরও দেখেছি, এখানকার মজুরও দেখেছি। এরা কোনো অংশে হীন নয়, মানুষ সর্বত্র এক।'

মিঃ ফ্লেমিং শান্ত স্বরে বললেন, 'মিসেস ফ্লেমিং কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমিও কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি না। একথা অবশ্য আমি মানি যে সর্বদা মর্যাদার উচ্চ শিখরে থাকা চলবে না, মাঝে মাঝে নিচেও নাবতে হবে।'

টাওলার বলল, 'আপনারা নিশ্চয় শুনে থাকবেন, য়ুনিয়ন গঠনের জন্য মজুরেরা একটা দরখাস্ত দিয়েছে। এরকম দরখাস্তে অন্তত পক্ষে পনেরো জন সদস্যের সই থাকা দরকার। সই দেয়নি বলে দরখাস্ত ফিরে এসেছে। এইসব সামান্য কথা যারা জানে না, সেই সব মজুরদের কেউ যদি বিলেতের শ্রমিকদের সমান বলেন, আমার পক্ষে সে কথা মেনে নেওয়া একটু শক্ত হয়। এদের বেশির ভাগ অজ্ঞ নিরক্ষর, শতকরা মাত্র আট-দশ জন লেখা পড়া জানে।'

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'সেই জন্যেই তো এদের য়ুনিয়ন দরকার। তখন ওরা দাবী করে বলতে পারবে ওদের শিক্ষা দরকার।'

টাওলার এবার উঠে দাঁড়াল। মিঃ ফ্লেমিং এক বোতল স্যাম্পেন খুলে সকলের জন্য গেলাস ভরতে লাগলেন। টাওলার উঁচুগলায় বলল, 'আসুন, আর তর্ক নয়।

আমাদের অতি আনন্দের খৃষ্টমাস কেন পণ্ড করব বৃথা তর্কে ? আমাদের বিদুষী ও দয়াময়ী কর্ত্রী ঠাকরুনের কুশলে, আসুন আমরা একটু পান করি... ।'

মদ্যপান পর্বের শেষে সবাইকে মিসেস ফ্লেমিং ডেকে নিয়ে বসালেন ডাইনিং টেবিলে। চিকেন স্যুপ দিয়ে ডিনার শুরু হল, একে একে অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য পরিবেশিত হতে লাগল। আহারের ফাঁকে ফাঁকে সহজ ভাবে আলাপ চলতে লাগল।

মিঃ ফ্লেমিং নীরবে কাঁটা চামচ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখখানা লাল হয়ে গেছে, টাওলারের কথাগুলো ওঁর পক্ষে সহ্য করা শক্ত।

ঘরোয়া ব্যাপার এসে পড়ল কথায় কথায়। মিসেস টেইনস নাকি চিঠি লিখেছেন লণ্ডনে এবার হোয়াইট্ খৃষ্টমাস—খুব বরফ পড়েছে।

'কবে আসছেন তিনি ?' মিসেস ফ্লেমিং জিগ্যেস করলেন।

'এই শীতের মরশুমে নয়।' টেইনসের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'আপনার মতোই তিনি এদেশে আমাদের জীবনযাত্রা দেখে ভারি বিরক্ত। বলেন, বড় একঘেয়ে কৃত্রিম জীবন। আপনি ঠিকই বলেছেন, ভারতে আমরা ফরেন আনটাচেবেল্‌স।'

মিঃ টেইনস যে এইভাবে কথা বলছিলেন, সে কেবল মিসেস ফ্লেমিঙের মনের মেঘগুলো হাল্কা করার জন্য। কিন্তু মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'কথাটা কেবল বুঝলেই হবে না। গান্ধী যেমন এদেশে অস্পৃশ্যতা ঘুচাতে লেগেছেন, আমাদেরও তেমনি করে চেষ্টা করতে হবে দেশবিদেশের ভেদাভেদ ঘুচাতে। এই শহরের আশেপাশে যে সব বস্তি বা গ্রাম আছে, আপনারা জানেন না সেগুলি কী বিচিত্র, সেসব জায়গায় মানুষ কেমন সহজ সরল জীবন যাপন করে। আমি একটা রাত টংচু নাগা-দের একটা গাঁয়ে কাটিয়েছিলাম। ওদের জীবনটা যেন পিকনিক পার্টির মতো। আমাদের বাংলোবাড়ির জীবনের সঙ্গে সে জীবনযাত্রার তফাৎ আকাশ পাতাল। ওদের দেখে বুঝা যায় আমাদের জীবনটা কত কৃত্রিম!'

টেইনস গৃহকর্ত্রীকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, 'আর আপনি যে ড্রাইভারের বিয়েতে সাক্ষী হয়েছিলেন—তারা সুখে আছে তো ?'

'হ্যাঁ। ওদের ব্যাপারটা জানেন তো। কাজটা খুব ভালো হল।'

টাওলার বলল, 'জানি বৈকি। মেয়েটার বাপ নাকি কুকরী বের করেছিল। সেকথাটা সত্যি নাকি ?'

'কুকরী বের করেছিল ঠিকই। কিন্তু পরে বুঝেছিল...' মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'এখানকার মানুষেরা ভেতরে খুবই ভালো। ভালো ব্যবহার পেলে এরা নিশ্চয় আমাদের বন্ধু হবে। মিঃ টাওলার, আধুনিক কালে লেবার পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে কত তো বই বেরিয়েছে, তার দুয়েকটা আপনার পড়া ভালো। শ্রমিকদের সাইকোলজি না বুঝলে ওদের নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত।'

মিঃ ফ্লেমিং কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'আমার ধারণা মিঃ টাওলার ও বিষয়ে প্রচুর বই পড়ে থাকবেন, ডিয়ার।'

মিঃ টেইনস-এর সকল চেষ্টা বৃথা হল। মিসেস ফ্লেমিং-এর কথা শুনে অপর দু'জন জ্বলেপুড়ে উঠল। জিলাপসী মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'কিছু লোক পড়ে শেখে, কিছু ঠেকে শেখে। দুরকম শিক্ষা থেকেই অবশ্য সত্য লাভ হতে পারে। কিন্তু একটা কথা খুব ঠিক—এখানে থাকার ফলে আমার মতো লোকের মনেও এক ধরণের স্যাডিজম্ প্রবেশ করেছে। শুনি এইরকম মনোভাব নাকি প্রত্যেক প্রাক্তন সৈনিকের মধ্যে দেখা যায়। টাওলারও তো একজন প্রাক্তন সৈনিক।'

টাওলার হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তো ঘোরতর স্যাডিসট। মনটা যদি নরম হত কবে রিফাইনারীর চাকা বন্ধ হয়ে যেত। জীবনে কেবল একটা বিষয়ে যীশুকে মেনে নেওয়া শক্ত...'

মিসেস ফ্লেমিং এবার হাসতে হাসতে টাওলারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সেজন্য যীশু দোষী নন, দোষী হল খৃষ্টানেরা। এই শতকের মহাযুদ্ধ লাগিয়েছিল খৃষ্টানেরা, আবার যদি যুদ্ধ লাগে তো খৃষ্টানদের দোষেই লাগবে। খৃস্টান সত্যি কেউ যদি থাকেন, তো তিনি হলেন গান্ধী।'

মিঃ ফ্লেমিং বললেন, 'সে কথাটা আমিও বলি।'

টাওলার মুখ নিচু করে নিবিষ্ট হয়ে পুডিং খেতে লাগল। তাকে দেখে আর দু'জনাও।

হঠাৎ পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। 'মাপ করবেন' বলে মিঃ ফ্লেমিং বেরিয়ে গেলেন। তারপরে কেবল চামচের শব্দ শোনা গেল—কথাবার্তা আর শোনা গেল না।

লাঞ্চ-এর পর অতিথিদের কফি খেতে দিলেন মিসেস ফ্লেমিং, প্রশস্ত ব্যালকনিতে। সেখানেও সবাই গুম মেরে বসে রইল।

হঠাৎ দ্রুত পা ফেলে মিঃ ফ্লেমিং এসে পড়লেন ব্যালকনিতে। চোখে মুখে দারুণ একটা উৎকণ্ঠা, বললেন, 'নতুন খনিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার।'

ফ্লেমিং সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সকলেই কফির পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়াল, সকলেরই বিমর্ষ মুখ।

ফ্লেমিং আরো বললেন, 'আরো একটা খারাপ খবর ইতিপূর্বে আপনাদের বলতে পারিনি। পার্টিটা পণ্ড হবে মনে করেই খবরটা তখন দিইনি, কিছু মনে করবেন না। গ্যাস প্ল্যান্টে আগুন লাগবার উপক্রম হয়েছিল। চ্যাটার্জির এসফিক্সেশন হয়েছে। আগুন নেবানো হয়েছে।'

টাওলার বলল, 'কে চ্যাটার্জি? সেই একস্-টেরোরিস্টটা...?' তারপর মিসেস ফ্লেমিঙের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'ইংরেজ পুরুষেরা কেবল কাজ করেই মরে। আপনারা মহিলারা আছেন বলে এখনো খৃষ্টমাস আছে। ধন্যবাদ।'

একুশ

খনিতে বিস্ফোরণ ঘটাটা অভূতপূর্ব ঘটনাও নয়, চাঞ্চল্যকরও না। তবে বিরল ঘটনা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মাত্র একটাই ঘটল—খৃস্টমাস পার্টির কফি আধ কাপ খেয়ে সায়েবরা কেউই ঘটনাস্থলে এলেন না, হেড অফিসেই রয়ে গেলেন। একমাত্র দুঃসাহসিক টেইনস সায়েব ঘোড়া চড়ে, পকেটে রিভলবারটা নিয়ে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন।

এর কারণ হল সিং-জী। সিং-জী এসে টাওলারকে এমন একটা খবর দিলেন, সায়েবদের মনে শঙ্কা উপস্থিত হল। খবরটা এই যে চারজন লোক বিস্ফোরণের ফলে আগুনে পুড়ে মারা গেছে এবং রাজ্যের মানুষ গিয়ে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। সায়েবরা কেউ গেলে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা।

টেইনস-এর কিন্তু কর্তব্যবোধ জাগ্রত হল। ঘণ্টাখানেক পরে সে নতুন খনির কাছে গিয়ে পৌঁছল। সে গিয়ে দেখল সম্পূর্ণ অন্যরকম দৃশ্য। জনতার মনে রোষের চিহ্নমাত্র নেই, যা আছে তা হল অপঘাত মৃত্যু-জনিত শোক। সায়েব ঘোড়া থেকে নেমে গিয়াসুদ্দীনের খোঁজ করলেন। একজন পিওনকে ডেকে ঘোড়াটা জিম্মা করে দিলেন। গিয়াসুদ্দীন দৌড়ে এলেন, টেইনস দেখল তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা।

টেইনস-এর মুখেও বিষাদের ছায়া। নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

গিয়াসুদ্দীন চোখের জল মুছে দুর্ঘটনার বর্ণনা দিল। নূতন পাম্প বসাতে গিয়ে যতটা সাবধান হওয়া উচিত ততটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। টেইনস সায়েব চলে গেল পার্টিতে, গিয়াসুদ্দীনের কাজে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। তখন ওদের অনুপস্থিতিতে কিছু একটা ঘটে থাকবে। হঠাৎ গ্যাসে আগুন লেগে গেল, সে আগুন চোখের পলকে আকাশচুম্বী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে ডেরিকের তলায় পড়ে গেল। হোস পাইপ দিয়ে জল ঢেলে আগুন নেভাবার চেষ্টা করা হয়েছে, আগুন এখন স্তিমিত, যদিও শিখা এখনো জ্বলছে। এই শিখা নেভাতেও বেশ সময় নেবে।

টেইনস বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। মারা পড়ল কে কে?'

গিয়াসুদ্দীন জবাবে বলল 'আইম্যা...।'

টেইনস বলল, 'ও সেই বার্মিজ লোকটি? ভারি ভালো লোক ছিল। এখানে তো সে কাজ করছে গত চার বছর ধরে—না?'

টেইনস নোটবুক বের করে আইম্যার নাম লিখে নিল।

'আর কে কে?'

'রামু...'

'রামু! মাই গড! দি সিম্পল সোল: আই অ্যাম রিয়েলি সরি।'

টেইনস নোটবুকে এবার রামুর নাম লিখল।

গিয়াসুদ্দীন বলে চলল, 'করিম আর লাল সিং...'

টেইনস জিগ্যেস করল, 'জোগানদার দু'জন ?'

'হ্যাঁ'।

টেইনস নোটবুকে বাকি নাম দুটোও লিখে নিল। তারপর জিগ্যেস করল, 'তাহলে গ্যাসে আগুন লেগে যাবার ফলেই অগ্নিকাণ্ডটা হল ?'

'হ্যাঁ।'

টেইনস গিয়াসুদ্দীনের কথাগুলো লিখে নিল। তারপর ঘটনাস্থলের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে শিখা নেভানোর কথা আলোচনা করল। 'শিখা সম্পূর্ণ নেভানো খুব কঠিন কাজ, তার জন্য হয় তো লণ্ডন থেকে কোনো বিশেষজ্ঞ আমদানী করতে হবে। ইতিমধ্যে সেখানে কি ব্যবস্থা করা যায় ? জল ঢালা বন্ধ করা চলবে না, কিন্তু কেবল তা করলেও সুরাহা হবেনা, অন্য উপায়ের কথাও বিবেচনা করতে হবে।'

টেইনস বলল, 'আমি তো মিঃ ফ্লেমিঙের বাংলোয় বন্দী ছিলাম। কিন্তু তোমার কি হয়েছিল গিয়াসুদ্দীন ? তুমি তো কোনো দিন কাজে দেরি করে আস না।'

গিয়াসুদ্দীন জবাব দিল, 'বাড়িতে অসুখ, আমি এখানে একবার হাজিরা দিয়েই ঘরে ফিরে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। কাল রাত্তিরে সব কাজ ঠিক মতোই চলেছিল, ভোর হবার সময় গণ্ডগোলটা বাধল।'

টেইনস চুপ করে রইল।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'মৃতের জন্য তো কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

'দিতে তো হবেই। কিন্তু জীবন গেলে ক্ষতি কি কখনো পূরণ হয় ? উপরন্তু টাওলারের হাত দিয়ে তেল গলে না। তুমি একটা নোট ভালো করে লিখে দিও।'

অদূরে প্রায় একশোজন মজুর উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিল। কী বলছিল তার প্রতি টেইনস একেবারেই কান দিল না। ওরা কোম্পানীকে গালাগাল দিচ্ছিল, কোম্পানীকে গাল দেওয়া মানে কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ সায়েবদের গাল দেওয়া। সেই সব গালাগাল কী রকম হতে পারে, সেকথা না বললেও চলে। মজুরদের ধারণা সায়েবরাই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী—ওদের যন্ত্রপাতির দোষত্রুটি, তাছাড়া ঠিকমতো তদারকির অভাবটাও একপ্রকার অপরাধ।

হঠাৎ উর্ধশ্বাসে বরুয়া এসে উপস্থিত। এসেই গিয়াসুদ্দীন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি এখানে থাকতেই জাহানারাবৌদি একবার মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন—বিস্ফোরণের কথা শুনে। নিরুপায় হয়ে পান্না আমাকে ও আহমদ সাহেবকে খবর দিয়েছিল। আহমদ সাহেব ডাক্তার ডাকলেন। তারপর ডাক্তার এম্বুলেন্স আনিয়ে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তারপর কি হয়েছে জানি না। আহমদ সাহেব সেখানে আছেন।'

টেইনস বরুয়ার কথাগুলো ধরতে পারেনি। বরুয়া তাই আরেকবার ইংরেজীতে সব ঘটনার কথা বললেন। টেইনস গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, 'তাহলে

গিয়াসুদ্দীন, তুমি দেরী না করে এখুনি হাসপাতাল চলে যাও। এখানে আমি থাকব। শিখাটা নেভাতে সময় লাগবে।'

গিয়াসুদ্দীন বরুয়াকে জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার কি কিছু বলেছেন আপনাকে ? অসুখের কথা ?'

'রক্ত পরীক্ষা করে ওদের সন্দেহ হয়েছে টাইফয়েড।'

টেইনস জিগ্যেস করলেন, 'টাইফয়েড ?'

বরুয়া বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তবে তো ভালো শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হয়। কাজের কথা ভুলে যাও, গিয়াসুদ্দীন। স্ত্রীর কাছে চলে যাও, বোধহয় তোমার খোঁজ করছেন।' টেইনস বললেন।

টেইনস এবার মৃতদেহগুলি দেখতে গেলেন।

মজুরেরা শবদেহ নিয়ে যাবার জন্য চারখানা চ্যাং তৈরি করে এনেছে। শবদেহগুলি আর দেহ নয়, সংকুচিত মাংসপিণ্ড মাত্র। বামুন পুরুত, মৌলভী ও মঠের ভিক্ষুকে খবর পাঠানো হয়েছে। রামু ও লালসিং-কে চিতায় তুলতে হবে হিন্দু প্রথায়। করিমকে নিয়ে যেতে হবে গোরস্থানে। আইম্যাকে দাহ করতেই হবে, কিন্তু বৌদ্ধ প্রথায়।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এদের শ্মশান ও গোরস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থাটা তাহলে আপনিই তদারকি করুন, বরুয়া। আমি তাহলে যাই! জাহানারার অবস্থার কথা শুনে আমার বুকটা যেন কেমন করছে। কী যে হল কিছু বুঝতে পারছি না।'

বরুয়া বললেন, 'চিন্তা করে কি হবে ? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মনের সহজ সান্ত্বনার ভাষা।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ক্ষতিপূরণ দেবার কথা পেড়েছিলাম টেইনস-এর কাছে। টাওলারের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে। য়ুনিয়ন তো এখনো হল না। মালা সিং দরখাস্তখানা ঠিক মতো পূরণ করে পাঠায় নি। পনেরোজন সদস্যের সই দেওয়ার দরকার ছিল। শিলং থেকে ফিরে এসেছে। আবার সাধারণ সভা ডাকতে হবে কিন্তু সে সভা হয়তো ডাকতে হবে নেহরুজী আসার পর। এই ক'টা দিন তো প্রচণ্ড হৈচৈ চলবে।'

'হ্যাঁ। নেহরুজী আসতে আর বেশি দিন নেই। এদিকে একটা খবর শুনলাম। আসামে কংগ্রেস-কোয়ালিশন সরকার হয়ে গেছে। সে জন্যে এবার য়ুনিয়ন রেজিস্ট্রি করা সহজ হবে। সুভাষ বসু নাকি এসেছিলেন। শ্বশুরমশায় চিঠি লিখেছেন। শিলং-এ নাকি হুলুস্থুল কাণ্ড—এক পক্ষের সদস্য অপর পক্ষের সদস্যকে নাকি গোপনে স্থানান্তর করেছিল—নিজের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যে। যোরহাটের একজন ভদ্রলোক সাদুল্লা সাহেবের পক্ষের একজন সদস্যকে নিয়ে নাকি ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝখানে নিজের স্টীমলঞ্চে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এম. এল. এ. চুরি করাটা প্রায় নারীহরণের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সে যাই হোক না কেন, বোধহয়

কংগ্রেস সরকার হল ; গোপীনাথ বরদলৈকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করে। আমার বুড়ো শ্বশুরের মনে ভারি ফূর্তি!'

'তা তো হবেই। কিন্তু সরকার হলে তো আর পেট ভরবে না। কার্যক্ষেত্রে এখন কেমন হয়, সেটাই দেখতে হবে।'

গিয়াসুদ্দীন চলে গেলেন। বরুয়া গেলেন চ্যাং বাঁধার কাজ দেখতে।

মাংসপিণ্ডগুলি চ্যাঙের উপর তোলা হতেই, উপস্থিত সকলের মন বিষাদে ভরে গেল। শহরে এমন কাণ্ড আগে খুব কমই ঘটেছে।

শ্মশান ও গোরস্থান পাশাপাশি। সেদিক পানে চলল বিরাট একটা শোভাযাত্রা। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে আইম্যা, রামু কিংবা দু'জন জোগানদারের অন্ত্যেস্টিক্রিয়া দেখতে এরকম জনসমাগম নিশ্চয় হত না। কিন্তু এই বিস্ফোরণ যেন সমস্ত শহরের বিবেককে আঘাত হেনেছে। জীবনের কি মূল্য আছে এই শহরে? সকলের মনে আশঙ্কা। মৃতদের প্রতি সকলের সুগভীর সহানুভূতি– মরে গিয়েও এতটা সহানুভূতি লোকে কদাচিৎ পায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল লছমীর শ্মশানে এসে রামুকে চিতায় তোলা দেখা। সচরাচর মেয়েরা শ্মশানে যায় না। কিন্তু লছমী যেন দিন দিন বেশি বেশি স্বাধীন হতে শুরু করেছে। আগের মতোই এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়ায়, স্বভাবটাও আগের মতোই রঙ্গিনী। ওর হাবভাব চালচলন যেন অনেকটা বড় সায়েবের মেমের মতো। মেয়েমানুষ এভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে—এটা ইসমাইলের ভালো লাগে না। কিন্তু লছমীকে সামলানেওয়ালা পুরুষ যেমন হওয়া দরকার, ইসমাইল সেরকম নয়। সে যেন ক্লান্ত অবসন্ন। আজ লছমী তোড়া বেঁধে এনেছে একরাশ সাদা গোলাপ, রামুর শবদেহে দেবার জন্যে। কারণটা কারোরই অজানা নয়—সবাই জানে, এক সময় রামু লছমীকে ভালোবাসত। এ ফুল সেই ভালোবাসার প্রতিদান।

আরো অনেকেই ফুল এনেছিল—তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মিসেস ফ্লেমিং। গোলাপ ও পাইনসেটিয়া ফুলে তিনি পরলোকগতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, অনেকক্ষণ ধরে চিতা সাজানো ও কবর দেবার প্রস্তুতিও লক্ষ্য করলেন। দুয়েকটা ছবিও তুললেন। প্রত্যেকটি মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য বিশ টাকা করে চাঁদাও দিয়ে গেলেন।

সায়েবদের কেউ আসেনি, কেবল এসেছিলেন এই অসাধারণ মেমসায়েবটি। সাক্ষাৎ যেন করুণাময়ীর অবতার। তাঁকে দেখে সকলের মুখে একটা শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল—এমন একজন মেমসায়েব ইতিপূর্বে এই শহরে পা দেননি।

কেন এসেছেন মেমসায়েব? কেউ বলল কৌতূহলের বশে। কিন্তু শুধু কৌতূহল নয় তার সঙ্গে করুণাও বিমিশ্রিত। অন্য কয়েকজন বলল যে কালা আদমীর প্রেমে না পড়লে এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কেউ শ্মশানে কাটাতে পারে না।

আরো একটা আশ্চর্য কাণ্ড করছেন মেমসায়েব— নয়নমণির সঙ্গে গান শিখছেন,

হিন্দী গান, নেপালী গান, অসমীয়া গান। এইসব গানের বিষয়ে একটি বইও লিখছেন, খুবই বিদুষী মহিলা—বিলাতের সবচেয়ে প্রখ্যাত কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো করে পাশ করা ছাত্রী। শহরের সায়েবদের কাউকে গ্রাহ্যই করেন না—উলটে বরঞ্চ ওদের শেখাতে পারেন। নয়নমণিকে ইংরেজী শেখাচ্ছেন। একদিন নাকি প্রধানের স্কুলে গিয়ে বলে এসেছেন মেয়েকে ক্ষমা করতে, বলেছেন দিনকাল বদলে গেছে, ছেলেমেয়েকে আগেকার দিনের মতো ধরে বেঁধে রাখার কোনো অর্থ হয় না। প্রধান নাকি আগের চেয়ে একটু নরম হয়েছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মেমসায়েব নয়নমণির সঙ্গে স্বাধীনতার গান গাইতে লেগেছেন—কংগ্রেসের গান। মেমসায়েবের মুখে কংগ্রেসের গান—সারে জহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা। শোনা যাচ্ছে যে নেহেরুকে বাংলোবাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াবেন। অভিনব ব্যাপার!

বাইশ

জাহানারা পুরো পাঁচ ঘণ্টা পরে হাসপাতালে চেতনা লাভ করল। বরুয়ার স্ত্রীর গত তিন দিন ধরে প্রসব বেদনা চলছে। এই দুটো খবরের চেয়ে বড়ো খবর—কে একজন নাকি নূতন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বরদলৈ-এর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে: কোম্পানীর খনিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে চারজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তাদের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

কে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে টাওলার তা জানতে পারলেন--স্থানীয় কংগ্রেসের সভাপতি, গোস্বামী। সায়েব রাগে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সরকার আসল খবর চেয়ে কোম্পানীর কাছে টেলিগ্রাম করলেন। সেই তার পেয়ে টাওলার লিখল—'মাইনর কেসেস্ অব একসিডেন্ট। সাম আনঅ্যাভোয়েডেবল্ ডেথস্। ডিউ মেডিকেল এটেনশন গিভেন।' ডিগবয়-শিলং-এর মধ্যে আরো কয়েকটা টেলিগ্রামের আদান প্রদান হল। শেষে শ্রমিকদের হয়ে মালা সিং একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন—'কোম্পানিস্ স্টেটমেন্ট ফল্‌স। সীরিয়স এক্সিডেন্ট অকারড ইন ফিল্ডস্। ফোর কমপ্লিটলি বার্নট আপ। আনাদার এক্সিডেন্ট ইন রিফাইনারী গ্যাস প্ল্যানট হসপিটালাইজড। প্রে ডিটেইলড এনকোয়ারি।'

হাসপাতালে পড়ে আছেন জাহানারা, বরুয়ার স্ত্রী ও চ্যাটার্জি। জাহানারা সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে। বরুয়ার স্ত্রী এখনো প্রসব বেদনায় ভুগছে। চ্যাটার্জির হার্ট এখনো একটু দুর্বল, তবে এখন বই পড়তে পারছেন।

চণ্ডী এসেছিল—চ্যাটার্জিকে বলে গেল সায়েবদের অনাচারের কথা। গিয়াসুদ্দীন

গিয়েছিলেন টেইনস-এর কাছে কম্পেনসেশনের ব্যাপারটা আলোচনা করার জন্য। গিয়ে দেখেন টেইনস নেই—পিকনিক করতে বেরিয়েছে। অফিসে ফাইল পর্যন্ত চালু করে যায়নি। আর টাওলার নাকি কানও পাতেনি।

মালা সিং এসেছিলেন চ্যাটার্জিকে দিয়ে একটা প্রচারপত্রের মুসাবিদা লেখানোর জন্য। নেহরুজীর আসবার খবরটা বিশদ ভাবে শহরের লোককে জানানো দরকার। তিনি এসে বলে গেলেন সায়েবদের মধ্যে মতভেদের কথা। বিস্ফোরণের বিষয়ে টেইনস যে রিপোর্ট দিয়েছিল এবং গিয়াসুদ্দীন যে নোট দিয়েছিলেন, টাওলার দুটোর কোনোটাকেই গুরুত্ব দেয়নি। অচল অবস্থা।

আহমদ সায়েব এসেছিলেন জাহানারার খবর নিতে। যাবার সময় একটা সাংঘাতিক খবর দিয়ে গেলেন—একান্ত গোপনীয় খবর। বড সায়েব নাকি পদত্যাগ করতে চান। কোম্পানীর কাছে নিজের মনের কথা লিখেছেন। টাওলার উদার নীতি পছন্দ করে না, সে দমন নীতির পক্ষপাতী। সুতরাং সত্বর একটা সংঘর্ষ বাধতে বাধ্য। এইসব দেখে শুনে গ্যাস প্ল্যান্টের অগ্নিকাণ্ড ও খনির বিস্ফোরণ এই দুটো দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে, বড় সায়েব গভীর দুঃখে পদত্যাগ পত্র দাখিল করছেন।

বড়সায়েব চলে যাবার অর্থ, শ্রমিকে-মালিকে সংঘর্ষ। অগ্নিকণা থেকে খাণ্ডব দাহন।

তারপর এল পান্নু। অনেক খুচরো খবর এনেছিল পান্নু। লছমী আবার সিং-জীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করেছে। ইসমাইল লজ্জায় ম্রিয়মান। একদিন পান্নুদের বাড়িতেও এসেছিল লছমী। পান্নু ওকে ধমকে দিয়ে বলেছে 'পোড়ারমুখী, বিয়ের পর এরকম বাধনছেঁড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে নেই। খুব ভাগ্যি, এরকম একটা ভালো মানুষ স্বামী পেয়েছিস।' কিন্তু ওর সেই রসরঙ্গিনী স্বভাব, কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না।

নয়নমণি নাকি একদিন মায়ের কাছে গিয়েছিল। পান্নুও গিয়েছিল দাদার শ্বশুর বাড়ি। দুর্গার সাহস হয়নি যেতে। চণ্ডী ওকে ক্ষমা করেছে, কিন্তু প্রধান এখনো করেনি। প্রধান নয়নমণিকেও ক্ষমা করেনি। সেই জন্যেই মায়ের কাছে গিয়েছিল এমন এক সময়, যখন ওর বাবা ঘরে ছিলেন না। মা তো কেঁদেকেটে পাগলের মতো হলেন—হাজার হোক ওদের তো ওই একটিমাত্র মেয়ে। পান্নুর মুখে নয়মমণির প্রশংসা শুনে বিরক্তি লাগছিল চ্যাটার্জির। পান্নু বলে কি নয়নমণি নাকি বড সায়েবের মেমের সঙ্গে সমানে সমানে কথা কয়, একতালে পা ফেলে চলে, আজকাল নাকি ইংরেজীও বলে দুচারটা কথা। দুর্গার চালচলনও অনেকখানি বদলে গেছে। আজকাল ওদের কোয়ার্টারে খাবার টেবিল এসেছে, পিঁড়ি পেতে আর খায় না। মেমসায়েব একটা হারমোনিয়ম উপহার দিয়েছেন।

বরুয়ার স্ত্রী অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছে। ডাক্তার চিন্তিত। বরুয়ার কিন্তু দেখাই নেই।

নেহরু-অভ্যর্থনা কমিটির কাজে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেইজন্যে পান্নুকেই বরুয়ার স্ত্রীর দেখাশুনো করতে হয়।

জাহানারা বৌদি ভারি বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছে—একটা 'জিন' এসে সর্বদা নাকি ওকে ডাকে। জাহানারা বলে ওর উপর শয়তানের চোখ পড়েছে। জ্বর ওর লেগেই থাকে—ছাড়ে না।

পান্নু যখন চ্যাটার্জির কেবিনে এল, তিনি তখন একটা বই পড়ছিলেন। এখনো তিনি সহজে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন না। চোখে একটা বেদনা অনুভব করেন—মাথাতেও একটু একটু। পান্নুর খবরগুলো শোনার জন্য তিনি বইখানা সরিয়ে রেখেছিলেন বিছানার ওপরেই। কথা শেষ হতেই আবার তিনি বই খুললেন।

পান্নু ঝট করে বইখানা কেড়ে নিয়ে বলল, 'চোখে এখনো যতটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে পড়ে পড়ে তাও যাবে। রেখে দিন বই।'

বই ছাড়তে চ্যাটার্জির কষ্ট হলেও, পান্নুর আত্মীয়তার সুরে উনি মুগ্ধ হলেন, 'চোখ থাকতে যদি না পড়াশুনো করি, চোখ দুটো গেলে কি পড়াশুনো করব?'

'কিন্তু বই পড়ে কী এত ভালো লাগে! সামনে মানুষ বসে থাকলেও টের পান না। মাঝে মাঝে অনেক সময় আমি এখানে চুপচাপ এসে বসে থাকি, আপনি জানতেও পারেন না। এমনটা হয় কেন?'

'কারণ কিছু নেই, সুতরাং কারণ দর্শিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তোমায় এই চোরের মতো কেবিনে ঢুকে, চুপচাপ আমার বই-পড়া দেখার ব্যাপারটা তো ভালো নয়।'

'এই শহরে বই-পড়া মানুষ স কম যে দেখলে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।' পান্নুর মুখে একটা মৃদু হাসি।

'তার কারণ তুমি নিজে এখনো ভালো করে লেখাপড়া শেখোনি। শিখলে দেখতে নিরক্ষর লোকদের ভালো লাগে বেশি।' চ্যাটার্জি বললেন।

'একেবারে নিরক্ষরকে, না অক্ষর পড়তে পারে এই রকম লোককে? আপনি তো ভালো করে লেখাপড়া শিখেছেন, আপনার কাকে ভালো লাগে?'

চ্যাটার্জি 'নিরক্ষর' অর্থে ভারতের সর্বহারাদের কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন, পান্নু যে সে কথাটা ঘুরিয়ে নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারে—তিনি তা ভাবতে পারেন নি। এমন করার কারণটা বুঝতে চ্যাটার্জির খুব বেশি বেগ পেতে হল না। হাসপাতালে ঢোকার পর থেকে পান্নু নিত্য আসে তাঁর কাছে। কোনো প্রকারে চ্যাটার্জিকে যদি যৎসামান্য সাহায্য করতে পারে, তাহলে আনন্দে আত্মহারা হয়। এই আনন্দের উৎস যে চ্যাটার্জির সান্নিধ্য, তা নিয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

পান্নু অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে চ্যাটার্জির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ওর প্রশ্নের একটা জবাব আশা করে। চ্যাটার্জিও পান্নুর মুখ থেকে নিজের চোখজোড়া সরিয়ে

আনতে পারছিলেন না। কতক্ষণ ওরা পরস্পরের দিকে এভাবে তাকিয়েছিল, তা ওরাও জানে না। হঠাৎ পান্না বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেবরা আসছেন, যাই।'

'কেন ?'

উত্তর দেবার জন্য পান্না আর তখন সেখানে ছিল না। কিন্তু পান্না চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবটা পেলেন। অনুভব করলেন, স্থির দৃষ্টিতে দেখা পান্নার সেই মুখখানা যেন ওঁর হৃদয়ের পটে চিত্রিত হয়ে আছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকবার পর তিনি আত্মস্থ হলেন।

একটু বাদেই পান্না আবার এল—মুখখানা যেন মেঘে ঢাকা।

চ্যাটার্জি এবার বিছানার উপর উঠে বসলেন। পান্না বলল, '২-জন ভিন্ন জাতের' মানুষ। বরুয়াবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কত ভাব। স্বামী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত যন্ত্রণা যেন উবে গেল। তারপর কত কথা ২জনায়। ওদিকে গিয়াসুদ্দীন সাহেব একেবারে অন্য ধরণের মানুষ। বসে আছেন। জাহানারা বৌদি কথা বলতে চায়—কিন্তু কেন যেন কিছুতেই বলতে পারে না। দুজন যেন কোথাকার কে...'

চ্যাটার্জি বললেন, 'আচ্ছা পান্না, জাহানারা বৌদি আজকাল স্বামীর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছে তো ?'

'না। সময় কোথায়, অবসর কোথায় ?' —আরো কী যেন একটা কথা বলতে গিয়েও পান্না বলতে পারল না। সে কথাটা বলা শক্ত। গিয়াসুদ্দীন সাহেব স্ত্রীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলেন না। জাহানারা সর্বদা বলে, 'আমায় নিয়ে উনি সন্তুষ্ট নন। ওঁর মনে যেন অন্য একটি মানসী প্রতিমার ছবি আঁকা আছে। সেই কল্পনার প্রেয়সীকে তিনি যে কখনো পাবেন না তাও তিনি জানেন।' পান্না বলে চলল, 'উনি এটাও জানেন যে জাহানারার সঙ্গেই তাঁকে ঘর সংসার করে যেতে হবে। ওদের প্রেম দুর্বল মুহূর্তের প্রেম। মাধুরী ছিল অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্মে খুব নিপুণ, কিন্তু বন্ধ্যা। গিয়াসুদ্দীনের সন্তানস্পৃহা মনের মধ্যে অপূর্ণ হয়ে ছিল বলে তিনি মাধুরীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলেন। সেই সময়ে জাহানারার সঙ্গে ওঁর দেখা। জাহানারা অঙ্গ সৌষ্ঠবহীন নিতান্তই মাঝারী ধরণের মেয়ে। কিন্তু তার মুখে ছিল একটা স্নিগ্ধ সরলতা, তা ছাড়া লেখাপড়ায় সে ছিল মেয়েদের মধ্যে অনেকখানি অগ্রসর। গিয়াসুদ্দীন সাহেবের প্রয়োজন ছিল এমন একটি মেয়ের যে সন্তানবতী হতে পারে। সেই জন্যই তিনি ওর পাণিগ্রহণ করলেন। জাহানারা সেই কথা বুঝেছিল। তাই গর্ভবতী হবার সঙ্গে স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে পেতে চেয়েছিল, স্বামীর কঠিন অন্তরকে একটু গলাতে চেয়েছিল। ঠিক সেই সময় ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার ফলে বেচারার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। জাহানারার ভালোবাসবার শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি সে ব্যবহার করার সুযোগ পেল না।'

চ্যাটার্জি শুধোলেন, 'তা হলে তিনি খুবই কষ্টে আছেন।'

'খুব !'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জির মনের বন্ধ দুয়ার যেন মুক্ত হয়ে গেল। নারী-

পুরুষের সমস্যার ভিতরে কোনো দিন তিনি প্রবেশ করেননি। বেচারা আইম্যা আর নেই—সে তাঁকে বলেছিল, নারীসঙ্গসুখ সে কেমন সহজভাবে গ্রহণ করে। পান্নুর এই কাতরোক্তি শুনে তাঁর মনের সুপ্ত কামনা যেন জেগে উঠল।

কিন্তু নারী তাঁর পক্ষে এখনো রহস্য ও কৌতূহলের বিষয়।

পান্নু মৃদু হেসে বলল, 'এইসব কথা শুনে আপনার খুব খারাপ লাগে হয়তো। আপনাকে কিন্তু আমার খুব উদাসীন মনে হয়, মনে হয় সংসারে আপনার কোনো আগ্রহ নেই।'

'না, আমি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন হতে যাব কেন? তবে কি জানো পান্নু, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে—সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই আমি বেঁচে আছি। দেশ স্বাধীন করতে হবে। য়ুনিয়নটা গঠিত হলেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব—আরো অন্য কাজ করতে হবে। সেইজন্যে ইচ্ছা থাকলেও মেয়েদের কাছা কাছি ঘেঁষতে চাই নি '

পান্নু হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার বুঝি ভারী ভয়, মেয়েরা আপনার কাজ পণ্ড করবে? যার সঙ্গে আপনার মনের মিল হয়, তেমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে কাজ শুরু করে দেখুন তো,—দেখবেন কাজ কেমন অগ্রসর হয়। এখন যদি এক পা এগোতে পারেন, তখন দু'পা এগিয়ে যাবেন।'

'তেমন মেয়ে আছে নাকি?'

'থাকবে না কেন? খুঁজতে জানা চাই।'

'সেইটাই তো শক্ত। প্রত্যেক মেয়েই ঘরগেরস্থালী পাততে চায় সংসার মানেই ছেলেমেয়ে টাকাপয়সা। এই সবই তো বন্ধন।'

'আপনি একেবারেই কিছু জানেন না দেখছি, তা না হলে এমন কথা বলবেন কেন? আপনি মেয়েদের চিনতেই জানেন না·· '

চ্যাটার্জি হাসতে লাগলেন, 'তোমায় কাছে পেলাম যখন, এবার হয়তো জানতে পারব, আর...'

'সত্যি বলছেন? পান্নু হেসে হেসে শুধোল।

'হ্যাঁ'।

☐

রোগীদের দেখতে দেখতে ডঃ রঞ্জিত পাঠক ঢুকলেন চ্যাটার্জির কেবিনে। তিনি এসে ভালো করে ওঁর বুকটা পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, 'আজ বুঝি খুব কথা বলেছেন? কথা একটু কম বলাই ভালো।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেন, ভালোই তো আছি।'

'ভালো আছেন ঠিকই। কিন্তু সাবধানে থাকা ভালো।' এই বলে ডাক্তার পান্নুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পান্নু নাকি আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়েছে, সত্যি না কি?'

পান্না লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না, বলল, 'একটু আধটু লেখাপড়া করি। কিন্তু সে পড়ায় কি হবে? তাতে আবার দুজন মাস্টারই এখন হাসপাতালে।'

ডাক্তার হাসতে লাগলেন। কুচকুচে কালো মুখে কুতকুতে কালো চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'তোমার কি নার্সিং শেখার শখ আছে?'

পান্না বলল, 'আছে বৈকি।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি তোমার নামটা পাঠিয়ে দেব। আমাদের হাসপাতালে নার্সদের সংখ্যা খুবই কম। ডিব্রুগড়ের স্কুলে পড়ে আসতে পারবে।'

পান্না যেন হাতে স্বর্গ পেল। জেবউন্নিসা নার্সিং শিক্ষার জন্য ডিব্রুগড়ে যাবার পর থেকে, পান্না মনে মনে একটা আশা পোষণ করছিল, যদি সেও যেতে পারে। তাছাড়া একটা কোনো জীবিকার কথাও ভাবছিল সে। আজ হঠাৎ ডাক্তারের কথা শুনে হাতে যেন স্বর্গ পেল। ডাক্তার বললেন, 'কাল একবার আমার অফিস-ঘরে দেখা কোরো। ট্রেনিং কোর্স শুরু হতে অবশ্য দেরি আছে।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। চ্যাটার্জি বললেন, 'তুমি কেন নার্স হতে যাবে?'

'কেন?' প্রশ্ন শুনে পান্না আশ্চর্য হল, 'চিরকাল আপনার ছাত্রী হয়ে থাকতে হবে নাকি?' পান্না মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

'সেও তো ঠিক। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'তোমায় নার্স হলে ঠিক যেন মানাবে না...'

পান্না হেসে বলল, 'তাহলে কারো গিন্নী হলে মানাবে—এই তো? কিন্তু আমার মতো হতকুচ্ছিত মেয়েকে কে বিয়ে করতে চাইবে?'

চ্যাটার্জি শুধোলেন, 'তুমি সত্যিই কি কাউকে বিয়ে করবে?'

পান্না এবার চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে, আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল, 'থাক, অপরের বিয়ের কথা ভেবে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পারেন তো নিজের জন্য একটি পাত্রী সন্ধান করে নিন, আপনার একজন দরকার।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'আমার একটি পাত্রী দরকার—সে তুমি কেমন করে জানলে?'

পান্না হেসে বলল, 'আপনার মুখ দেখে আন্দাজ করতে পারছি...'

চ্যাটার্জি এবার যেন ধরা পড়ে গেলেন। তিনি আর কিছু বললেন না, কিন্তু পান্নার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পান্না ঠিকই আন্দাজ করেছে, পান্নাকে তিনি বধূ রূপেই দেখেছেন মনে মনে। এতদিন যে মেয়ে অচেনা ছিল, তাকে নিতান্ত কাছের থেকে চেনা যাচ্ছে যেমন, তেমনি চেনা যাচ্ছে অন্তরের গভীরে। হৃদয় যেন হয়ে গেছে পান্নাময়। কিন্তু...

□

পান্না জাহানারাকে কমলালেবুর রস করে খাওয়াচ্ছিল। কিন্তু অসাবধানে হাতের ফিডিং কাপটা মেঝের উপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

'কি হল তোর পান্নু?' ক্ষীণ স্বরে জাহানারা জিজ্ঞেস করল। ওর সারা মুখখানা ভালো করে দেখার পর জাহানারা হাসতে হাসতে বলল, 'এতক্ষণ বুঝি চ্যাটার্জির কেবিনে ছিলি?'

পান্নু এবার একটা গেলাসের মধ্যে কমলালেবুর রস চিপে চিপে বের করছিল। ওর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, জাহানারার দিকে মুখ তুলে ও চাইতে পারল না। রস বের করা হয়ে গেলে পর, গেলাস থেকে চামচ দিয়ে রস খাওয়াতে লাগল জাহানারাকে। প্রতিদিন এই সময়ে পান্নু জাহানারাকে একটা প্রশ্ন করে, 'আজ কি কথাবার্তা কিছু হল?' আজ সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না।

জাহানারার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, একটু বাদে বলল, 'কই, আজ তোর প্রশ্নটা করলি না যে বড়ো?'

পান্নু রসটুকু খাইয়ে গেলাসটা টেবিলের উপর রাখল। তারপর তোয়ালে দিয়ে দুর্বল রক্তশূন্য মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'জানি আপনার চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। কিন্তু আজ কি কথা হল, বলুন।'

জাহানারা বলল, 'আজ অনেক কথা বললাম! বুকটা যেন একটু পাতলা হল। হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসার কথা বললাম। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। মুখের ভাবটা দেখে মনে হচ্ছিল ছোট্ট একটি খোকা যেন! কিন্তু কীসব কথা বলেছি, তা আবার শুনো বলতে চাইনা। শুধু একটা কথা ওঁকে জানিয়ে রেখেছি। আমার যদি কিছু হয় তা হলে তোকে ওঁর দেখাশুনো করতে হবে...'

জাহানারার চোখে জল।

পান্নু তোয়ালে দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বলল, 'আমায় দেখাশুনো করতে হবে? সে কাজ আমার দ্বারা হবে না। আপনাকেই বেঁচে থাকতে হবে। এত শত ভাবছেন কেন?'

'না, না, তোকে আমার কথা রাখতে হবে পান্নু। উনি তো একটা শিশুর মতো।'

পান্নুর বুকখানা দুরু দুরু কেঁপে উঠল। জাহানারার চোখে একটা গভীর অনুনয়। গিয়াসুদ্দীন সাহেবের ভার নিতে হবে ওকে! সে কি সম্ভব? গিয়াসুদ্দীন সাহেবের দেখাশুনো করবে পান্নু?'

পান্নুর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

'তুই কাঁদছিস কেন পান্নু? তুই ছাড়া কে আমার আছে?'

জাহানারার কথা শুনে পান্নুর চোখের জল আবার উপচে পড়ল।

জাহানারা বলে চলল, 'তোকে বুঝতে আমার বাকী নেই পান্নু। তুই গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে যতটা ভালোবাসিস, যতটা ওঁকে জানিস, তেমন কেউ জানে না।'

পাশের কেবিন থেকে একটা অন্যরকম যন্ত্রণার ধ্বনি ভেসে এল—প্রসব বেদনার। সেই শাশ্বত ক্রন্দনের ধ্বনি।

জাহানারা বলে চলল, 'তোর সঙ্গে কতদিন কত কথা বলেছি। কোনো দিন তোর মুখে অন্য কোনো পুরুষের প্রশংসা শুনিনি—ইসমাইলের তো নয়ই,

চ্যাটার্জিরও না। কেবল একজন লোকের কথায় তুই আনন্দ লাভ করিস, উৎসাহ পাস, আর তোর মনের মুকুল যেন খুলে যায়। আমি কি মিছে কথা বলছি ?'

পান্না মুখে কিছু বলল না। কেবল আঁচলে নিজের চোখের জল মুছল।

তেইশ

এইরকমই হয়। যুবতীর মনে স্বপ্ন জাগে বধূ হবার। কোনো এক শুভদিনে সে সত্যই বধূ হয়। এয়োরা সবাই উৎকৃষ্ট বস্ত্রালংকারে মেয়েকে সাজায়—হাতে, গলায় আর কানে গয়না পরিয়ে দেয়। এয়োরা সবাই গান গাইতে গাইতে বাড়ির দেহলির কাছে দাঁড়িয়ে বরকে সম্বর্ধনা করে। কন্যাকে বের করে নিয়ে যায় হোমের বেদীর কাছে। হাতে হাত লাগে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে। সলজ্জ পদক্ষেপে বধূ যায় পতিগৃহে...তারপর একদিন সেই কন্যা সন্তানসম্ভবা হয়।



পান্না কল্পনা করছিল বরুয়ার স্ত্রীর বিয়ের কথা। এখন এসেছে জীবনমরণের সমস্যা। ডাক্তার প্রসূতিকে অপারেশন থিয়েটরে নিয়ে গেছেন। বরুয়াকে খুব শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—কি হতে পারে। মা আর সন্তান দুজনেই বাঁচতে পারে—অথবা দুজনের মধ্যে একজন বাঁচতে পারে।

কিন্তু বরুয়া কিছুই ঠিক যেন বুঝতে পারছেন না।

সামনে পান্না দাড়িয়ে। সে লক্ষ্য করছে বরুয়ার মুখে কীরকম একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে। লোকটা স্থির হয়ে বসে থাকতে আর পারছে না যেন।

ডাক্তার আবার একবার বেরিয়ে এলেন। তারপর একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি তো জানেন, সীজারের কিভাবে জন্ম হয়েছিল।'

'জানি।'

'এ ক্ষেত্রে সেরকম হতে পারে। নিজের হাতটার ওপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই, তাই ডিব্রুগড থেকে ঘোষালকে ডাকিয়ে এনেছি। চিন্তাভাবনা করবেন না—মা আর ছেলে দুজনেই বাঁচতে পারে। আপনি এই কাগজে সই দিন—এটা কেবল নিয়মরক্ষা...'

বরুয়া তাড়াতাড়ি কলম বের করে কাগজে সই করে দিলেন।

ডাক্তার হেসে বললেন, 'আপনি বসুন। সারা রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে আছেন। পান্না চা করে দেবে—খান। পারবে তো পান্না ? হ্যাঁ, তোমার নাম আজকের ডাকেই পাঠিয়ে দিয়েছি...'

'কিন্তু।'

'কিন্তু টিন্তু নেই। তোমাকে যেতেই হবে।'

পান্না বলতে চেয়েছিল, জাহানারার বলা সেই কথাটা– বলতে পারল না।

ডাক্তার অপারেশন থিয়েটরে চলে গেলেন। পান্না গেল ডাক্তারের রুমে চা তৈরি করতে।

বরুয়ার গায়ে একটা ওভারকোট ছিল। বাইরে তখন বেশ রোদ, তবু ওভারকোট তখনো খোলেন নি। তিনি অপেক্ষা করে আছেন কখন গিয়াসুদ্দীন আসেন। তিনি কাছে থাকলে বরুয়া সব সময়ে সাহস পান। মানুষটা নির্ভীক—নিজে কোনো কিছু পরোয়া করে না, অপরের মনেও সাহস জোগায়। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন গেছেন টাওলার সায়েবের কাছে, অগ্নিদগ্ধ সেই চারজন শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে করে লোকটা পাগল হবার জোগাড। স্ত্রীকেও দেখতে আসেনি।

কিছুক্ষণ পরে পান্না এক কাপ চা আর চারটি বিস্কুট নিয়ে বেরিয়ে এল। বারান্দায় একখানা ছোট টেবিল ছিল, তার উপর চা-টা রেখে বলল—'খান।'

বরুয়া সামনের একটা চেয়ার টেনে বসলেন ও চা খেতে লাগলেন।

পান্না চলে গেল জাহানারার কেবিনে।

জাহানারা বিছানায় পড়ে পান্নার জন্য অপেক্ষা করছিল। কেবিনে ঢোকামাত্র জিগ্যেস করল, 'উনি কি এসেছেন?'

'আসেননি এখনো।'

'ঠিক জানি সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করছেন। মামা কত বারণ করেন, কিন্তু ওঁর স্বভাবটাই ওইরকম—অন্যায় সইতে পারেন না। আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।'

পান্না চুপ করে রইল।

জাহানারা পান্নাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'তুই বেশি ভাবিস না। চ্যাটার্জি কেমন আছেন?'

'ভালোই।'

জাহানারা বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করতে পারবি?'

পান্না বলল, 'যতটা পারি করব।'

ভালো করে নিজের মনটা না বুঝে কোনো কথা দিস না। আগে নিজের মনকে শুধিয়ে দেখ।'

পান্না উত্তর দিল, 'পারলে আপনার কথা রাখব।'

জাহানারার চোখে জল। সে বলে চলল, 'এ ব্যাপারে তোর বাবাও তোকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। শুনলাম, তোর বাবা আবার নাকি ঘর ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। মা মারা যাবার পর থেকে আমাদের ঘর হয়েছে শ্মশান। মা যে কি জিনিস, এখন বুঝতে পারছি।'

জাহানারা পান্নাকে কাছে আসতে বলল, তারপর ওর হাতখানা নিজের হাতে

নিয়ে বলল, 'ওসব কথা সারাক্ষণ ভাবিস না। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখ। সংসারে মেয়েরা চিরকাল পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে না। নয়নমণি ঠিক করেছে। কিছুতেই ভয় করিস না। চ্যাটার্জি কি তোকে কোনো কথা দিয়েছেন?'

'কই, না তো! তিনি তো য়ুনিয়নের কথা নিয়েই পাগল। মাঝে মাঝে হয়তো আমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমি কি থাকতে পারব? যদি ঘর সংসার করতে হয় তো ভালো করেই করব, নতুবা এইভাবে থাকব। আর গিয়াসুদ্দীন সাহেবের ভার আমি কি করে নিতে পারব? আপনি দেখছি আমায় মহা বিপদে ফেলেছেন। ওঁকে আপনি কিছু বলেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, সব কথাই বলেছি। বলেছি, আমায় যদি কখনো কিছু খুঁজে পেতে চান, তোর মধ্যে পাবেন।'

পান্নু কিছু বলল না। গ্লুকোজের সরবত তৈরি করে জাহানারাকে খাওয়াল। তারপর বলল, 'এত শত কথা কেন ওঁকে বলতে গেলেন? ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার স্থান নেব তেমন আমার শক্তি কোথায়? আমি একজন সামান্য খেটে-খাওয়া লোকেব মেয়ে। গিয়াসুদ্দীন সাহেব সকল মানুষের সঙ্গী, সে কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে তিনি কেন আমার ভার নিতে চাইবেন? এই সমস্ত কথা তাঁকে বলা ঠিক হয়নি, বৌদি!'

জাহানারা বলল, 'মরার সময়েও লোকে সংসারখানা আঁকড়ে থাকতে চায়। আমিও চাইছি তোর মধ্যে বেঁচে থাকতে।'

জাহানারা একটু হেসে আবার বলে চললেন, 'তুই কি ভেবেছিস, আমি বুঝতে পারিনি? গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে তোর খুব ভালো লাগে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোকে একটা কথা বলে রাখি—আমি যখন আর থাকব না কথাটা মনে রাখিস। তোর একজন বৌদি ছিল। সে সর্বদা তোর কথা ভাবত—কেবল তোর নয়, জেবউন্নিসা ও লছমীর কথাও। মেয়েদের কথা মেয়েরা ছাড়া বুঝতে পারে না। মেয়েরা কি চায় না চায়—মেয়েরাই জানে। সেইজন্যে দরকার, মেয়েরা যাতে নিজেদের অসুবিধে নিজেরাই মোচন করতে পারে। পুরুষ একজনকে পেলেই হয় না, পুরুষের সঙ্গে সমান সমান হবার অধিকার আদায় করে নিতে হয়। তুই জানিস না, কি করে তা করতে হয়, সেইজন্যেই পুরুষকে তুই ধরে রাখতে পারিস না। চ্যাটার্জিকে তুই ধরে রাখতে পারবি না। গিয়াসুদ্দীন সাহেব বলছিলেন, চ্যাটার্জি এখানে কেবল য়ুনিয়ন গঠন করার জন্যেই এসেছে। উনি একজন টেরোরিস্ট, উনি যে তোকে বিয়ে করবেন, আমার তা মনে হয় না। সব পাখি ফাঁদে পা দেয় না। গিয়াসুদ্দীন সাহেবের হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব।'

'এইসব কি আজে বাজে কথা বলছেন জাহানারা বৌদি? কিছু একটা অর্থ আছে নিশ্চই। গিয়াসুদ্দীনের কাছ থেকে সমান হবার অধিকার পাননি বলে ওঁর মনে একটা আক্ষেপ আছে নিশ্চয়। কিন্তু আর সব কথার অর্থ কি?'

বাইরে গিয়াসুদ্দীনের গলা শোনা গেল—বরুয়ার সঙ্গে কথা বলছেন। জাহানারা বলল, 'যা পান্নু, ওঁকেও একটু চা করে দে। তিনিও হয়তো কিছু না খেয়ে আছেন।'
পান্নু নীরবে বেরিয়ে গেল।

□

পান্নু গিয়াসুদ্দীনকে চা-বিস্কুট দিয়ে একমনে দুজনের কথাবার্তা শুনতে লাগল। আজ গিয়াসুদ্দীনের কথাগুলো দ্বিগুণ মনযোগে শোনবার ইচ্ছা।

গিয়াসুদ্দীন সাহেব টাওলারকে গালি-গালাজ করে এসেছেন। কেবল গিয়াসুদ্দীন নয়, আজ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল মালা সিং, প্রধান, চণ্ডী, ইসমাইল ও আর সবাই। মালা সিং বলছিলেন যে শ্রমিকদের ইজ্জৎ বাঁচাতে হবে। মেজাজ বেশ গরম। বড় সায়েব অফিসে ছিলেন না, তাঁর মনোভঙ্গ হয়েছে। দুষ্ট বুদ্ধি টাওলার কিন্তু বেশ হেসে হেসে ওদের কথার জবাব দিচ্ছিল—কম্পেনসেশন দেবে, কিন্তু মোটা টাকার কম্পেনসেশন নয়। আইনের কথা বলাতে সে কানও দিল না।

টেইনস গিয়াসুদ্দীনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'আমি নিরুপায়। তোমরা সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা পলিটিকেল ইস্যু করে ফেলেছ।'

'করব না কেন? অন্য উপায় থাকলে তো?'

টেইনস বলল, 'তাহলে তো আমি কিছু করতে পারব না।'

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটা ছিল রাজনৈতিক—ভারতীয় শ্রমিকের ইজ্জৎ রক্ষা করা। শ্রমিকের ইজ্জৎই হল দেশের ইজ্জৎ। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার পত্তন হয়েছে। আসামে হয়েছে কংগ্রেস কোয়ালিশন। চারজন শ্রমিকের অপঘাত মৃত্যু ঘটে গেল—তাদের জীবনের কি কোনো দাম নেই? মালা সিং একটা উর্দু রুবাই আবৃত্তি করত:

তু কাদিরো আদিল হ্যায় মগর তেরে জহাঁ মে।
হ্যায় তলখ্ বহুত বন্দ-এ মজদুর কে অওকাত।
কব ডুবেগা সরমায়া পরস্তীকা সফীনা।
দুনিয়া হ্যায় তেরী মুন্তজিরে রোজ-এ মকাফাত।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও ন্যায়বন্ত। কিন্তু তাঁর পৃথিবীতে নির্ধনী ও মজুরদের জীবন বড়ো কঠোর। এরা কেবল পথ চেয়ে আছে কবে পুঁজিবাদের নৌকার ভরাডুবি হয়, কবে পুঁজিবাদীর দণ্ড হয়।

গিয়াসুদ্দীনের কথা শুনে বরুয়া বললেন, 'কেবল সরকার গঠন করলেই হয় না। শ্রমিকদের নিজেরও শক্তি থাকা দরকার। যদি য়ুনিয়ন থাকত...'

ঠিক বলেছো। মালা সিংকে আমি সেই কথাই বলেছি। য়ুনিয়ন করতেই হবে কালবিলম্ব না করে।

□

তারই মধ্যে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন—মুখে তাঁর হাসি।

কি হয়েছে সে কথা জিগ্যেস করতেও বরুয়ার সাহস হল না। 'এ পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। ভালোই হবে আশা করছি।'

গিয়াসুদ্দীন সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দু-চার ঢোকে চা-টা শেষ করে বললেন, 'ছেলেটা বাঁচবে তো?'

'বাঁচা তো উচিত।'

'জাহানারার অবস্থা কেমন?'

'ভালোই আছে, কিন্তু কিছুকাল হাসপাতালে থাকতে হবে।' ডাক্তারের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠল, 'আপনার স্ত্রীর অসুখটা এবার ঠিক ধরতে পেরেছি। টাইফয়েড। সব অসুখের ওষুধ বেরিয়েছে, কিন্তু টাইফয়েডের ওষুধ নেই। ওঁর তো সবই ভালো, কিন্তু হার্টটা খুবই দুর্বল।'

হঠাৎ জাহানারা ডাকল, 'পান্নু'—পান্নু জাহানারার কেবিনে ঢুকে আবার বেরিয়ে এসে বলল, 'বৌদি আপনাকে ডাকছেন।'

গিয়াসুদ্দীন জাহানারার কেবিনে ঢুকে গেলেন। পান্নু আবার চুপ করে বরুয়াদের কথা শুনতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, 'জাহানারার অবস্থা কিন্তু কিছু ভালো নয়।'

বরুয়া শুধোলেন, 'কোনো বিপদ হতে পারে নাকি?'

'বলা যায় না।'

ডাক্তার বলে চললেন, 'বড় সায়েব তো চলেই যাবেন বলে মনে হচ্ছে। কাল দেখা হয়েছিল, বললেন যে বৃটেনের পতনের দিন আসছে। টাওলারের মতো লোকের জন্যেই এটা ঘটবে। এরা নিজেদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করে, কিন্তু বিদেশে করে না। আর বললেন, টাওলার থাকলে মজুরদের শান্তি নেই—সায়েব ও শ্রমিকদের মধ্যে তাহলে মেলামেশা ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে না। ওর চোখে নেটিভেরা সব কুকুর বেড়ালের মতো। অদ্ভুত উগ্রচণ্ড সায়েব। চ্যাটার্জি কি করছেন না করছেন, খবর নেবার জন্য দিনে তিনবার লোক পাঠায়। আর আপনাদের ওপরেও কড়া নজর রেখেছে। এতটুকুই বললাম আপনাকে। টাওলার কেবল অপেক্ষা করে আছে কবে জওহরলাল নেহরু এখানে আসার পর ফিরে যাবেন। তখন কিছু একটা বাঁধাবে লোকটা।'

বরুয়া শুধোলেন, 'আর কিছু কি বললেন বড় সায়েব?'

'না। ইংরেজরা কথা বলে খুব কম। আপনাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।'

'কি?'

'সেই চারজন শ্রমিকের পোস্টমর্টেম করালেন না।'

'পোস্টমর্টেম-এর কোনো প্রয়োজন ছিল নাকি? যা ঘটেছিল—সে তো প্রত্যক্ষ ঘটনা।'

'না, অন্য কোনো কথা নয়। কেসটা একটু দুর্বল হয়ে গেল।'

'তা কেন হবে? আগেকার নজির আছে। পঁচিশ বছর আগে কুমারলিঙ্গম্

এইভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। শেষ পর্যন্ত তার পরিবার কম্পেনসেশন পেয়েছিল।'

ডাক্তার চলে গেলেন। পান্নু এইসব আলাপ আলোচনা শুনে একটুও বিচলিত বোধ করল না, শিশুকাল থেকেই তো বড়দের মুখে এইরকম কথা শুনে আসছে। কেবল প্রতিকার এখনো বেরোয়নি। সবাই যেন কথা বলে ছোট ছেলেদের মতো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলে হলেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব। তিনি তো এইসব কাজে সারাক্ষণ মগ্ন।

পান্নুর হাসি পেল। এবার সে জাহানারার কেবিনের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে লাগল।

জাহানারা স্বামীকে বলছিল, 'আপনি যা চান তা আপনাকে দিতে পারব বলে আশা করি না। ভিতরে ভিতরে দেহটা যেন মরে যাচ্ছে—আমি বড়ই দুর্ভাগিনী।'

গিয়াসুদ্দীন এক দৃষ্টে জাহানারার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর সন্তর্পণে ওর শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি সেরে উঠবে। তুমি সগর্ভা যখন, আমাদের সন্তান হবেই। তাকে আমরা আদরে যত্নে মানুষ করে তুলব।' আর গিয়াসুদ্দীনের মুখ থেকে কথা বেরোলনা, দেখলেন জাহানারার কান্না যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। গিয়াসুদ্দীন সেদিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। মৃত্যুর ছায়া যেন জাহানারার চোখের পাতা ঢেকে দিয়েছে। গিয়াসুদ্দীন মৃত্যুকে মেনে নিতে চাননি—জাহানারা সে কথা বুঝতে পেরেছে। উপায় নেই- মৃত্যু বড় নির্মম। গিয়াসুদ্দীনের গলাটা শুকিয়ে গেল—আর একটা কথাও বেরোল না।

□

খানিকক্ষণ বাদে জাহানারা নিজেকে একটু সংযত করে নিল। তারপর গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি মরি কি বাঁচি, যা হবার হবে। কিন্তু আমি যদি মরি, তাহলে পান্নুকে আপনার দেখতে হবে।'

গিয়াসুদ্দীন কিছু বললেন না।

জাহানারা বলে চললেন, 'আমি না থাকলেও সে আপনার দেখাশুনো করবে। ওর মধ্যে আমায় পাবেন...'

গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি এসব কথা ভাবছ কেন? শুয়ে থাকো। তুমি ভালো হয়ে উঠবে। মিথ্যা মরণকে ডেকে আনছ কেন?'

চব্বিশ

'দাদাজান! দাদাজান!!'

নাসিরুদ্দীন বেরোচ্ছিলেন জওহরলাল নেহরুকে দেখতে। জেবউন্নিসার গলা

শুনে ঘরের সামনের নাবাল রাস্তাটার মাঝখানে নাসিরুদ্দীন দাঁড়িয়ে পড়ল, বললেন, 'তুই কখন এলি ?'

'এক হপ্তা হল।'

'এক সপ্তাহ! এই সাত দিনে বুড়োকে তোর একবারও মনে পড়ল না? কী কঠিন হৃদয়টা তোর।'

নাসিরুদ্দীনের কণ্ঠে বিষাদের সুর। জেবউন্নিসা বলল, 'কী করে আসি? জাহানারা বৌদির অবস্থা এখন যাই তখন যাই। গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে খবর দাও গিয়ে, আমি আহমদ সাহেবের বাড়িতে খবরটা দিয়ে আসি।'

নাসিরুদ্দীনের মনটা যেন মরে গেল। জেবউন্নিসাকে দেখে আরো যেন দুঃখ বৃদ্ধি পেল। জিগ্যেস করলেন, 'এত রোগা হলি কি করে? কি হয়েছিল?'

জেবউন্নিসা মাথা হেঁট করে বলল, 'ডাক্তার বলছেন লিভার খারাপ।'

'হুঁ।'

কিছুক্ষণ দু'জনের কারো মুখে কথা নেই। তারপর জেবউন্নিসা বলল, 'দাঁড়াবার সময় নেই। ওখানে একা পান্নু রয়েছে। সে তো কান্নাকাটি করছে পাগলের মতো। ডাক্তার কাউকে কেবিনে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তুমি একটু পা চালিয়ে যাও।'

'যাচ্ছি। এই চললাম। কি দিনটাতেই না জাহানারা যাত্রা করল!'

নাসিরুদ্দীন তাড়াতাড়ি সভার ময়দানের দিকে পা চালিয়ে চলে গেল। এদিকে জেবউন্নিসাও দ্রুতপদে চলল, আহমদ সায়েবের বাড়ির দিকে।

□

মাঠে পৌঁছতে নাসিরুদ্দীনের বেশ একটু সময় লাগল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য—সারা শহর যেন ভেঙে পড়েছে, 'কেউ আসতে বাকী নেই। বড় সায়েব থেকে শুরু করে—মেথর ঝাড়ুদার—কেউ বাদ যায়নি। মেয়েদের তো কথাই নেই। মাইকে গান শোনা যাচ্ছে। প্যাণ্ডেলটা প্রকাণ্ড।

নাসিরুদ্দীন একদিক থেকে লোকেদের দেখতে দেখতে চললেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের দেখা পেলেন না। প্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েকবার এদিকে ওদিকে গলা বাড়িয়ে দেখলেন—সেখানেও নেই।

এদিকে মাইকে কে একজন চীৎকার করে বলছে, 'সবাই শুনুন। নেহরুজী এসে গেছেন! আপনারা পথ ছেড়ে দাঁড়ান।'

হুলুস্থুল বেঁধে গেল। সব লোক ছুটছে ডান দিকে। নাসিরুদ্দীন জোর পা ফেলে এবার সেদিকে চললেন। নেহরুজী যে-পথ দিয়ে সভাস্থলে ঢুকবেন, সেই পথের দু'ধারে যুবক যুবতীরা স্বেচ্ছাসেবকের পোশাক পরে জিগির তুলছে—'নেহরুজী কি জয়!'

স্বেচ্ছাসেবকদের ওদিকে কিছু লোক মালা হাতে দাঁড়িয়ে। একটু দূরে দেখা গেল বড় সায়েব ও তাঁর মেমকে। মিসেস ফ্লেমিঙের হাতে একটা ক্যামেরা।

তাঁদের অল্প দূরেই মালা সিং, আর মালা সিং-এর কাছে অপেক্ষা করছেন গিয়াসুদ্দীন। কাছাকাছি রয়েছেন বরুয়া, চ্যাটার্জি, চণ্ডী ও ইসমাইল।

নেহরুজী মোটর থেকে নামছেন।

গগনভেদী চীৎকারে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। বহু লোকের ভিড়। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় সাধ্য কার। শেষ পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি খেয়ে নাসিরুদ্দীন কোনো রকমে গিয়াসুদ্দীন সাহেবের কাছাকাছি পৌঁছে, তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেব!'

'কে? কী হয়েছে নাসিরুদ্দীন?'

'হাসপাতাল চলুন। জাহানারার অবস্থা খারাপ।'

গিয়াসুদ্দীনের মুখখানা মলিন হয়ে গেল। হঠাৎ ঘুরে গিয়ে তিনি রাস্তার দিকে চলতে লাগলেন—সামনে যে কী ঘটছে সেদিকে খেয়ালও নেই। মুখখানা ঘেমে উঠল। নাসিরুদ্দীন ওঁর পিছু পিছু চলতে লাগলেন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে।

খানিকক্ষণ পরে গিয়াসুদ্দীন রাস্তায় পা দিয়েই সোজা চলতে লাগলেন হাসপাতালের দিকে। তখন জাহানারার চিন্তা তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে আছে, আর কোনো কিছুতে লক্ষ্য নেই। এমন সময় মাইকে শোনা গেল নয়নমণিদের গান। মীটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারি মিষ্টি নয়নমণির গলা। যেতে যেতে ওরা দু'জন শুনতে পেল:

সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা
হম বুলবুলে হৈঁ ইসকী বহ গুলিসতাঁ হমারা
ওরবতমেঁ হোঁ অগর হম বহতা হৈঁ দিল বতনমে
সমঝো বঁহী হমেঁ ভী দিল হো জহাঁ হমারা।
পর্বত রহ সবসে উচাঁ হমসায়া আস্মা কা
বহ সন্তরী হমারা বহ পাস্বাঁ হমারা।
গোদী মে খেলতী হৈঁ উসকী হজারোঁ নদীয়াঁ
গুলসন হৈঁ জিনকে দমসে রস্কে জিনা হমারা
এ আবে রুদে গংগা বহ দিন হৈঁ য়াদ তুমকো
উতরা তেরে কিনারে জব কারবাঁ হমারা।
মজহব নহীঁ শিখাতা আপসমেঁ বের রখনা
হিন্দী হৈঁ হম বতন হে হিন্দোস্তাঁ হমারা॥

ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে গেল গানের কথা ও সুর। সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের মনটাও ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ কী হল জাহানারার?

একটু পরে গান থেমে গেল। গানের পর অভিনন্দন পাঠ করল মালা সিং। অভিনন্দনের পর জনতার কাছে নেহরুজীর পরিচয় পেশ করা হল। গিয়াসুদ্দীনের প্রোগ্রামটা আগাগোড়া মুখস্থ।

অবশেষে শুরু হল নেহরুজীর বক্তৃতা।



কিছুই শোনা হল না।

নাসিরুদ্দীন বললেন, কী দিনটাতে কী হয়ে গেল। নেহরুজীকে খুব দেখার ইচ্ছা ছিল। কতদিন ধরে নাম শুনে আসছি। রাজার মতো চেহারা।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'চেহারা দেখে কি হবে? কথাগুলো শোনা উচিত ছিল। আর জিগ্যেস করার মতো কথা ছিল ঢের। কী আর হবে? জাহানারার কি হল—বলতে পারো?'

শ্রোতারা সবাই করতালি দিচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই।

কিন্তু করতালির শব্দও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গিয়াসুদ্দীনের হৃদয়ের যন্ত্রণা। শুধোলেন, 'কে খবর দিল তোমাকে?'

'জেবউন্নিসা।'

'তা হলে নিশ্চয় ভয়ের কারণ ঘটেছে।'

গিয়াসুদ্দীন চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন। পা যে কোথায় পড়ছে তাও যেন জানেন না। এই ক'দিন ধরে জেবউন্নিসা তাঁকে এই আশঙ্কার কথা বলে আসছিল। তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু বিশ্বাস না হলে কি হবে, মনে মনে ভয় ছিল। বলেছিল এই কয়েকটা দিন জাহানারার কাছে থাকতে। কিন্তু তিনি থাকতে পারলেন না। কেমন করে পারবেন? তাঁকে তখন নেহরু-রোগে ধরেছে, আর য়ুনিয়নের বাতিক তো আছেই। এখন শেষ মুহূর্তে কী আর বলবেন, কী বা শুনবেন?

সারা শহরে আজ কর্মবিরতি। যেন সর্বাত্মক হরতাল। কেবল হাসপাতালটা খোলা। আয়োডিন না ফিনাইলের গন্ধ আসছে নাকে।

জাহানারার কেবিনের সামনে পান্নু হাপুসনয়নে কাঁদছে। তার সারা দেহে একটা শৈথিল্য—পোষাকে প্রসাধনে কোনো কিছুতেই যত্ন নেই। পাশে বরুয়ার স্ত্রীর কেবিনটা খালি—মা ও ছেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে গেছে। অন্য পাশের যে কেবিনে চ্যাটার্জি ছিলেন, সেটাও খালি। চ্যাটার্জি নেহরু অভিনন্দনের কিছু আগেই ছাড়া পেয়ে চলে গেছেন।

গিয়াসুদ্দীনের হাত-পা কাঁপছে। নাসিরুদ্দীন ভয়ে ভয়ে কেবিনের ভিতরে একবার তাকাল। ভিতরে জেবউন্নিসা অক্সিজেন দিচ্ছে রোগিনীকে। ডাক্তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন জাহানারার দিকে।

শরীরের কোনো লক্ষণই আশাপ্রদ নয়। জাহানারা বার বার মূর্চ্ছা যাচ্ছে। এক ঘন্টা প্রায় হল চোখ আর খুলতে পারেনি। জেবউন্নিসা নাড়ী টিপে দেখছে—স্পন্দন নিতান্তই ক্ষীণ।

গিয়াসুদ্দীন কেবিনে ঢুকলেন। মুখে কোনো কথা নেই। ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে শুধোলেন, 'কেমন আছে?'

'জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছে বুকটাতে। হার্টখানা দুর্বল—এ জেন্টল সোল।'

গিয়াসুদ্দীন সভয়ে সন্তর্পনে জাহানারার একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। গিয়াসুদ্দীনের তপ্ত হৃদয়টা যেন জমে বরফ হয়ে গেল। মুখে কোনো শব্দ নেই, চাহনীতে কোনো আবেগ নেই, পা যেন আর চলছে না, শরীরে যেন কোনো চেতনা নেই। শরীরটা তার নিজের না জাহানারার, তা যেন ধরতে পারছে না গিয়াসুদ্দীন। একটা উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি যেন একটি শায়িতা প্রস্তর মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার ধীরে ধীরে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।

□

নাসিরুদ্দীন পান্নুকে জিগ্যেস করলেন, 'মরবার আগে জাহানারা কিছু কি বলে গিয়েছিল, পান্নু?'

'হ্যাঁ, বলেছিল।'

'কি বলেছিল?'

'গিয়াসুদ্দীন সাহেবের দেখাশুনো করতে বলেছিল।'

'কাকে?'

'সে-সব আমায় জিগ্যেস করবেন না, জেবউন্নিসাকে শুধোন।'

পান্নু কাঁদতে লাগল। কেবিনের ভিতর গিয়াসুদ্দীন সাহেব তখনো প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

নাসিরুদ্দীন জেবউন্নিসাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'মরার আগে জাহানারা কিছু কি বলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলেছে?'

'গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে পুনর্বিবাহ করতে বলে গেছে।'

'আরো কিছু বলে গেছে কি?'

'পান্নুকে জিগ্যেস করুন।'

নাসিরুদ্দীন আবার খুব আস্তে আস্তে পান্নুকে জিগ্যেস করলেন, 'তা হলে গিয়াসুদ্দীনকে তোর হাতে দিয়ে গেছে? কী আশ্চর্য!'

পান্নু আরো বেশি করে কাঁদতে লাগল। নাসিরুদ্দীন পান্নুর সমস্ত মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করলেন। মুখে একটা অভূতপূর্ব যন্ত্রণা। নাসিরুদ্দীন ক্ষান্ত হলেন। হঠাৎ ডাক্তার নাসিরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন তাঁর রুমে। নাসিরুদ্দীনকে বসিয়ে ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললেন, 'জাহানারা কি বলে গেছেন, তা আমিও শুনেছি। তিনি পান্নুকে বলেছেন গিয়াসুদ্দীন সাহেবের ভার নিতে। তার অর্থ স্পষ্ট। স্বামীকে খুবই ভালোবাসতেন তিনি। মৃত্যুর পরেও তাঁর কাজ যেন আর কেউ করে—তারই ব্যবস্থা। খুব সম্ভব গিয়াসুদ্দীন সাহেবকেও ওই একই কথা বলে

গেছেন। কিন্তু মানুষের হৃদয় বড়ো দুর্বোধ্য জিনিস। পান্নু আরেকজন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হয়।'

'তাই নাকি? কে তিনি?'

'চ্যাটার্জি।'

'ও, সেইজন্যেই তার এত কান্না। কিন্তু জাহানারার বিচার তেমন ঠিক হয়নি। পান্নুর নিজেরও একটা মন আছে তো!'

ডাক্তার হাসতে লাগলেন, 'পান্নু একটি আশ্চর্য মেয়ে। সে তার নিজের মনের কথা নিজেই বোঝে না। সে জাহানারাকেও কথা দিয়েছে, আবার চ্যাটার্জিকেও হয়তো আশা দিয়েছে। মানুষের মনস্তত্ব অল্প-স্বল্প আমি যা জানি তা থেকে এই আমার অনুমান।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'যা ঘটবার তাই ঘটবে—তার অন্যথা হবেনা।'

আহমদ সাহেব ও তার পরিবারবর্গ অল্পক্ষণ পরে এসে পড়লেন। তাঁদের পৌঁছবার আগেই জাহানারার মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা কেবল মৃতদেহ গোরস্থানে নেবার ব্যবস্থা করলেন।

পঁচিশ

সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। জওহরলাল নেহরু জেনারেল ম্যানেজারের বাংলোয় বসে চা-ও খেলেন, আবার সভায় বক্তৃতা দেবার সময় শ্রমিকদের বললেন য়ুনিয়ন গঠন করতে। আরো একটা আনন্দদায়ক খবর হ'ল এই যে, নয়নমণির সব দোষ প্রধান মাফ করেছেন। সেই দিন এত এত লোকের মুখে মেয়ের গান, তার অদ্ভুত গলা ও রূপের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনে প্রধানের মনের সমস্ত অভিমান দূর হয়ে গেল। সভাস্থলে সকল লোকের সামনে নয়নমণি বাপকে প্রণাম করায় বাপের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। এবার দুর্গা যদি একদিন বাড়িতে গিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে আসে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

য়ুনিয়নের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এবার বেশ ভালো করে সভ্য ভর্তি করার কাজ চলছে। সকলেই নূতন উৎসাহে একাজে লেগেছেন। কেউ বাদ নেই, এমনকি নাসিরুদ্দীন বুড়োও বাংলো বাড়ির চাকর নোকর সবাইকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার জন্য লেগে গেছেন। গিয়াসুদ্দীন সাহেবও বসে নেই। চারজন শ্রমিকের জন্য কম্পেনসেশন না পাওয়ার রাগে সকলেরই প্রাণ অতিষ্ঠ করছেন।

সেই সময়কার একটা দিনের কথা।

বরুয়ার প্রথম সন্তান জন্মানোর উপলক্ষে সবাই মাছ খেতে চায় বলাতে, একদিন

প্রকাণ্ড একটি রুইমাছ কিনে একেবারে সর্বপ্রথম ভাগটুকু দিতে এলেন গিয়াসুদ্দীনের ঘরে।

তখন সেখানে জমায়েত। নাসিরুদ্দীন কোরাণ খুলে কি যেন বুঝাচ্ছেন, আর জেবউন্নিসা ও ইসমাইল বসে বসে শুনছিল। নাসিরুদ্দীন বলছিলেন, 'হজরত মহম্মদও বলে গেছেন গোলামকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, অনাথ ও দুঃখী আত্মীয়দের আহার দাও—কারণ, এরা প্রত্যেকেই মোমিন। এটাই মানুষের পক্ষে সত্য পথ। যতদিন না কোনো জাতি নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়, ততদিন সে জাতির দুরবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। সায়েবরা আমাদের লোকেদের দুঃখ দুর্গতি উপেক্ষা করে নিজেদের ধর্মের অপমান করছে। যীশুখৃষ্ট জনগণের জন্যে নিজের জীবনটা ক্রুশে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা নিজেদের জীবনটা নিছক ইন্দ্রিয় সম্ভোগে ব্যয় করে। এ করে তারা নিজেদের ধর্মের অবমাননা করছে।'

বরুয়া বললেন, 'সকল ধর্মের একই দুরবস্থা। বুদ্ধদেব নাকি বলে গিয়েছিলেন যজ্ঞ মানে বেকার সমস্যার সমাধান করা; সকলের জন্য কাজের উপায় নির্ধারণ করা ও সকলকে সন্তুষ্ট রাখা। কিন্তু সেরকম যজ্ঞ কে আর করে? ধর্মের নামে যত্রতত্র কেবল রক্তপাত।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এই জন্যই আমি ধর্মকে বলি গায়ের জামা। না পরলেও চলে। দেহ বা মনের তাতে কোনো বদল হয়না।

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আপনি তো কিছু ভালো কাজ করেননি, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। মুসলমান হয়েছেন নামাজ পড়েন না, মসজিদে যান না। এমনকি জাহানারার জন্যেও কিছু করলেন না। মৌলভী ও আহমদ সাহেব বড় আঘাত পেয়েছেন।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'হিন্দু থাকতেও তো কিছু করতাম না। মুসলমান হয়েছিলাম জাহানারাকে বিয়ে করতে। এখন সেই প্রয়োজনও নেই।'

হঠাৎ ইসমাইল একটু যেন কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, 'একটা কথা জিগ্যেস করি, সেজন্য কিছু মনে করবেন না গিয়াসুদ্দীন সাহেব। পান্নুকে নাকি আপনি বিয়ে করতে চাইছেন?'

নাসিরুদ্দীন ও জেবউন্নিসা বুঝল, ইসমাইল না জেনে না-শুনে অকারণ কৌতূহলে প্রশ্নটা করেছে। কিন্তু জবাবটা গিয়াসুদ্দীন দিলেই ভালো।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'একটা কথা সত্যি—পান্নুকে আমি বিয়ে করি, এটাই ছিল জাহানারার অন্তিম অনুরোধ। জাহানারা সে কথা আমাকেও বলেছে আর পান্নুকেও বলেছে। আমি চণ্ডীর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনাও করেছিলাম। চণ্ডী বলল, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দকে শুধোতে। শুধোলাম। স্বামীজী বললেন, 'চণ্ডী বিয়ে দিতে চায় না। তবে আপনি যদি আবার হিন্দু হন, তা হলে আলাদা কথা।' এখন কেবল পান্নুকে জিগ্যেস করাটা বাকী আছে।'

ইসমাইল বলল, 'পান্নুকে আজ চণ্ডী বেধড়ক প্রহার করেছে। কি জন্যে

জানি না। বোধকরি চণ্ডী পছন্দ করেনা যে পান্নু আপনার এখানে কিম্বা চ্যাটার্জির ওখানে যাওয়া আসা করে।'

গিয়াসুদ্দীনের মুখখানা লাল হয়ে গেল। বললেন, 'দেখো ইসমাইল, তোমার এসব কথা বলে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না। আর চণ্ডীরও এভাবে মারপিট করাটা অন্যায়। আজ পান্নু আসবে তাকে বারণ করে দেব এখানে আসতে। আর চ্যাটার্জি যদি পান্নুকে বিয়ে করতে চায়—তো করুক। কিন্তু এসব কথা আবার যদি শুনতে পাই, তাহলে যারা এসব বলে, তাদের এ বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না।'

ইসমাইলের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

নাসিরুদ্দীন শ্লেষের সুরে বললেন, 'আগে তোর নিজের ঘর সামাল দে, তারপর পরচর্চা করতে চাস তো করবি।'

ইসমাইলের দু'গালে যেন দুপাটি জুতোর ঘা পড়ল। সে উঠে দাঁড়াল, তারপর গলাটা নরম করে বলল, 'যদি দোষ করে থাকি, আপনারা মাপ করবেন। কিন্তু একটা কথা বলে যাই, কাল আমি লছমীকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কেন? এটা ভালো কাজ করোনি। ও যাতে ভালো হয় তার জন্য চেষ্টা করো। সেটাই পুরুষার্থ।'

'না, না, না, আমি পারব না। ওরকম একটা জংলী মেয়ের সঙ্গে আমি সংসার করতে পারব না।' ইসমাইল বেরিয়ে গেল।

সবাই অবাক।

বরুয়া মাছটুকু রেখে বললেন, 'আমি এবার চলি, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। এইসব কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না। য়ুনিয়নের সংগঠন এখন চলছে, এই সময়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে যদি এরকম ভিতরে ভিতরে মনোমালিন্য হয়, তা থেকে কিছু লাভ হবে না। লছমীর কথা আমি কিছু জানিনা। সবাই যদি ভালো বোঝেন, তা হলে চণ্ডী ও চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলে পান্নুর ব্যাপারটা মীমাংসা করা যায় কি না দেখতে পারি। কিছু বলার থাকে তো বলুন।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'পান্নুকে নিয়েই তো যত বিবাদ। সে নিজের মন নিজেই জানে না।'

গিয়াসুদ্দীন হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আপনিই যদি আমার ভার নেন, নিন বরুয়াবাবু। জাহানারা একটা সমস্যার সৃষ্টি করে গেছে। কিন্তু আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, জাহানারার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি চাই না। পান্নুকে আমি চাই না। সে বিয়ে করে যদি সুখী হয়, আমিও খুশি হব।'

বরুয়া বললেন, 'আপনার সিদ্ধান্ত শুনে সুখী হলাম। আমি এবার যাই।'

বরুয়া উঠে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা বেরোল না। জেবউন্নিসা মাছের টুকরোটা দেখে বলল, 'মাছটা আপনি কি করবেন?'

গিয়াসুদ্দীন হাসতে হাসতে বললেন, 'রেঁধে খাব।'

'রাঁধতে পারবেন আপনি ?'

'কেন, সে তো খুব সোজা। আর গিয়াসুদ্দীন না পারে, এমন কোনো কাজ আছে জগতে ? অবশ্য একটা দুঃখ রয়ে গেল—একটা ছেলে চেয়েছিলাম আমি। জাহানারাকে সগর্ভা হতে দেখে তাই আমার খুব ভালো লেগেছিল। নিজের হাতে একটা ছেলেকে লালন পালন করে মানুষ করে তুলব—ভারি একটা আশা ছিল। কিন্তু কিছুই হল না। জাহানারা নিজেকে ভারি অপরাধী মনে করে মরবার আগেই পান্নুকে গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। ভেবেছিল পান্নুকে বিয়ে করলে ওর মধ্যে সে নিজেও বেঁচে থাকবে। ওর ত্রুটির মার্জনা হবে আর আমারও আনন্দ হবে। হ্যাঁ, জাহানারা খুব ভালোবাসত পান্নুকে, আমায় যেসব কথা বলত না, ওকে বলত।'

এই কথা বলে গিয়াসুদ্দীন মাছখানা ভিতরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে ফিরে এলেন।

জেবউন্নিসা হঠাৎ বলল, 'জাহানারা আরো একটা কথা বলে গেছে পান্নুকে।'

'কি ?'

'পান্নু নিজেকে যতটা জানে তার চেয়ে নাকি জাহানারা তাকে বেশি ভালো করে জানত।'

গিয়াসুদ্দীন হাসলেন, কিছু বললেন না।

জেবউন্নিসা বলে চলল, 'জাহানারা ওকে বলেছিল, চ্যাটার্জির চেয়ে পান্নু নাকি গিয়াসুদ্দীন সাহেবকেই বেশি ভালোবাসে।'

গিয়াসুদ্দীন শুধোলেন, 'জাহানারাই বা বুঝল কী করে ?'

জেবউন্নিসা হেসে বলল, 'অনেক কথা হত তো দুজনের মধ্যে। একদিন জাহানারা ওকে বলেছিল ইসমাইলকে বিয়ে করতে। কিন্তু পান্নু বলেছিল ইসমাইলের মধ্যে পৌরুষ নেই। জাহানারা জিগ্যেস করল, পৌরুষ কি ? পান্নু হেসে বলেছিল, গিয়াসুদ্দীন সাহেব পৌরুষের প্রতীক। তিনি আপনাকে বিয়ে করার জন্য নিজের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। ইসমাইল কেন করল না ? ইসমাইল পারল না। সেই জন্যে পান্নু তাকে বিয়েও করল না। রামুকে তো ও গ্রাহ্যের মধ্যেই গণ্য করত না। আর চ্যাটার্জির সঙ্গে যে সম্পর্ক ঘটেছে, সে নাকি বন্ধুত্ব। চ্যাটার্জিকেও পৌরুষের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'যদি জাহানারার কথা ঠিক হয়, তা হলে পান্নু চ্যাটার্জিকেও বিয়ে করবে না।'

গিয়াসুদ্দীন কিছু বললেন না।



এইরকম সময় পান্নুকে বাইরে দেখা গেল। একটা থালায় ভাত, ডাল, তরকারি, মাংসের ঝোল নিয়ে সে গিয়াসুদ্দীনের বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকল।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'পান্নু, আজ থেকে তুমি আমার এখানে কিছু আনবেও না, আসবেও না।'

পান্নু অবাক হয়ে গেল, শুধোল, 'কী হয়েছে আপনার? হঠাৎ কেন এমন কথা বলছেন?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কারণ আছে। আমার খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে তোমার চরিত্র ঢের বড়ো। আমার জন্যে তোমার চরিত্রে কেউ কলঙ্ক দেয়, সে আমি চাই না। তোমার যাতে ভালো হয়—সেটাই আমি চাই। তুমি বিয়ে-থা করে সুখী হও—এই আমি আশীর্বাদ করি। জাহানারা তোমার জন্যে কিছু জিনিস রেখে গেছে, সেগুলো তোমায় আমি যথাসময়ে দেব। আমায় ভুল বুঝো না। তোমার ভালোর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

পান্নু বলল, 'কেন এসব কথা শুনতে হল, জানতে পারি?'

'কারণ আছে।'

'আমায় বলতে বাধা কিসের?'

'সত্যি তুমি শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তোমায় কলঙ্কমুক্ত করতে চাই।'

পান্নু এবার হাসল, 'এই শহরে কলঙ্কের হাত থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না, বিশেষত যুবতী মেয়েরা। আমি ভেবেছিলাম, এই শহরে অন্তত একজন পুরুষ আছেন, যিনি কিছুতেই পরোয়া করেন না।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'পান্নু, ভয় আমার নেই। সেইজন্যেই সকল কথা জেনেও তোমায় নির্ভীক চিত্তে বিদায় দিতে পারছি। আমি সরে গেলেই তুমি নিজেকে নিজে জানতে পারবে। যাও।'

'থালাটা রেখে যাব, না ফিরিয়ে নিয়ে যাব?'

'নিয়ে যাও।'

'আর কখনো এখানে আসতে দেবেন না?'

'না।'

'খাওয়া-দাওয়া কি করে হবে?'

'দু-খানা হাত কি নেই আমার?'

পান্নু বেরিয়ে চলে গেল।

জেবউন্নিসা পিছু পিছু দৌড়ল, 'পান্নু, পান্নু, পান্নু। শুনে যা।'



নাসিরুদ্দীন বিষণ্ণ মনে বললেন, 'এ কি করলেন আপনি? আপনার মতো মানুষের পক্ষে এরকম করা সাজে না। পান্নুর কি দোষ বলুন দেখি?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'আমার বন্ধন থেকে ওকে আমি মুক্ত করে দিয়েছি। এখন আমিও মুক্ত। আচ্ছা, ওসব কথা বাদ দাও। যা হয়ে গেল তা হয়ে গেছে। আমার এখানে মাছ দিয়ে একমুঠো খেয়ে যাও। বোসো।'

নাসিরুদ্দীন কোনো কথা বললেন না।

আজকাল জিলাপেসী সায়েব বাঙলোতে খায়ই না, ক্লাবেই খাওয়া-দাওয়া করে। আজ তো আবার মার্ঘেরিটায় পার্টি। কাজে কাজেই নাসিরুদ্দীন রাজী হয়ে গেল খেয়ে যেতে। তারপর বলল, 'আমি নিজেই রাঁধব। আপনার হাতের রান্নায় কোনো স্বাদ মিলবে না। আপনি বরঞ্চ য়ুনিয়নের অফিস ঘুরে আসুন।'

ছাব্বিশ

কী একটা ঘরোয়া পরব উপলক্ষে সিং-জীর বাড়িতে রামলীলা পালা হচ্ছিল। বিষয়টা ছিল সীতাহরণ। কিন্তু আচম্বিতে সীতাহরণের নায়কের ভূমিকায় নাবলেন স্বয়ং সিং-জী। দর্শকদের বসার জায়গা থেকে লছমীকে উঠিয়ে নিয়ে হরণ করার চেষ্টায় ছিল—রথে নয়, মোটরে। কিন্তু লছমীর চীৎকার শুনে দর্শকদের জায়গা থেকে দৌড়ে উঠে গেলেন স্বয়ং গিয়াসুদ্দীন। ঠাস ঠাস করে চারখানা চড় খেয়ে একমাথা রাবণ সেখানেই ভূপতিত হল এবং অতি সত্বর সীতাহরণ পর্বের প্রথম দৃশ্যেই যবনিকা পড়ল।

গিয়াসুদ্দীন লছমীকে সঙ্গে করে ইসমাইলের বাসায় নিয়ে এলেন। ইসমাইলকে কথাটা বলতে না বলতে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বেরো তুই। এখুনি বেরিয়ে যা!'

লছমী বেরিয়ে গেল না।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ইসমাইল, একটু বোসো তো। এর বিষয়ে এখুনি একটা কিছু ফয়সালা করে যাব। বোসো।'

ইসমাইল এবার সত্যিই বসল। একটা কয়লার টিনের উনুনে আগুন জ্বলছিল। তিনজনই সেটার কাছে বসল। লছমীর দু'চোখ দিয়ে আজ জল ঝরছে। গিয়াসুদ্দানের প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির পরিচয় দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ইসমাইল, আমার উপস্থিতিতেই তুমি একে জিজ্ঞেস করো—এ সত্যি সত্যি ব্যাভিচার করে কিনা।'

ইসমাইল আশ্বস্ত হল, বলল, 'এ সিং-জীর মোটরে কেন ওঠে—জিগ্যেস করুন।'

'বল লছমী, সত্যি কথা বল, কেন উঠিস ?'

লছমী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'লছমী !' গিয়াসুদ্দীন ডাকল, 'বল, আমি তোর বাপের মতো। কেন উঠিস ?'

লছমী এবার চোখের জল মুছল, তারপর বলল, 'উঠেছি সত্যিই, কিন্তু কোনো দিন ব্যাভিচার করিনি।'

'সত্যি কথা, না আমাদের কথা ভেবে বলছিস ?'

লছমী গিয়াসুদ্দীনের পা দুটোর মধ্যে মাথা ঠুকে বলল, 'ভগবানের দোহাই, খোদার কসম।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'পা ধরবি না। ওঠ, সোজা হয়ে বোস। বল দেখি, কেন উঠিস ওর গাড়িতে ?'

'পুরুষ মানুষ উঠে যদি বেড়ায় তার কোনো দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েরা উঠে বেড়ালেই বুঝি জবাবদিহি করতে হবে ? এ কেমন নিয়ম ? বলুন ?'

'কিন্তু আজ তাহলে চীৎকার করে উঠলি কেন ?'

'আজ সিং-জী জোর করে ওঠাতে চেয়েছিল। ওর মোটরে আরো একজন লোক ছিল—জিলাপসী সায়েবের মালীটা।'

গিয়াসুদ্দীন অবাক হয়ে গেল। এরকম ধরণের নারীশিকারও আজকাল ঘটে থাকে এই শহরে ? কী আশ্চর্য ! পরস্ত্রীকে নিয়ে এইভাবে টানহেঁচড়া করে যেসব পুরুষ, তাদের প্রতি ঘৃণায় তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ইসমাইল হঠাৎ বলল, 'আমি এর কথা তিলার্দ্ধ বিশ্বাস করি না। সারা শহর জানে তুমি সিং-জীর মোটরে ঘুরে বেড়াও। কি দরকারে—বলো তো ?'

লছমী আবার গিয়াসুদ্দীনের পা ধরে বলল, 'বলুন গিয়াসুদ্দীন সাহেব। বড় সায়েবের মেম যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। সেজন্যে কেউ কি তাকে দোষ দিতে পারে ? আমি কখনো সেধে উঠিনি ওর গাড়িতে। আর উঠেছি মাত্র দু'বার। একবার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল জাহানারা বৌদিকে দেখতে। সিং-জী রাস্তায় দেখতে পেয়ে নিয়ে গেল। আর একবার বরুয়াবাবুর ঘর থেকে তাঁর ছেলে দেখে ফেরবার পথে। ইনি মিছিমিছি সন্দেহ করে আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু আমি কেন যাব ?'

ইসমাইল বলল, 'তা হলে তোমার কথা চারিদিকে রটল কেন ?'

'কারণ আর কিছু নয়, আমি পুরুষদের মতো স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করি, তাই পুরুষেরা সইতে পারেনা। আমি নিজেই বাজার হাট করি, বেড়াতে যাই আর সেদিন শ্মশানেও গিয়েছিলাম—সবাই দেখেছে...'

ইসমাইল বলল, 'এইরকম চলতে থাকলে আমার সঙ্গে থাকা চলবে না।'

গিয়াসুদ্দীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কোরাণে কি বলেছে জানো, ইসমাইল ?'

'কি বলেছে ?'

'কোনো স্ত্রীলোককে বিনা কারণে ব্যাভিচারিণী অপবাদ দিলে সেই মানুষকে আশি ঘা বেত মারতে হয়। তুমি এমনি এমনি একে দোষ দিয়ো না। ওর ব্যাভিচারের যদি কোনো স্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তাই বলো। ও নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে, সেটা ওর দোষ নয়, তাই নিয়ে ওকে অপবাদ দিলে সমাজের দোষ, পুরুষের দোষ।'

ইসমাইল এবার অবাক হয়ে গিয়াসুদ্দীন সায়েবের দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্ত শহরখানা এক দিকে আর গিয়াসুদ্দীন সাহেব অপর দিকে। সে বলল, 'সমাজ যা মেনে নিতে চায় না, কেন ও তা করতে যাবে?'

গিয়াসুদ্দীন বলল, 'তোমার সমাজকে গুলি মারো। কেবল সত্যে বিশ্বাস রেখো। যেদিন দেখবে ও সত্যই ব্যাভিচারিণী, তালাক দিবে। এমনি এর ওর তার মুখে শুনে কিছু করতে যেও না। আর লছমী, তোকেও একটা কথা বলি। এখন তুই বিবাহিতা, বেড়াতে যেতে তোর যদি ইচ্ছা হয় দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে যাস না কেন?'

লছমী গিয়াসুদ্দীনের পা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'সে যদি হত, তাহলে তো কোনো বদনাম হত না। কিন্তু এঁর যে ভারি লজ্জা করে।'

'লজ্জা!'

গিয়াসুদ্দীন হো হো করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

□

গিয়াসুদ্দীন সাহেব তাঁর বাসায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়েই দেখেন বসবার ঘরে বসে কে যেন কাঁদছে—যেন কোনো ছোট ছেলে মাকে হারিয়ে ফোঁপাচ্ছে।

গিয়াসুদ্দীন ভিতরে ঢুকে অবাক।

নাসিরুদ্দীন একখানা ইজিচেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'কি ব্যাপার নাসিরুদ্দীন? পুরুষ মানুষ কোথাও কাঁদে নাকি এমন করে? কি হয়েছে বলো।'

নাসিরুদ্দীন হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'এতকাল ধরে সায়েবের খানা রান্না করলাম, আজ সেই সায়েবের হাতেই মার খেলাম। শুধু তাই নয়, পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিল।'

'কেন? কি হয়েছিল?'

'কেন? জিলাপসী সায়েবের স্বভাব জানতে তো বাকি নেই আপনার। জেবউন্নিসাকে ডেকে আনতে বলেছিল। আমি নড়াচড়া করলাম না দেখে, ওর রাইডিং বেত এনে পিঠে সপাসপ্ মারতে লাগল। তারপর কুকুর লাগিয়ে তাড়িয়ে দিল। বুড়ো বয়সে এমন অপমানও কপালে ছিল!'

গিয়াসুদ্দীন গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি কি করছিলে, বুড়ো! লাফ দিয়ে ওর

টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলে না? আজ আমি সিং-জীকে আচ্ছা করে কয়েকটা চড় কষিয়ে এসেছি। তালগোল পাকিয়ে লোকটা কোথায় গিয়ে যেন পড়ল।'

'কেন মারলেন সিং-জীকে?'

'সেই একই কথা, সিং-জী আর জিলাপসীর মালী দুজনে মিলে লছমীকে জোর করে নিয়ে যাবার তালে ছিল। লছমীর চীৎকার শুনে আমি রামলীলার আসর ছেড়ে দৌড়ে এসে দেখলাম ওই কাণ্ড!'

সিং-জীকে চড় মারতে পারে—এমন লোকও তাহলে শহরে আছে? কিন্তু কেন? নাসিরুদ্দীন বলল, 'মেয়েটিও তো সুবিধার নয়।'

'কে বললে সে কথা? লছমী ভালো মেয়ে ও নির্ভীক মেয়ে। বস্তিতে জন্ম বলে কোনো সংস্কার মানবার শিক্ষা পায়নি। পাঁকের মধ্যে থেকেই পদ্ম ফোটে। ইসমাইলটা ভীরু। রামচন্দ্রের মতো জনশ্রুতি শুনে সীতাকে বিসর্জন দিতে চায়। আমি বলে কয়ে লছমীকে বাড়িতে রেখে এসেছি।'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'তাহলে খুব ভালোই হয়েছে।'

'তুমি কি করবে এখন?'

'আমি বাংলো ছেড়ে চলে এসেছি। এখন জেবউন্নিসার কাছে চলে যাব। বাকী ক'টা দিন ওর কাছেই থাকব। আর য়ুরিনয়নে কাজ করব...'

'আর এই অপমান হজম করবে। তা হবে না। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। মালা সিংকে দিয়ে এসো। বড় সায়েবকে কথাটা জানাতে হবে। শহরে এসব ঘটনা বন্ধ করতে হবে। গায়ের চামড়া সাদা হলেই চলবে না, মনটাও সাফ রাখতে হবে।'

নাসিরুদ্দীন জিগ্যেস করল, 'য়ুনিয়ন চিঠি লিখবে?'

'হ্যাঁ।'

পরদিন সকালেই য়ুনিয়নের চিঠি গেল বড় সায়েবের কাছে। নূতন বড় সায়েব একজন এসেছেন—হিগিনস। ফ্লেমিং ফিরে গেছেন। মিসেস ফ্লেমিং অবশ্য এখনো আছেন। কোম্পানীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি এখনো কিছুদিন বাংলোতে থাকবেন। গিরিজনদের সম্বন্ধে তিনি একটি বই লিখছেন। বই লেখা শেষ হলেই তিনি চলে যাবেন। বড় সায়েব যাবার সময় একখানা মোটর গাড়ি রেখে গেছেন। মেমসায়েবের ড্রাইভার হিসেবে দুর্গা নিযুক্ত হয়েছে। নয়নমণিকেও মেমসায়েব ইংরেজি শেখাচ্ছেন। কেবল তাই নয়, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শেখার জন্য মেমসায়েব তাকে লখনউ ভাতখণ্ডে স্কুলেও ভর্তি হতে বলেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই নয়নমণি সেখানে যাবে।

শহরের শ্রমিক সমাজের মনে য়ুনিয়নের নেশা লেগেছে। সদর রাস্তার কাছেই বসেছে য়ুনিয়নের অফিস। সারা দিন ধরে সেখানে লোকেরা আসাযাওয়া করে। কেউ কেউ রাতেও থাকে।

নাসিরুদ্দীনের অভিযোগ সম্পর্কিত য়ুনিয়নের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন

বড় সায়েব। মালা সিংকে ডাকিয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন জিলাপসীর দুর্ব্যবহারের দরুণ। নাসিরুদ্দীনকে পুনরায় কাজে বহাল করার কথাও বলেছেন।

কিন্তু নাসিরুদ্দীন বললেন, 'আর সায়েবদের গোলামী করব না। যে দুটো দিন বাঁচব, নাতনীর সঙ্গে থাকব। সামান্য টাকা জমা আছে ব্যাঙ্কে।'

মিসেস ফ্লেমিং ডেকেছিলেন তাঁর বাংলোয় বাবুর্চি হবার জন্য। নাসিরুদ্দীন গেল না। মিসেস ফ্লেমিং নয়নমণিকে নিয়ে রেখেছেন বাংলোর কম্পাউণ্ডে। মেমসায়েবের তত্ত্বাবধানে থেকে সে এখন সাহেবী রন্ধনপ্রণালী ভালো করে শিখে নিয়েছে। গিয়াসুদ্দীন সাহেবও নাসিরুদ্দীনকে ডেকেছিলেন তাঁর ঘরে এসে রান্নাবান্নার কাজ করতে। সেখানেও সে গেল না।

জেবউন্নিসাকে ছেড়ে ও আর কোথাও থাকতে চায় না। দিন দিন মেয়েটা রুগ্ন হয়ে পড়ছে। আগেকার শ্রী আর নেই। এই সময় ওর সঙ্গে থাকাটাই নাসিরুদ্দীনের উচিত বলে মনে হল।

সে নিয়মিত য়ুনিয়ন অফিসে যেতে শুরু করল। সেখানে বসে গল্প করে সময় কাটায়, আর কাজও করে।

নাসিরুদ্দীন যোগ দেবার পর থেকে য়ুনিয়নের সভ্যসংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে যেতে লাগল। বিশেষত নীচু তলার মজুরদের ভর্তির সংখ্যা বাড়ল।

□

একদিন সন্ধ্যায় জেবউন্নিসা এসে বুড়োকে বলল যে, সেদিন নয়নমণি গিয়েছিল হাসপাতালে। 'কী বলেছে জানো, দাদাজান?'

'কী বলেছে?'

'জিলাপসী নাকি একদিন মিসেস ফ্লেমিঙের ওখানেও হানা দিয়েছিল। তিনি তাকে বিয়ে করতে উপদেশ দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। বড়সায়েবও নাকি একই রকম উপদেশ দিয়েছেন। নয়নমণি এইসব কথা বলে খুব হাসল।'

'হাসবার মতোই কথা। কিন্তু ও কোথায় বিয়ে করবে? ব্যাভিচার করেই মরবে। যুদ্ধ বাঁধবে বলে পথ চেয়ে আছে। যুদ্ধ হলেই ও ছুটি নেবে।'

জেবউন্নিসা বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'কিছু কিছু পুরুষ আছে একেবারে পশু।'

'কিছু কেন? সবাই পশু। কিছু লোক নিজের চেষ্টায় ভালো হয়। এই শহরে একটি মাত্র মানুষের মতো মানুষ দেখেছি—গিয়াসুদ্দীন সাহেব। কত কাল কাটালাম এই শহরে, ওর নাড়ীনক্ষত্র সব আমার জানা। একবার রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী, আমাদের মৌলভি আর খৃষ্টান পাদরির একটা বৈঠক বসেছিল। অনেকদিন আগেকার কথা। মৌলভী বললেন, 'যেদিন মাটি খুঁড়ে বসুমতীকে দুঃখ দিয়ে তেল বের করা হল, সেদিন থেকে ধর্ম রসাতলে গেল।. যন্ত্রের সঙ্গে আল্লার মিল হতে পারে না। শয়তান এসে ঢুকল যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে। তা না হলে এত ব্যাভিচার কেন? পাদরী বলল, 'শয়তান সর্বদাই আছে ও থাকবে। তার চুলের মুঠি ধরে

তাকে বশ করে রাখাটাই আসল কাজ। সেইটাই ধর্ম। যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যখন, যন্ত্র থাকবেই। তাকে নিশ্চিহ্ন করবে কে?' স্বামীজী বললেন, 'মানুষ জন্মের সঙ্গেই ঈশ্বর লাভের অধিকারী হয়। যন্ত্রের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। স্বভাব শোধরাতে গেলে মানুষকে ধর্ম অবলম্বন করে থাকতে হয়। ধর্ম হল মনুষ্যত্ব।' তারপর বুড়ো বলল, 'নাতনী, তুই আগে আগে যা করেছিস, সে হল পশুর কাজ। এখন করছিস মানুষের কাজ।'

জেবউন্নিসা বলল, 'ঠিক কথা।' কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

নাসিরুদ্দীন ওর মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করলেন। কী একটা যেন ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বুড়ো বলল, 'তোর শরীরটা দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে—যত্ন নিচ্ছিস না কেন?

'না, ভালোই আছি তো।'

নাসিরুদ্দীন হাসতে লাগলেন, 'কিছুই আমার নজর এড়ায় না, বুঝলি নাতনী। আমি জানি তুই এখনো ইসমাইলকে ক্ষমা করতে পারিস নি। তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। সংসারে সব মেয়ে কি ঘর গেরস্থালি করার জন্য জন্মায়? দেখবি একদিন তোর বর এসে তোর কাছে আপনা থেকে উপস্থিত হবে।'

'চাই না। আমি কেবল তাকেই চেয়েছিলাম। তাকে পেলাম না যখন, আর কাউকে দরকার নেই।'

'এভাবে মান অভিমান করে জীবনটা নষ্ট করছিস কেন?'

'তাহলে কি আবার ব্যাভিচারিনী হতে বলছেন? যাকে একবার মন দিয়েছিলাম, তাকেই ভালোবেসে মরতে চাই। আর দ্বিতীয় লোককে মন দিতে চাই না।'

'এ তো সতীর পণ। সারা ডিগবয় শহর জানে তুই ব্যাভিচারিণীর মেয়ে। কিন্তু ওরা এখন বুঝতে পারবে আমার মা সতী ছিলেন—সীতা সাবিত্রীর মতো সতী। কথাটা বলতে গিয়ে নাসিরুদ্দীন মনের দুঃখ চেপে রাখতে আর পারলেন না, চোখ দুটো কাঁদো কাঁদো হল। জেবউন্নিসারও চোখে জল এল। এই বুড়ো একমাত্র বুঝেছে ওর পণের কি অর্থ। সে এই পণ রক্ষা করে মায়ের কলঙ্ক ধুয়ে যেতে চায়। এই কথাটা সে আর কাউকে বলেনি, কিন্তু বুড়ো ওর সতীত্ব ব্রত রক্ষার সাক্ষী।

সাতাশ

চ্যাটার্জি মার্কস্-এর শক্ত শক্ত বইগুলো পড়ে বুঝতে পারেন, কিন্তু একটি মেয়ের মনের কথা আজ পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

পান্না হঠাৎ চ্যাটার্জির কাছে পড়াশুনো বন্ধ করে দিয়ে হাসপাতালে আসা যাওয়া করছে, নার্স-এর শিক্ষা নেবার জন্য। তার পরেও কয়েকটা দিন পান্নার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। আগের দিনের মতোই কথাবার্তা হয়েছে। স্ত্রী জাতি সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পান্নার কথায় সায় দিয়েও তিনি যেন ওর মনের নাগাল পাচ্ছেন না। ওদের দুজনের মাঝখানে কে যেন একটা দেয়াল তুলেছে—স্তরে স্তরে শক্ত ইঁট দিয়ে তৈরি সে দেয়াল।

পান্না কাছে থেকেও অনেক দূরে।

একদিন পান্নাদের বাড়ির সামনে সেই অশত্থ গাছটার তলায় পড়ে থাকা কুষ্ঠ রোগীটির মৃত্যু হল। এই একটা লোক ছিল যাকে সায়েব থেকে শুরু করে শ্রমিকেরা পর্যন্ত ঘৃণা করত। অনেক লোক এসে গাছতলায় জড়ো হল। কেমন করে লোকটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা যায়—তা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হল। চ্যাটার্জিও ছিলেন সেই ভীড়ের মধ্যে। মেথরদের পাড়ায় খবর দেওয়া হল, কেউ এল না। চণ্ডীও ছিল দলে; সে কিছু উপায় বের করতে পারল না। ইসমাইলও ছিল, সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কুষ্ঠ রোগীকে কেমন করে ছোঁবে? শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর হেড অফিসে খবর পাঠানো হল, সেখান থেকেও কেউ এল না। আহমদ সাহেব বলে পাঠালেন পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বেলে দিতে। কিন্তু সে কাজ করতেও কেউ এগিয়ে এল না, কুষ্ঠ রোগীকে লোকের এত ভয়।

পান্না অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে খবর পাঠান। ওই একটা মাত্র মানুষ যে তবু একটা কাজ করতে পারে, বাকিরা সব মানুষ নয়, ভেড়া।'

সবাই খুব ক্ষুণ্ণ হল পান্নার কথা শুনে। চ্যাটার্জি খুবই আশ্চর্য হল। তা হলে তিনি যে সব কথা শুনেছেন তা কি সত্যি! পান্না কি তাঁহলে গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে ভালোবাসে? ওদের দুজনের মাঝখানের সেই ইঁটের দেয়াল তাহলে রক্তমাংসে গড়া একজন শক্ত সমর্থ মানুষ। চ্যাটার্জির মনের উপর অন্ধকার নেমে এল।

□

খবর দিতেও হল না। কোত্থেকে যেন খবর পেয়ে গিয়াসুদ্দীন নিজের থেকেই এসে পড়লেন। এসে একবার ভ্যাবাচেকাগ্রস্ত লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ইসমাইল, একখানা চ্যাং তৈরি করো তো।'

চণ্ডীর ওখানে বাঁশ ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই চ্যাং তৈরি হয়ে গেল। গিয়াসুদ্দীন ইসমাইলকে চ্যাংখানার একটা দিক ধরতে বললেন। ইসমাইলের সংকোচ দেখে হেসে হেসে বললেন, 'যাও তাহলে বুড়ো নাসিরুদ্দীনকে ডেকে আনো। আমরা দু'টিতে নিয়ে তা হলে চিতায় তুলব।'

নাসিরুদ্দীন আসতে আসতে আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। দুপুরের রোদ বেশ

কড়া হয়ে পড়েছে। নাসিরুদ্দীন এসে পড়লে পর, গিয়াসুদ্দীন তাকে বললেন, 'তোমারই ওপর ভার পড়েছে—এই অনাথের শেষকৃত্য করার জন্য।'

নাসিরুদ্দীন হেসে বলল, 'বেশ তো। চলুন রওনা হই।'

দু'জনে চ্যাংখানা আগুপিছু দু'দিকে নিজেদের কাঁধের উপর তুলে আস্তে আস্তে শ্মশানের দিকে চলতে লাগল।

পিছন পিছন একটা শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

কুষ্ঠ রোগীর শব বহন করে গিয়াসুদ্দীন-নাসিরুদ্দীন শ্মশানে চলেছে—খবরটা রাষ্ট্র হবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের লোকেরা যেন ভেঙে পড়ল। লম্বা শোভাযাত্রা—নাসিরুদ্দীন-গিয়াসুদ্দীন শব বহন করে আগে আগে চলছে, পিছনে কাতার দিয়ে চলেছে সারি সারি লোক।

কেবল চ্যাটার্জি গেল না শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে, নিজের বাসাতেও ফিরল না। এই শোভাযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মানসী কন্যাটিও যেন একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল।

পান্না আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করল, 'কই, আপনি গেলেন না তো?'

'যার যাবার কথা তিনি তো চলে গেছেন। তিনি গেলেই হল।'

কথা বলার ধরনে স্পষ্ট অভিমানের সুর। পান্না হেসে বলল, 'সব লোকই বুঝি সমান সাহসী হয়? শুনেছি, আপনি নাকি টেরোরিস্ট ছিলেন? টেরোরিস্টদের এত জীবনের মায়া, তা আমি জানতাম না।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'আমার সাহসের পরীক্ষা বুঝি হয়ে গেল? তুমি যেমন পুরুষ সন্ধান করছ, সেরকম পুরুষ না হতে পারি। কিন্তু আমিও পুরুষ।'

পান্না ঠাট্টা করে বলল, 'কে বলল আপনি পুরুষ নন। পৌরুষ দেখাবার জন্যে বুঝি বিশেষ সময়-সুযোগের দরকার?'

'নিশ্চয়। কেবল মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে সাহস দেখালেই তা পৌরুষ হয় না। সাম্রাজ্যবাদের সামনেও দাঁড়াতে হয়।'

বিমূঢ়ের মতো পান্না জিগ্যেস করল, 'সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা কি বলুন দেখি, শুনি। সায়েবরা নাকি?'

'না। এটা এমন এক শত্রু যা সমস্ত জাতটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

চ্যাটার্জির কথায় কেমন যেন রাগত ভাব। পান্না বলল, 'আপনি রাগ করছেন কেন? আপনাকে তো আমি শ্রদ্ধা করি।'

'ভালো তো বাসো না, কেমন কি না?'

পান্না জবাব দিল না। কিছুক্ষণ সেইভাবে গেল, তারপর বলল, 'এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত।'

এর কি অর্থ? চ্যাটার্জি কিছু ধরতে পারলেন না। মেয়েরা কি এরকম অস্পষ্ট কথা বলতেই পছন্দ করে? না না, তিনি গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতা করতে যাবেন না। পান্নাকে তিনি আপন মনেই ভালোবাসবেন। তিনি আর

কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে নিজের বাসার দিকে ফিরে গেলেন। পান্নু বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে শ্মশানে চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। নাসিরুদ্দীন একটা উঁচু মতন জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'বসুন, বসুন, সকলে বসে পড়ুন। এই কুষ্ঠরোগীর কাহিনী শোনাব। প্রত্যেক মজুরের সে কাহিনী শোনা উচিত। য়ুনিয়নের কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও বললেন, 'বসুন। গল্প শুনুন।'

সকলে নাসিরুদ্দীনকে ঘিরে বসল। ইসমাইল, চণ্ডী, মালা সিং, প্রধান—কেউ বাদ পড়ল না। সকলে বসলে পর চিতার কাছ থেকে এলেন গিয়াসুদ্দীন। গিয়াসুদ্দীন এসেই হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা কুষ্ঠরোগী আমাদের সকলের ভেদাভেদ ভেঙে দিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কেউ বাদ পড়ল না এর বেলা। এবার এর গল্প বলো।'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'গল্প নয়, সত্য ঘটনা।'

চণ্ডীও বলল, 'হ্যাঁ সত্য ঘটনা। আমি লোকটাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে।'

নাসিরুদ্দীন এবার বলতে লাগল এই ভিখিরির জীবন কাহিনী।

এর নাম ছিল রামচন্দ্র। তখন সে ছিল তেজী যুবক—আমাদের ইসমাইলের চেয়েও বয়স কম। লোকটা ছিল রিফাইনারীর কর্মী। ওর বাপ ছিল জাতে মেথর। গানে, বাজনায় রামচন্দ্রের মতো ছেলে এ শহরে ছিল না বললেই হয়। আর কি চেহারা! দেখে মনে হত যেন সায়েবের ছেলে। ওর সুন্দর চেহারা দেখে সায়েব ওকে কাজ দিল বয়লারের ময়লা সাফ করার। তখন লেবার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ছিল বাটলার সায়েব। মানুষটা যেন একেবারে টাওলারের উলটো—রোগা পাতলা চেহারা, আর খুবই দয়ালু। বয়লার যখন বেশ তেতে থাকে তখন তার ভিতরের ঝুল সাফ করতে হয়। একদিন রামচন্দ্র এই ভাবে কাজ করছে। এইরকম সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটল। কী ভাবে কী হয়েছিল তা এখন আমার আর মনে নেই। বয়লারের আগুনের হল্‌কা লেগে ওর গায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ল। সেখানেই ও মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকে। তারপর লোকেরা স্ট্রেচারে তুলে তাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাও হল। সায়েব সিভিল সার্জেন এসেছিল ডিব্রুগড় থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লোকটার চেহারা হল শ্বেতকুষ্ঠরুগীর মতো। হাঁটত চলত ধনুকের মতো কুঁজো হয়ে। কাজ করার ক্ষমতা আর রইল না। কে তখন কম্পেনসেশনের কথা ভাবে? সুতরাং তাকে পথের ভিখারী হতে হল। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে খিদে মেটায়। কিছু দিন চলল এইভাবে। মেথর বস্তিতে বেশ কিছুদিন সেইভাবে থাকল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করত। সেই ছেলেটাকে এখনো যেন মনে পড়ে। ক্রমে ক্রমে স্টেশনে যেতে শুরু করল, ভিক্ষে করার জন্যে। কী গলা! আমাদের নয়নমণির মতো—তেমনি মিষ্টি, কোমল ও করুণ। ফিলমের গান সব

ছিল ওর মুখস্থ। কখনো গাইত সাইগলের গান, কখনো পংকজ মল্লিকের। যাত্রীরা মমতাপরবশ হয়ে কখনো কখনো ওকে টাকাটা আধুলিটাও দিয়ে যেত। স্টেশনের প্লাটফর্মেই পড়ে থাকত। কিন্তু কদ্দিন থাকবে সেখানে? ভিখারীরও বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে ক্লান্তি আসে। ক্রমে ক্রমে ওই অশত্থ গাছের তলায় আশ্রয় নিল। প্রথম দিকে কে যেন ওর থাকার জন্যে একটা ছোট ঝুপড়ি তৈরি করে দিয়েছিল। সেখানেই থাকত। তারপর বুঝি কোনো সায়েবের নজরে পড়ল ঝুপড়িটা—হুকুম দিল ওটা ভেঙে ফেলতে। ঝুপড়িতে যারা থাকে সায়েব কি করে তাদের দুঃখ বুঝবে? তবু রামচন্দ্র সেই অশত্থতলা ছেড়ে চলে গেল না—সেখানেই রইল। কিন্তু জোর বৃষ্টি পড়লেই মুশকিল. তখন আবার যায় স্টেশনের প্লাটফর্মে। সেখানেও লোকেরা দূর ছাই করে। কী করে বেচারা। অশত্থ তলায় পড়ে থাকে। বৃষ্টি গায়ে পড়ে, গায়ে শুকোয়। কিন্তু অদ্ভুত লোকটার জীবনীশক্তি—অনাহার অনিদ্রা রোদ-বৃষ্টি কিছুতেই ওকে কাবু করতে পারল না। শেষে নড়াচড়া করতে পারত না, কথা বলতে পারত না। মুখ থেকে বেরোত কেবল একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ। সে-ডাক আপনারা সকলেই শুনেছেন। যখনি সে-ডাক আমার কানে আসত, কেবলি আমার মনে হত—এই তো শ্রমিকের জীবন। এ জীবনে কেবল যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, যন্ত্রণা।'

কাহিনী শুনে সকলের মন ম্লান হয়ে গেল। চণ্ডী শুধোল, 'তবে কি এর কুষ্ঠরোগ ছিল না?'

'না, না। ডাক্তারও বলেছিল ও কুষ্ঠরোগী নয়। বাংলোবাড়িতে যেসব মেথর কাজ করত তারাও তাই বলত। লোকটার জোয়ান বয়সে সায়েবদের মতো ফটফটে শাদা রঙ ছিল আর তেমনি ছিল চটপটে। মেথররা বলত ভগবানের মহিমা বুঝতে পারা শক্ত। পূর্ব জন্মকৃত হয়তো কোনো পাপ ছিল...'

গিয়াসুদ্দীন বলল, 'ওসব বাজে কথা। পাপ-টাপ নয়। লোকটা মরল অনাদরে, উপেক্ষায়, অবিচারে। ও ছিল কোনো বিচারবিবেকহীন লোকের পাপের ফল।'

কেউ প্রতিবাদ করল না। সকলেই নাসিরুদ্দীন-গিয়াসুদ্দীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, বলল, 'আপনারা না থাকলে কেউ চিতায় তুলত না।'

□

সেদিন চ্যাটার্জির অভ্যস্ত দিনকৃত্যে একটা অদ্ভুত ব্যাতিক্রম দেখা গেল।

কাজের পর য়ুনিয়ন অফিসে গেলেন বটে, কিন্তু বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরে চলে গেলেন। অন্য দিন হোটেলে খেতে যান। আজ সোজা চলে এলেন বাসায়। অন্তরে একটি আশার আলো জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেল হঠাৎ। মনে নিরাশার অন্ধকার পেটের খিদে ঘুচিয়ে দিল। বাসায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে, রবি ঠাকুরের একখানা কবিতার বই নিয়ে খুললেন। হাতের বই হাতেই রইল, পড়তে আর

পারলেন না। বার বার মনের পটে ভেসে উঠল পান্নুর মুখচ্ছবি। মনের সিংহাসনে পান্নুকে প্রতিষ্ঠা করলেই বুঝি পান্নুকে পাওয়া যায়?

এই ভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিছু সময় কেটে যাবার পর, হঠাৎ ধারণা হল কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে চ্যাটার্জি বাইরের দিকে তাকালেন। কই, কেউ তো নেই! মনের ভুল নয় তো? আগে আগে পান্নু যেমন পড়তে আসত ওঁর ঘরে, তেমনি আবার সে হয়তো আসতে পারে। এটা কি সেই রকম ধারণার পুনরাবৃত্তি?

পৌরুষ কি? পুরুষের কি গুণ থাকলে মেয়েরা পছন্দ করে? কেনইবা পান্নু তাঁর সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের পৌরুষের তুলনা করল? এ রকম তুলনা করাটা ঠিক নয়। গিয়াসুদ্দীন ভিতরে বাইরে এক, সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই তাঁর আকর্ষণ এমন প্রবল। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের যৌবন তো এখন অস্তমিত। চ্যাটার্জির যৌবন যায়নি। ওঁর জীবনে এই প্রথম প্রেমের জোয়ার। সমগ্র সত্ত্বার মধ্যে তিনি যেন পান্নুর আকর্ষণ অনুভব করছেন। দরকার হলে তিনি পান্নুর পাণিগ্রহণ করতেও প্রস্তুত। এসবের কি কোনো মূল্য নেই? পান্নু কি চায়, একথা পান্নু কখনো খুলে বলেনি। পান্নু বরঞ্চ বলেছে ওঁকে তার ভালো লাগে কি না লাগে—তাও নাকি ও জানে না। কেন? কিছু কাল ধরে পান্নু তাঁকে যেসব মনের কথা জানিয়েছে, সেগুলো তাহলে কি? সেগুলোর নাম কি তাহলে প্রেম না হয়ে অন্য কিছু? চ্যাটার্জির সন্দেহ নেই, সেগুলিই প্রেমের নিদর্শন। তৎসত্ত্বেও হঠাৎ কেন সে ওর ঘরে পড়তে আসা বন্ধ করে দিল? সে কি বুঝতে পারল তার প্রতি এই আকর্ষণ প্রেম নয়? বুঝল যদি কি ভাবে বুঝল? ওর কি কোনো প্রকার সন্দেহ হল?

চ্যাটার্জি বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। পান্নুর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। চণ্ডী এখনো বাড়ি ফেরেনি। চণ্ডী আবার ছন্নছাড়া ঘুরে বেড়ায়। রাতে কখন আসে তার স্থিরতা নেই। কখনো যায় মদের দোকানে, কখনো রামকৃষ্ণ আশ্রমে। চণ্ডী ওঁকে বলেছে, হয় মদ নয় ধর্ম—দুটোর একটা না হলে ওর স্ত্রীসংসর্গ-বর্জিত জীবন যাপন করা শক্ত। কথাটা প্রথম শুনে চ্যাটার্জির মনে হয়েছিল চণ্ডীর লজ্জা একটু কম। এখন সে নিজেও বুঝতে পারছে চণ্ডীর এই কাতরোক্তির অর্থ কি। এর মধ্যে কোনো দর্শন নেই, আছে কেবল নারীর সঙ্গসুখের অভাবমোচন। মদ স্নায়ুকে উত্তেজিত করে একটা শান্তি দেয়। ধর্ম মনকে টেনে নিয়ে যায় রহস্যময় পরমেশ্বরের দিকে। প্রবৃত্তির তাড়না যখন প্রবল হয়, অস্বাভাবিক উপায়ে তাকে দমন করাই হল মদ খাওয়া ও ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য। চ্যাটার্জি এখন তাই করছিলেন—বই পড়ে। ভুলতে চেষ্টা করছিলেন প্রবৃত্তির আহ্বান। কিন্তু পারলেন না। অশরীরী মূর্তি ধারণ করে পান্নু বার বার ঘুরে ফিরে ঢুকছে ওঁর মনে। আসল পান্নুর সঙ্গে এই কল্পিত পান্নুর কোনো সম্পর্কই নেই। এও যেন এক প্রকারের মূর্তিপূজা।

ওঁর মনে হল সব কথা উনি যদি পান্নুকে খুলে বলেন, তা হলে সে তাঁর অন্তরের

প্রেমের কথা বুঝতে পারবে। তারপরেও যদি পান্নু তাঁর প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব না করে, তাহলে অন্য কথা। তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন পান্নুর প্রতি তাঁর যতটা টান, পান্নুর ততটা নয়। আকর্ষণ এক তরফা। কিন্তু কথাটা কি ইতিপূর্বেই পরিষ্কার হয়ে যায়নি ? না, হয়নি এখনো।

অকস্মাৎ পান্নু দোর খুলে বেরিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোয় চ্যাটার্জির শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহর লাগল। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন হয়, তেমনি ধারা হল চ্যাটার্জির।

পান্নু জিগ্যেস করল, 'আজ হোটেলে খেতে যান নি, মাস্টারবাবু ?'

এ কী রকম সম্বোধন ? মাস্টারবাবু হলেন ? চ্যাটার্জির সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। এ তো মানসিক দূরত্ব দীর্ঘায়িত করার সংকেত ! তিনি জবাব দিলেন, 'না।'

'কেন ?'

'খিদে নেই।'

'সুস্থ মানুষ, খিদে নেই বললে চলে কি করে ? ছাত্রীর ওপর রাগ করে না খেয়ে আছেন, এমন তো নয় মাস্টারবাবু ?'

চ্যাটার্জি এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু নীরবতাই হয়ে পড়ল স্পষ্ট জবাব।

'তাহলে তো ছাত্রীকেই শাস্তি পেতে হয়। আসুন, আমাদের এখানে খেয়ে যান, মাস্টারবাবু।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'দরকার নেই।'

পান্নু বলল, 'আমায় বুঝি মাফ করতে পারছেন না ? এত বড়ো টেরোরিস্ট, অথচ এতটুকু ক্ষমাগুণ নেই !'

পান্নু হাসতে লাগল। সে বলল, 'আমায় আপনার এত ভালো লাগে অথচ আমি খেতে দিলে কষ্ট হয়, এটা তো ভালো কথা নয় মাস্টারবাবু। আমি তাহলে খাবার জিনিস আপনার ওখানে রেখে আসব। সাধ্য থাকে তো ফেলে দেবেন।'

আশ্চর্য, পান্নুর এসব কথাবার্তা খুবই আশ্চর্য ! পান্নুর প্রশ্নের সত্যিই কোনো জবাব দিতে পারলেন না পান্নুর মাস্টারবাবু। ছাত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি। পান্নু বাসায় ভাত দিয়ে রেখে এলে পর তিনি গিয়ে ভাত খেলেন।

চ্যাটার্জি খেতে খেতে পান্নুর কথা ভাবতে লাগলেন। এ রকম মায়াদয়ার অর্থ কি ? থালা-বাটি নিতে যখন আসবে তখন পান্নুকে এই প্রশ্ন করবেন বলে মনে মনে তৈরি হলেন। বার বার দোরের দিকে তাকাতে থাকলেন চ্যাটার্জি।

প্রায় ঘন্টাখানেক দোর খোলাই ছিল। চ্যাটার্জির খাওয়া শেষ হল, তবু পান্নুর দেখা নেই। তার পরিবর্তে হঠাৎ চণ্ডীর গর্জন শুনতে পেলেন। মদ খেয়ে এসে চেলা কাঠ দিয়ে পান্নুকে বেদম প্রহার করছে। আর পান্নু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কেন ?

চ্যাটার্জির বুকখানা কেঁপে উঠল এইভাবে ওকে খেতে দিয়ে গেল বলেই কি ?

চ্যাটার্জি বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে অন্ধকার। কেবল চণ্ডীদের বাসায় লণ্ঠন জ্বলছে।

চণ্ডীর বাসায় তখন কেবল পান্নুর কান্নার শব্দ।

দরজাটা বন্ধ। চ্যাটার্জি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'দরজা খোলো।'

চণ্ডী দরজাটা খুলে দিল। চণ্ডীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে চ্যাটার্জি বললেন, 'মদ খেয়ে এসে মেয়েকে ধরে মারপিঠ করছ ? এত তোমার অধঃপতন !'

চণ্ডী ঠাট্টা করে বলল, 'আর লোকের মা মরা মেয়ের সঙ্গে গোপনে প্রেম করাটা বুঝি অধঃপতন নয় ? সাহস যদি থাকে তো বিয়ে করতে চান না কেন ? বরুয়াবাবু আমায় বলছিলেন ; কিন্তু কই, আপনি তো একবারও কথাটা তুলতে পারলেন না ? আমি যখন বাড়িতে না থাকি কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, আসা-যাওয়া সব চলে— আমিই কেবল টের পাই না।'

চ্যাটার্জি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। তিনি বললেন, 'এর মধ্যে গোপন কিছু নেই। পান্নু যদি রাজি থাকে আমি পান্নুকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। আর আসা-যাওয়ার কথাটা তুমি ভুল বুঝেছো। পান্নু আমার ওখানে দিন দু'-তিন গিয়েছিল পড়া বুঝে নিতে। তাছাড়া আজ গিয়েছিল ভাত দিতে। আমি উপোস ছিলাম বলে ওর খারাপ লেগেছিল—তাই খেতে দিয়েছিল। মিনাবাঈ থাকতেও দিত। নিজের মেয়েকে এভাবে অবিশ্বাস করাটা ঠিক নয়, চণ্ডী।'

পান্নুর কান্না থেমে গেল। পান্নু বলল, 'আমার বিয়ে নিয়ে কাউকে আমি ভাববার অধিকার দিতে চাই না, মাস্টারবাবু। সে অধিকার আমার নিজের।'

চণ্ডী রাগতদৃষ্টিতে পান্নুর দিকে তাকাল। কিন্তু চ্যাটার্জি বুঝলেন এ চাহনীতে কোনো কাজ হবে না, চেলা কাঠ দিয়ে বাড়ি দিলেও কিছু হবে না। পান্নু সাৎ করে চ্যাটার্জির সামনে দিয়েই ওঁর বাসার দিকে চলে গেল—থালা-বাটি আনতে।

চণ্ডী অনুতপ্ত হয়ে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না চ্যাটার্জিবাবু। জাহানারা বিবি এর মাথাটা খেয়ে গেছেন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েদের মন বুঝতে পারা ভার। আমরা পুরুষ মানুষ বুঝতে পারি না।'

আটাশ

এ শহরে চাঞ্চল্যকর খবরের অভাব নেই। কিন্তু সবচেয়ে নূতন খবর হল এই যে, য়ুনিয়ন আটাশ দফা একখানা দাবীর তালিকা পেশ করেছে, টাওলার সায়েবের কাছে। সে তালিকায় আছে নিম্নতম বেতন ও বেতনের হার নির্ধারণ, উৎসব পর্বের দিন স-বেতন ছুটি, মাহিনা বৃদ্ধির হার, দক্ষতা বোনাস, চাকুরীকালের নির্ধারণ, গ্র্যাচুইটি, মেডিকেল ছুটি, চিকিৎসার সুবিধা, স্কুল, থাকবার ঘর, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, কেন্টিন, নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি বেশ কিছু দাবী যথাসময়ে টাওলার সায়েবের হাতে দেওয়া হল। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান আর শিখ সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হল।

এমনকি ধর্মের ধ্বজাধারীরাও একে একে এসে য়ুনিয়ন অফিসে ঢুকে আশীর্বাদ করে গেলেন। মৌলভীরা বললেন, এই এল সত্যকার জেহাদ—আল্লার রাস্তা। স্বামীজী বলে গেলেন, য়ুনিয়ন করা মানে ঈশ্বরের সেবা করা। বৌদ্ধমঠের সবাই বললেন, এই তো আসল যজ্ঞ।

সকল লোকের একতা দেখে টাওলারের বুকটা কেঁপে উঠল। শ্রমিকরা এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে আইনসংগত দাবী জানাতে পারবে, এ তিনি ভাবতে পারেন নি। চোখের সামনে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। এই ঘটনাকে তিনি মনে করলেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্পর্ধা।

অসম্ভব সম্ভব হল দেখে টাওলারের চিন্তা হল। ফ্লেমিং ও হিগিনস যা বলেছিলেন, তাই ফলবে নাকি? ছাঁটাই করা পঞ্চাশ জন শ্রমিককে ফ্লেমিং যখন পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন থেকে টাওলারের মনে এরকম একটা আশঙ্কা জেগেছিল। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন শ্রমিকদের মনে এই বিজয় উন্মাদনা বেশি দিন স্থায়ী হবে না। তারা যে এভাবে সংগঠন গড়তে পারবে, তিনি ভাবতেও পারেননি। শ্রমিকদের কড়া শাসনে রাখা ও তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করার যে সব কড়া কড়া নিয়ম আছে, সেগুলি অটুট রাখা এখন থেকে ভারি শক্ত হবে। য়ুনিয়নের দাবীর তালিকাখানা হাতে নিয়ে টাওলার ভারি চিন্তান্বিত হলেন।

হিগিনস-এর সঙ্গে দাবীর বিষয় আলোচনা করার সময়, হিগিনস বললেন, 'একবার দেখুন তো কোন কোন দাবী মেনে নেওয়া যায় এবং মানলে কত টাকা লাগতে পারে।'

টাওলার সেই নির্দেশ পেয়ে, তিনদিন এক নাগাড়ে বসে টাকার হিসাব করলেন। সকল দাবী পূরণ করতে হলে কোম্পানীকে কয়েক লাখ টাকার খরচ বহন করতে হবে। এত টাকা কোম্পানী খরচ করতে যাবে কেন?

টাওলার ভাবল শ্রমিকদের নিম্নতম সুবিধা দেওয়া হয় তো যায়, কিন্তু আটাশ দফা দাবী একসঙ্গে মানতে গেলে খরচের বোঝা বেশি হয়ে যাবে, এবং কোম্পানীর লাভের পরিমাণ কমে যাবে। কথাটা হিগিনসকে জানাল।

হিগিনস হাসতে হাসতে বললেন, 'কোম্পানী দাবীগুলো মেনে নিতেও পারে। সুতরাং চট করে য়ুনিয়নকে 'না' বলাটা ঠিক হবে না। য়ুনিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা চালালে ভালো হয়।'

টাওলার য়ুনিয়নের নেতাদের ডাকিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। মালা সিং স্পস্ট বললেন, 'কোম্পানীর টাকার অভাব নেই, সুতরাং সকল দাবী পূরণ করতেই হবে।' টাওলার বললেন, 'কোম্পানীকে একটা একটা করে দাবী পূরণ করার সুযোগ দিন।' কিন্তু কর্মকর্তারা বললেন, 'তা হতে পারে না।'

টাওলার নেতাদের এই অনমনীয় মনোভাবকে অবাধ্যতা বলে গণ্য করে বললেন, 'আপনারা এভাবে কোম্পানীর অবাধ্যতা করতে যাবেন না। বাইরের রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পড়বেন না। কোম্পানী কি দিতে পারে না পারে, তাও বিবেচনা করে দেখবেন।'

কিন্তু শ্রমিক নেতারা কোম্পানীর অক্ষমতার কথা শুনতেই চাইলেন না। কোম্পানী সরকার থেকে ঋণ পেয়েছে, বছরে এক কোটি টাকা লাভ করেছে, তদুপরি রিজার্ভ ফাণ্ড-এ বহু কোটি টাকা জমা পড়ে আছে। সুতরাং কোম্পানী শ্রমিকদের সব দাবী যদি মেনে নেয়—সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে।

টাওলার হেসে হেসে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনারা শ্রমিকদের খেপিয়ে দিয়ে নিজের পাতে ঝোল টানতে চাইছেন। এরকম দাবী কোম্পানীর পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব।'

□

কথাটা হিগিনস-এর কানে পৌঁছলে পর, তিনি বিমূঢ় বোধ করলেন। তিনি টাওলারকে আর কোনো নির্দেশ দিলেন না। কিন্তু টাওলারের জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা রাগে অসন্তোষে ফেটে পড়ল।

কোম্পানী দাবী মেটাতে অসমর্থ—নেতারা একথা মেনে নিতে রাজী হলেন না। কোম্পানীর কোনো আর্থিক অনটন যে আছে সেকথা তাঁদের চিন্তার অতীত।

টাওলার বসে থাকার পাত্র নন। আলাপ আলোচনার পাট বন্ধ করে তিনি এবার কড়া ভাষায় বিজ্ঞপ্তি দিলেন নোটিস বোর্ডে। বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য এই যে, য়ুনিয়নকে কোম্পানী স্বীকৃতি দিতে পারে না, কারণ এই সংঘের উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের প্রকৃত দাবী নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনায় বসা নয়, পরন্তু কয়েকটা কাল্পনিক ও অপূরণীয় দাবী উপস্থিত করে, কোম্পানীর উপর জুলুম করা। কোম্পানীকে নাস্তানাবুদ করাটাই য়ুনিয়নের আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং শ্রমিকেরা যাতে বিপথে চালিত না হয়, অবাধ্যতামূলক কাজে যাতে লিপ্ত না হয়—সে জন্য সকলেরই সতত যত্নবান থাকা উচিত।

হিগিনস বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে জানতে পারলেন বটে, কিন্তু উপর উপর দেখে তার

মধ্যে দোষনীয় কিছু পেলেন না। তাছাড়া ব্রিটিশদের স্বভাবই হচ্ছে বিভাগীয় অধিকর্তাদের কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া।

য়ুনিয়ন নেতাদের উপর টাওলারের শ্যেন চক্ষু আরো 'শি করে ন্যস্ত হল।

□

একদিন রিফাইনারী যেতে চ্যাটার্জি, ইসমাইল ও চণ্ডীর ঘন্টাখানেক দেরী হল। সেদিন তিনজনারই বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছিল খানাতাল্লাসী করতে। রিফাই-নারীতে ওদের পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে টাওলার সায়েব ওদের তলব করলেন এবং স্পষ্ট বলে দিলেন, 'তিনজনের কাজেই ভয়ানক গাফিলতি হচ্ছে। সুতরাং ওদের একদিনের মাইনে কাটা যাবে।'

চ্যাটার্জি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু টাওলার বললেন, 'কোনো আপত্তি শোনা হবে না। আপনারা এবার যেতে পারেন।'

তিনজনই অফিস থেকে বেরিয়ে রিফাইনারীর দিকে চলতে লাগল। ইস-মাইলের মুখখানা রাগে লাল, সে বলল, 'আগে নিয়ম ছিল সাবধান করে দেওয়া, আজ দেখছি একেবারে মাইনে কাটা গেল।'

চণ্ডী হেসে বলল, 'ওই যে বলে না বড়লোকের ভালোবাসা আর মুসলমানের মুরগী পোষা। এ হল তাই।'

চ্যাটার্জি কিছু বললেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন কোম্পানী উলটে আক্রমণ শুরু করেছে। য়ুনিয়ন সংগঠনের আসল পরীক্ষার সময় আসন্ন।

সেদিন কাজের শেষে তিনজনেই গেল য়ুনিয়নের অফিসে। সেখানে বহু লোক একত্র হয়েছে।

মালা সিং অর্থাৎ সেক্রেটারী তখনো পৌঁছননি। সায়েব নাকি স্টোরের কাজে তাঁকে দু'দিনের জন্য ডিব্রুগড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই দু'দিনের জন্য য়ুনিয়নের কাজ চালাবার ভার পড়েছে একা প্রধানের উপর। লোকটার মাথা ঘুরে গেছে। সেদিন কোনো না কোনো অজুহাতে প্রায় একশো জন শ্রমিককে সাবধান বাণী শোনানো হয়েছে। সকলের একদিনের মাইনে কাটা গেছে। কি করা উচিত ভেবে প্রধান একেবারে হতবুদ্ধি। শ্রমিকেরা সমস্ত য়ুনিয়ন অফিস তোলপাড় করতে শুরু করেছে।

চ্যাটার্জিকে দেখে প্রধানের ধড়ে যেন প্রাণ এল। বললেন, 'য়ুনিয়নের জন্য এক-জন সহকারী সম্পাদক দরকার, চ্যাটার্জি। তা না হলে কাজ চালানো শক্ত হয়ে পড়ছে।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'একজনকে নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে বরুয়াবাবুকে নিলেই সবচেয়ে ভালো হয়।' উপস্থিত সকলেই কথাটা সমর্থন করল— শ্রমিকেরাও।

প্রধান বললেন, 'পরশু মিটিঙের জন্যে আমি নোটিস দিয়েছি। মালা সিং তার

মধ্যে এসে পড়বেন। কিন্তু এইসব যাদের একদিনের মাইনে কাটা গেছে, তাদের ব্যাপারে কি করা যায় ?'

চ্যাটার্জি জবাব দিলেন, 'সমস্ত য়ুনিয়নের নামে প্রতিবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি দেওয়া দরকার।'

'তাহলে চিঠি লিখুন।'

সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জি চিঠি লিখতে বসে গেলেন।

অফিসের এক কোণে বোধন ছিল বসে। সে হেসে হেসে বলল, 'চিঠি টিঠি লিখে লিখে কি হবে বাবু ? এদ্দিন পর্যন্ত কি করতে পেরেছে য়ুনিয়ন ? চিঠি গাদা গাদা লিখে কি হবে ?'

চ্যাটার্জি লিখে যেতে লাগলেন। অন্যদের নজর পড়ল বোধনের উপর। এত তাড়াতাড়ি লোকটা কেন য়ুনিয়নের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল !

চণ্ডী বলল, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে য়ুনিয়নের উপর আস্থা হারানো উচিত হয় না, বোধন। একটু ধৈর্য ধরো।'

বোধন বলল, 'দাবী তো করা হল, কিন্তু লাভ কি হল ? শ্রমিকদের অবস্থা যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। সায়েবরা কিছু করবে না। এখন নেতারা কী করবেন ? কিছু কি করবার আছে ? সায়েবরা যা করার করে। সব নির্ভর করে ওদের মরজির ওপর।'

ইসমাইল চটে উঠল, 'কেন তা হতে যাবে ? য়ুনিয়ন কি করতে পারে না পারে, তা দেখে নেবেন। যদি খারাপ কিছু হয়, তা আপনাদের মতো মানুষের জন্যেই হবে।' বোধন দ্বিধাহীন চিত্তে কিংবা সামাজিকভাবে জামাইকে স্বীকার করে নেয়নি। সে তার মেয়েকেও ত্যাগ করেছিল। ·বোধন হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমার মতো চরিত্রহীন নেতা যখন য়ুনিয়ন চালাচ্ছে, য়ুনিয়ন কি চলতে পারে ?'

কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়াল।

'চরিত্রহীন ?'

'হ্যাঁ।'

এবার সবাই চুপ, কেউ কথা বলছে না, এমনকি প্রধানও। হিন্দু-মুসলমান যুবক যুবতীর স্বাধীনভাবে বিয়ে করার ব্যাপারটা, সহজভাবে মেনে নেবার মতো উদার মনোভাব বেশিরভাগ লোকেরই ছিল না। ইসমাইলকে সবাই সন্দেহ ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখছিল।

চ্যাটার্জি হঠাৎ লেখা বন্ধ করে বোধনের মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'বোধন, এসব কথা তুমি কোন সাহসে বলছো ? অন্যেরাও তোমার বিষয়ে এরকম কথা যে বলতে না পারে, তা মনে কোরো না। কে চরিত্রহীন, কে চরিত্রহীন নয়, তা বিচার করার জন্যে সমাজ আছে। সে কথা তোমার বিচার করার কোনো অধিকার নেই। নিজের চরিত্র শোধরাও, বুঝেছো ?'

বোধন বুঝল এসব কথার অর্থ কি। চ্যাটার্জি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওকে মনে করিয়ে

দিতে চাইছেন, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের সময় সিং-জীর প্ররোচনায় পড়ে বোধন কি করেছিল। বোধন কিছু গুণ্ডা জড়ো করে মারপিট করতে বেরিয়েছিল। চ্যাটার্জির চোখের দিকে তাকিয়ে বোধন স্পষ্ট বুঝতে পারল, চ্যাটার্জি একটু বাঁকাভাবে কোন অভিযোগটা করতে চাইছেন। কিন্তু সহজে মটকাবার মতো মানুষ বোধন নয়। সে বলল, 'শুনেছি চ্যাটার্জিবাবু টেরোরিস্ট। পুলিশ হরদম ওঁর বাসা থানাতাল্লাস করে। আমরা তো টেরোরিস্টদের মতো মারামারি কাটাকাটি করতে চাই না। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, দাবী যদি পূরণ না হয়, তাহলে য়ুনিয়ন নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব? আজ একশো জন মজুরের মাইনে কাটা গেছে। য়ুনিয়ন কি সে টাকা আমাদের দেবে?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'দেওয়া না দেওয়ার কথাটা জানে তোমার প্রভু সিং-জী ও সিং-জীর প্রভু টাওলার। আমরা য়ুনিয়ন থেকে কেবল হক্ কথাটুকু বলতে পারি। তুমি যদি মনেপ্রাণে য়ুনিয়নের সভ্য হও, তাহলে মানুষের মনোভঙ্গ হয় এমন কথা বলছো কেন? সিং-জীর কাছ থেকে বেশ দু' পয়সা হাতে পাওনি তো?'

বোধন স্বপ্নেও ভাবেনি চ্যাটার্জি এরকম কাটা কাটা ঠেস দিয়ে কথা বলতে পারবেন। তার ধারণা ছিল য়ুনিয়নে ওরকম ঠোঁটকাটা উচিত বক্তা কেবল একজনই আছেন, তিনি গিয়াসুদ্দীন সাহেব। বোধন এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এতসব কথা বলে কি লাভ, চ্যাটার্জিবাবু। মজুর চায় কাজ ও তার কাজের দাম। আর চরিত্রের কথা যে বলছেন, একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন? চণ্ডী কি তার পান্নুকে দিল ইসমাইলকে বিয়ে করতে? আপনারা সবাই আমার লছমীকে অনাদরে অবহেলায় যে ভাসিয়ে দিলেন...'

'লছমী ইসমাইলের কাছে গেছে, আপন খুশিতে।' চ্যাটার্জি বাধা দিয়ে বললেন।

'এখন সে কথা বলা খুব সহজ। বিয়েটা করে ফেলেছে কিনা। একবার বাপকে জিগ্যেস পর্যন্ত করল না।' বোধন বলল।

'সে তো লছমীর কথা, লছমীই জানে।' শ্লেষভরে চ্যাটার্জি বললেন, 'বাপ হলেই হয় না বোধন। মেয়েরও বুঝতে পারা দরকার যে তার বাপ একজন আছে।'

বোধন বসে ছিল, এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর নিজের মনে বক্‌বক্ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

চ্যাটার্জি আবার লিখতে বসলেন। য়ুনিয়ন অফিস আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল। ইসমাইল বেশ কিছুটা সময় নিয়ে মজুরদের ওর বিয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। তারপর দরখাস্ত যখন লেখা শেষ হল সবাইকে ডাকল একে একে সই করতে। সই করা হয়ে গেলে, সে চিঠি কালবিলম্ব না করে কোম্পানীর হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাত্রে বাড়ি ফিরতে চ্যাটার্জি ও ইসমাইলের বেশ দেরি হল। চণ্ডী ঘরে না ফিরে রামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে গেল। ইসমাইল বলল, 'চ্যাটার্জি, এখন আর হোটেলে গিয়ে কি হবে। আমাদের বাসাতেই দুটো খেয়ে নেবেন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'বেশ তো, চলো।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ইসমাইলের ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। লছমী কী যেন একটা প্রচারপত্র সামনে নিয়ে লণ্ঠনের আলোয় বানান করে করে পড়ছিল।

চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে বললেন, 'ও লছমী, পড়ছো কি?'

লছমী বলল, 'আচ্ছা, আপনাদের য়ুনিয়নে এখুনি ফাটল ধরেছে নাকি? এটা হুবহু একবার পড়ে দেখুন।'

চ্যাটার্জি প্রচারপত্রটা পড়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'ইসমাইল, পড়ে দেখো। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রচারপত্রের কথার সঙ্গে বোধনের কথাগুলো কেমন মিলে যাচ্ছে।'

ইসমাইলও প্রচারপত্র পড়ে লছমীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি য়ুনিয়নে ফাটল ধরে, তবে তা শ্বশুরের জন্যেই ঘটবে। পারো তো তাকে বারণ করো।'

লছমী হেসে বলল, 'মেয়ে কি বাপকে বারণ করতে পাবে? তাছাড়া বাবার এসব কি আজকের স্বভাব? কত য়ুগ আগের থেকে সিং-জীর সঙ্গে দোস্তি। না, বাবা ঠিক জাহান্নামে যাবে। আমি কিছু করতে পারব না।

চ্যাটার্জি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ও ভাবে বলিস না। মানুষের কী করে কখন অদল বদল হয় কেউ বলতে পারে না।'

ইসমাইল বলল, 'খিদে পেয়েছে, কি আছে খেতে দাও।'

ঊনত্রিশ

সেদিনই আরেকটা ঘটনা ঘটল শহরে—গিয়াসুদ্দীনের সাহেবের ঘরে খানাতাল্লাসি হল। কেবল খানাতাল্লাস নয়, গিয়াসুদ্দীন সাহেবের পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। জেলা থেকে স্বয়ং পুলিশ সায়েব রাওলাট পিস্তলের লাইসেন্স নাকচ করে দিয়েছে। মিশ্র বলছে, গিয়াসুদ্দীন সাহেবের সম্বন্ধে কোম্পানীর সায়েবদের আর ভালো ধারণা নেই। ব্ল্যাক লিস্ট-এ নাম উঠেছে।

খবরটা এনেছিল পান্নু। গিয়াসুদ্দীনের হেন খবর নেই, যা নাকি পান্নু রাখে না। এমন কি লোকটা কি খায়, কোথায় যায়, তারও তন্ন তন্ন হিসাব নিয়ে থাকে পান্নু। কোথা থেকে কি করে সব খবর পায়— সে কথা জিগ্যেস করা নিষ্প্রয়োজন। পান্নু ইসমাইলের বাসায় গিয়ে চ্যাটার্জিদের এই খবরটা দিল।

চ্যাটার্জি বুঝলেন পান্নুর ভাবনা কাকে নিয়ে। তিনি হেসে বললেন, 'পান্নু, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা দুজনেই এখুনি তাঁর কাছে যাব।'

পান্নুও হেসে বলল, 'আপনাদের মতো বন্ধুরা যখন আশ্বাস দিচ্ছেন, ভাবনা করব

কেন? তবে গিয়াসুদ্দীন সাহেবের যে কোনো সান্ত্বনা প্রয়োজন, তা আমি মনে করি না।'

চ্যাটার্জি আবার হাসলেন, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেবের হয়তো নেই, আর কারো তো প্রয়োজন থাকতে পারে।'

পান্নু হাসল, 'এত গভীরভাবে কথাটা যখন ভেবেছেন, আপনাদের বারণ না করাই ভালো। তবে কৃষ্ণপক্ষের রাত, একটা টর্চ নিয়ে বেরোবেন। আমি বরঞ্চ একটা দিয়ে যাই।'

পান্নু চলে গেল। ইসমাইল হেসে বলল, 'পান্নু ঠিকই ধরেছে, এখন হয়তো গিয়ে দেখব গিয়াসুদ্দীন সাহেব বোতল খুলেছেন। কিছুই টলাতে পারেনা লোকটাকে।'

চ্যাটার্জি বিষণ্ণ সুরে বলল, 'বলা যায় না। মানুষের বুকে কখন কি যে আঘাত দেয়—তা আমরা বুঝতে পারি না।'

লছমী বাসার পিছন দিকে থালা-বাটি মাজছিল। খানিক বাদে পান্নু টর্চ নিয়ে ফিরে এল। চ্যাটার্জি ও ইসমাইল কালবিলম্ব না করে গিয়াসুদ্দীন সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হল।

□

চ্যাটার্জি গিয়ে দেখলেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব খোলা আলমারী থেকে একটার পর একটা মদের বোতল বের করে ভাঙতে লেগেছেন। কামরাটায় সব জিনিস খানা-তাল্লাসির পর যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। কোথাকার জিনিস, কোথায় নিয়ে ফেলেছে তার ঠিক নেই। মেঝের উপর জাহানারার একটি ফোটো অনাদরে পড়ে আছে দেখে, ইসমাইল সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'এদের কোনো বিবেচনা নেই। দেখেছেন, জাহানারা বৌদির ফোটোটা কিরকম করে রেখে গেছে!'

গিয়াসুদ্দীন শেষ বোতলটা ভেঙে ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। এই রুমটাতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। ফটোটা বাইরের ঘরেই রেখে দিয়ো। চলো।'

ড্রইংরুমে বসবার পর গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'ইংরেজদের ওপর আমার এতকাল গভীর একটা বিশ্বাস ছিল, আজ সেটা একেবারে ভেঙে গেল। টাওলার যে এত নীচুতে নাবতে পারে—আমার জানা ছিল না। তিনটি জিনিস আমি খুব যত্ন করে রাখতাম—জাহানারার ফোটোটি, পিস্তলটা আর ওই মদের বোতলগুলো। সব ওরা তছনছ করে দিয়েছে। যে কটা বোতল বাকি ছিল, সেগুলোও শেষ করে ফেললাম। এখন আমি দড়িছেঁড়া গোরুর মতো, কোনো বন্ধন নেই। বড় খিদে পেয়েছে। চলো, কোথাও গিয়ে একটু খেয়ে আসি।'

ইসমাইল জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়ে খাবেন?'

'স্টেশনের দিকেই চলা যাক।' এই বলে চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে গিয়াসুদ্দীন

বললেন, 'য়ুনিয়ন অফিসে গিয়েছিলাম। প্রধানের কাছে সব কথা শুনলাম। বরুয়াকে সহকারী সম্পাদক করতে হবে। আর...'

গিয়াসুদ্দীন চেয়ার ছেড়ে উঠে এবার মেঝের উপর পায়চারি করতে লাগলেন।

চ্যাটার্জি জিগ্যেস করলেন, 'মাইনে কাটার কথা শুনেছেন?'

শুনেছি। কিন্তু সে সব নগণ্য ব্যাপার। মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধে নামলে তীরবিদ্ধ হলাম বলে দুঃখ করে লাভ নেই। আমি ভাবছি কেবল বোধনের কথা।'

'আমারও একই রকম সন্দেহ', চ্যাটার্জি বললেন।

গিয়াসুদ্দীন চ্যাটার্জির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'কাজ করে যেতে হবে। ভয় করে কিংবা সন্দেহ করে কোনো লাভ নেই।'

ইসমাইল পকেট থেকে সিগারেট বের করে ওঁদের দু'জনকে দিল, নিজেও একটা ধরাল।

সারা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। একটু পরেই তিনজনই স্টেশনের রেস্তোরাঁতে খাওয়ার জন্য বেরোল। কেবল গিয়াসুদ্দীনই খেলেন, অন্য দুজন কেবল এক কাপ করে চা খেল। খাবার সময় কিংবা পথে যেতে যেতে ওদের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি। তার কারণ গিয়াসুদ্দীন নিজেই। পুলিশের আচরণে তার মনটা খুবই বেজার। বিশেষ করে পিস্তলটার বিরহ ওঁর পক্ষে সহ্য করা শক্ত। বিপদে আপদে পিস্তলটাই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। এখন যেন তিনি একেবারে নিঃস্ব নিরালম্ব হয়ে গেলেন।

গিয়াসুদ্দীন সাহেবরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসছিলেন নেপালী মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে। তেলের শহর তখন সুষুপ্তিতে মগ্ন, এমন কি একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না।

কারো মুখে কথা নেই।

নেপালী মন্দিরের কাছে প্রকাণ্ড বড় গাছটার তলায় একটা মোটর গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা গেল। ইসমাইল টর্চটা জ্বালাল। টর্চ-এর আলোয় সিং-জীর মোটর গাড়ির নম্বরটা জ্বল জ্বল করে উঠল। 'এ-লোকটা এখানে কেন এখন?' গিয়াসুদ্দীন সন্দেহের সুরে জিগ্যেস করলেন।

গাড়িটা চলে যেতে তিনজনেরই কেমন যেন সন্দেহ হল।

তিনজন যখন গাছটার তলায় গিয়ে পৌঁছল, গাছের ওদিক থেকে একজন লোক এসে বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেব, ভারি একটা সন্দেহ জেগেছে আমার মনে। সিং-জীর মোটর এখানে দাঁড়াল, তারপর বোধন একটা পোঁটলা নিয়ে নেপালী মন্দিরের ভিতরে ঢুকল। এখনো বেরোয়নি, কিন্তু গাড়িটা চলে গেল। ভিতরে বোধন কি করছে একবার দেখা ভালো।' লোকটা চণ্ডী।

একথা শোনার পর সবাই ভিতরে যেতে রাজি হয়ে গেল। কারণ যেখানে বোধন ও সিং-জী আছে, সেখানে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। বিশেষ করে এই গভীর রাত্রে।

চণ্ডী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঘরে ফিরছিল। পথে এই দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন সাহেব ও আরো দুয়েকজন নেপালী মন্দিরের চত্বরে ঢুকে একেবারে মন্দিরেব প্রবেশ পথের কাছে গিয়ে দাঁডালেন। মন্দির সুনসান, একেবারে নিঃঝুম। চণ্ডী বলল, 'ও নিশ্চয় লুকিয়েছে কোথাও। ওকে খুঁজে বের করতে হবে। ইসমাইল, তুমি বরঞ্চ পোঁটলাটা খুঁজে বের করো। এখান থেকে ও পালাতে পারবে না, চারিদিকে দেয়াল আছে।'

গিয়াসুদ্দীন হঠাৎ আমগাছের তলায় একটা লোককে দেখতে পেলেন। গম্ভীর গলায় ডাক ছিলেন, 'বোধন, এদিকে এসো।'

প্রথম প্রথম লোকটা নডাচডা না করে দাঁডিয়েই ছিল। গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'তুমি ধরা পড়ে গেছো, এদিকে এসো—সামনে। পোঁটলা কোথায় রেখেছো দেখিয়ে দাও।'

ইসমাইল আমগাছের তলার দিকে টর্চ-এর আলো ফেলল।

এবার বোধনের পালাবার আর উপায় রইল না। সে এগিয়ে এসে কাঁওমাঁও করে সোজা গিয়াসুদ্দীনের পায়ের তলায় পডল, তারপর নিজের থেকেই বলল, 'হাতেনাতে ধরা পডে গেছি। মিথ্যে কথা বলে কোনো লাভ নেই গিয়াসুদ্দীনবাবু।'

চণ্ডী জিগ্যেস করল, 'পোঁটলাটা কোথায় রেখেছো?'

বোধন বলল, 'মন্দিরের প্রবেশ পথে সিঁড়ির ওপর আছে।'

'কি আছে তাতে? সত্যি করে বলো।' গিয়াসুদ্দীন বলল।

বোধন প্রথম প্রথম ইতস্তত করছিল, তারপর বলল, গো-মাংস।'

চণ্ডীর সারা শরীর শিউরে উঠল, বলল, 'তোর মুখ দেখলেও পাপ। মন্দিরে কি বলে গো-মাংস রেখে এসি?' তারপর গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে চণ্ডী সমস্ত ষডযন্ত্রটার বিষয়ে ওর নিজের অনুমান বিশদ করে বলল।

চ্যাটার্জি বললেন, 'চণ্ডী, ওসব কথা এখন থাক। এখুনি পোঁটলাটা তোমায় নিয়ে যেতে হবে, বোধন। সকালবেলা ভক্তেরা যদি দেখতে পায়, সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। তারা তো বুঝবে না তোমার মতো অধঃপতিত কোনো হিন্দুর কাজ এটা। সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে একটা। নাও, এখুনি পোঁটলাটা নিয়ে এসো।'

বোধন বলির পাঁঠার মতো ঠকঠক করে কাঁপছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে গো-মাংসের পোঁটলাটা আনতে গেল।

চ্যাটার্জি গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঘটনাটা চেপেচুপে যাওয়াই ভালো। হাজার হোক লছমীর বাপ তো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লাগাবার জন্য কী বিরাট একটা ষডযন্ত্র হচ্ছিল, তা এখন বুঝতে পারছি।'

ইসমাইল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়! কাল সকালবেলা নেপালীরা যদি খবরটা পায়, তাহলে ওর ঘাডে মাথা থাকবে না। তাই আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশকে বুঝিয়ে দিয়ে, পুলিশের হাতেই ওকে

তুলে দিলে আমাদের কর্তব্য সমাধা হবে। আর সেই সঙ্গে প্রধানকেও খবর দেওয়া উচিত—প্রধানের অগোচরে আমাদের কোনো কাজ করা ঠিক হবেনা।

ইসমাইলের মুখে এই বিজ্ঞজনোচিত কথা শুনে গিয়াসুদ্দীন হেসে বললেন, 'এখন ঠিক মরদের মতো কথা বলছে ইসমাইল। বোধন যা করেছে তার ক্ষমা নেই। ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ। হ্যাঁ, প্রধানকেও ডেকে আনা উচিত। চ্যাটার্জিই চলে যান।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চ্যাটার্জি ওখান থেকে চলে গেলেন। বাকী ক'জন উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রধানের ফিরে আসার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওদের মন বিষাদে ভরে গেল। সিং-জীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন শয়তান রয়েছে।

□

প্রধান এলেন। ধর্মভীরু লোকটার মন প্রথম প্রথম বোধনের প্রতি রাগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নয়নমণির বেলা যেমন বলেছিলেন, সেই একই কথা বললেন বোধনের বিষয়ে, 'ওকে এখানেই কেটে ফেলি।'

গিয়াসুদ্দীন হেসে বললেন, 'এত রাগ করলে কোন কাজ হবে না, প্রধান। রাগে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরো। পুলিশের হাতে দিয়ে দি, তারা যা করতে চায়, করুক।'

প্রধান বলল, 'কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত তা মানবে কেন ?'

এইবার সকলে চুপ।

গিয়াসুদ্দীন একটু থেমে রইলেন, তারপর প্রধানকে বললেন, 'দেখো প্রধান, পুরোহিতকে যা বলবার, সে তুমিই বলবে। সব কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। মন্দিরের শুদ্ধির জন্যে যদি পূজো-আর্চা করতে হয়—তো করুন। সে খরচ আমরা বহন করব। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তুমি এখানে থাকো, চণ্ডীও থাকুক। আমি বোধনকে নিয়ে থানায় যাই।'

প্রধান অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলেন গিয়াসুদ্দীনের দিকে। একি সম্ভব? পুরোহিতকে কি রাজি করানো যাবে? কিন্তু এছাড়া অন্য উপায় তো নেই। এরকম একটা সিদ্ধান্ত না হলে, সারা শহরে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। য়ুনিয়নের ক্ষতি হবে। কেবল তাই নয়, সমস্ত আন্দোলনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। পুরোহিতকে যেনতেনপ্রকারেণ রাজি করাতেই হবে। ধর্মের কি বিধান, প্রধান নিজে কতটুকুই বা জানে, কিন্তু পুরোহিত নিশ্চয় একটা কোনো উপায় বের করতে পারবেন।

তবু যেন প্রধানের অস্বস্তি ঘুচল না। গিয়াসুদ্দীন আবার বুঝালেন, 'দেখো প্রধান, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। অশান্তি দূর করাটাই আসল ধর্ম'।

প্রধান বললেন, 'আমার পক্ষে কাজটা শক্ত হবে। কিন্তু করব—যেমন করে হোক। তোমরা তাহলে যাও।'

গিয়াসুদ্দীন বুঝলেন প্রধান কাজটা যখন করবেন বলেছেন—নিশ্চয় করবেন।

নেপালী মন্দির পরিচালনা কমিটির তিনি একজন প্রধান, য়ুনিয়নেরও অন্যতম প্রধান। প্রধানের সততা ও অভিমতের উপর নেপালী সম্প্রদায়ের আস্থা আছে। প্রধানের কাছ থেকে নিশ্চিতি পেয়ে গিয়াসুদ্দীন নিশ্চিন্ত হলেন।

বোধনের দিকে তাকিয়ে এবার গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'বোধন, এবার পোঁটলাটা তুলে চলো আমার সঙ্গে।'

বোধন তখনো ভয়ে কাঁপছে, প্রধানের রাগত মূর্তি দেখে ওর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল। সে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে মন্দির থেকে বেরোল। ওর পিছন পিছন চললেন গিয়াসুদ্দীন ও ইসমাইল।

চণ্ডী গভীর দুঃখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ত্রিশ

থানার ভিতরে তখন মিশ্র বসে। গিয়াসুদ্দীনের কথা শুনে তিনি হতভম্ব হলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু সিং-জী কিছুক্ষণ আগে এসে আমায় কি সব বলে গেছে জানেন?'

'কি?'

'বলল যে গিয়াসুদ্দীন সাহেব আর ইসমাইল গিয়ে নেপালী মন্দিরের কাছে নাকি গো-মাংস ফেলে এসেছে। কিন্তু ও যদি ডালে ডালে থাকে, আমি থাকি পাতায় পাতায়। কিন্তু সরকারের চাকরী করি, মুখে কিছু বলতে পারি না।' তারপব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওই সিং-জীকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

ইসমাইল বাইরেই বসেছিল, মিশ্র বললেন, 'ওকেও ডাকুন না। একটু গরম পানি খাওয়া যাবে। চলুন আমার বাসায়।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'যাকগে, দরকার নেই।'

'কেন?'

'সেই যে আপনারা খানাতাল্লাস করে গেলেন, তারপর আলমারী থেকে বোতলগুলো বের করে একে একে ভেঙে ফেলেছি। আর খাব না ওসব মূত—এই ঠিক করেছি।'

মিশ্রের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল, বললেন, 'দেখুন, আমরা চাকর। হুকুম তামিল করি, অর্ডার-মাফিক কাজ করতে হয়। আপনার পিস্তলটা আনবার জন্যেই লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সব কিছু লণ্ডভণ্ড করবে জানলে আমি নিজেই যেতাম।'

গিয়াসুদ্দীন গর্জন করে উঠলেন, 'ওই সব ব্যাখ্যা আমায় আর দিতে যাবেন না। গৃহস্বামী না থাকতে ওভাবে খানাতাল্লাস করাটা নিয়মবহির্ভূত হয়েছে। অন্য

সময়ে হলে লড়তাম হয়তো, কিন্তু সে সময় পার হয়ে এসেছি। এখন বুঝেছি আমার আসল কর্তব্য কি। স্ত্রী, মদ আর পিস্তল—এতদিন এই সব ছিল আমার প্রাণ। কিন্তু দুটো যখন হাতছাড়া হয়েই গেল, তৃতীয়টা নিজের খুশিতেই পরিহার করলাম। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। জাহানারা চলে গেছে—তার সঙ্গে তার সন্তানও। পিস্তল ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। আত্মরক্ষার জন্যে দুশ্চিন্তা ছিল না। অন্য একটা চিন্তা ছিল মনে—যখন ব্যর্থতা ও পরাজয়ে জীবনটা চুরমার হয়ে যাবে, তখন সেই সঙ্গে জীবনটাও শেষ করে দেব ভেবেছিলাম। কথাটা আপনি হয়তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রকৃত মানুষ হলে বুঝতেন। প্রকৃত মানুষ যখন দেখে যে জীবনের অর্থ হারিয়ে গেছে, তখন মরণকে সাপটে ধরে। আত্মহত্যা তখন হয় আত্মরক্ষা। সত্যি বলছি, আমি এক মুহূর্তের জন্যও অনর্থক বেঁচে থাকতে চাই না। পিস্তলটা চলে গেল বলে আমার একটা ভরসা হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ মনে হল সকল ভরসা শেষ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একটা পথ পেয়ে গেলাম—ত্যাগের পথ। আমার প্রিয় বস্তুগুলো তো রক্ষা করতে পারলাম না, সুতরাং মদের বোতলগুলো রেখে কি হবে? তাই ভেঙে ফেললাম, আর ছোঁবনা।'

মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'তবে তো আর উপায় নেই। চা একটু খাবো আসুন তা হলে। কিন্তু আমার কি মনে হয়েছে জানেন—এই তিনটি জিনিস আসলে আপনার ত্যাগ করার মতো জিনিসের প্রতীক মাত্র।'

গিয়াসুদ্দীন কিছুক্ষণ মিশ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, বুঝলেন মিশ্র কি বলতে চাইছেন।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুটা সময়।

গিয়াসুদ্দীন বুঝলেন মিশ্র তার ঘরোয়া জীবনের অনেক কথা জানেন। পান্নুর মুখখানা ওঁর হৃদয়ে বিদ্যুৎ শিখার মতো চমক দিয়ে গেল। মিশ্র তা হলে বলতে চান গিয়াসুদ্দীনের সত্যিকার ত্যাগ তখন হবে, যখন তিনি পান্নুকে ত্যাগ করতে পারবেন? গিয়াসুদ্দীন সাহেব সত্যিই চেয়েছিলেন পান্নুকে। জাহানারার বিশ্বাস ছিল যে পান্নুর মধ্যে সে থাকবে, আর পান্নুকে পেলেই গিয়াসুদ্দীন জাহানারাকে পাবেন। একথাটা সকলেরই জানা কথা। মিশ্র কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের মনের কথাটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু পান্নুকে ত্যাগ যখন করেছেনই, গিয়াসুদ্দীন সাহেব পান্নুর কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। সেইজন্য তিনি বললেন, 'চা খেতেও ইচ্ছে করছে না, মিশ্র। এবার আসল কথায় আসা যাক।' গিয়াসুদ্দীন একটু থেমে বললেন, 'একটা এজাহার দিয়ে যাই?'

'কার বিরুদ্ধে?' মিশ্রের মনে কৌতূহল।

'সিং-জীর বিরুদ্ধে। আর...'

'আর?'

'টাওলার সায়েবের বিরুদ্ধে।'

মিশ্র বললেন, 'টাওলার সায়েবকেও জড়াবেন ?'

'হ্যাঁ। আপনি বোধনকে ডেকে জেরা করুন। সংগীতের শুরুতে যেমন তা-না-না-না, এ কাজের সূচনা তেমনি টাওলার সায়েবের বাংলোতে।'

মিশ্র বোধনকে ডেকে পাঠালেন।

হাজত থেকে দু'জন পুলিশ বোধনকে মিশ্রের সামনে হাজির করল।

বোধন তখনো কাঁপছে।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'বোধন, বলো তো। দারোগাবাবুর সামনে সত্যি ঘটনা বলো।'

মিশ্রও বললেন, 'বলো।'

বোধন নীচু গলায় বলল, 'গিয়াসুদ্দীন সাহেবের কাছে সব কথা বলেছি, দারোগা-বাবু। আর আমার কিছু বলবার নেই।'

মিশ্র জেরা করলেন, 'তুমি সায়েবের বাংলো থেকে গো-মাংস এনেছিলে ?'

'হ্যাঁ'।

'সঙ্গে সিং-জী ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, দারোগাবাবু...'

'কেন একাজ করতে গেলে ?'

'সিং-জী আমায় পনরো টাকা বকশিস দিয়েছিলেন।'

'আর কিছু বলেছিলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। বলেছিলেন মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

মিশ্র পুলিশ দু'জনকে বলে দিলেন, 'যাও, ওকে নিয়ে যাও।'

পুলিশ দু'জন বোধনকে হাজতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মিশ্র কি যেন লিখলেন। আর গিয়াসুদ্দীন সাহেবের সইও নিলেন। বোধনের জবানীতে কোনো লুকনো ছুপানো নেই—সব স্পষ্টাপষ্টি। বোধনকে নিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরে গিয়াসুদ্দীন সাহেব থানা ছেড়ে চলে গেলেন। প্রধান লোক পাঠিয়েছে বলতে, গিয়াসুদ্দীন যেন নেপালী মন্দিরে একবার যান। স্বামীজী সেখানে রয়েছেন, চ্যাটার্জিও।

ইসমাইল ও গিয়াসুদ্দীন দু'জনে আবার চলতে লাগলেন নেপালী মন্দিরের দিকে।

নেপালী মন্দির পৌঁছে গিয়াসুদ্দীন লক্ষ্য করলেন প্রধানের মুখে হাসি। তার অর্থ স্পষ্ট—নেপালী মন্দিরের পুরোহিত শুদ্ধি কর্ম করতে সম্মত হয়েছেন।

রাত গভীর হলেও বেশ কিছু লোক সেখানে একত্র হয়েছে। সকলেই প্রধানকে ধরেছে, সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ যেন বড়সাহেব আর সংযুক্ত কংগ্রেস মন্ত্রী বরদলৈর কাছে পাঠানো হয়। পরামর্শদাতা হলেন স্বয়ং চ্যাটার্জি। সেই কথা আলোচনা করার জন্যই প্রধান ওঁদের ডেকে এনেছেন। প্রধানের বাসায় এই ব্যাপার নিয়ে একটি জরুরী অধিবেশন বসবে। রাত পোহাতে আর বেশি দেরি ছিল না। কাজে কাজেই গিয়াসুদ্দীন সাহেবরা সবাই মিটিং করতে রাজি হয়ে গেলেন। টাওলার ও সিং-এর এই অপকর্মের বিরুদ্ধে য়ুনিয়নকে সোচ্চার হতে হবে।



ধীরে ধীরে রাত পোহাল।

প্রধানের ঘরে লোকে লোকারণ্য। পূর্বচিন্তিত অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বড় সায়েবের কাছে সকাল বেলাতেই অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

চ্যাটার্জি একবার জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে সময়োচিত আবেগে গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে হঠাৎ বললেন, 'শুনুন, আমরা সকলেই হেড অফিস যাই। তাহলে হয়ত টাওলার বুঝবে গণশক্তি কাকে বলে।' গিয়াসুদ্দীন দেখলেন প্রস্তাবটা মন্দ নয়। প্রধানও সমর্থন করলেন।

এক ঘন্টার মধ্যে এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর কাছে বহু লোক জড়ো হল। প্রায় হাজার দুই লোক হাজির হল সেখানে।

যে জায়গায় একদিন পঞ্চাশ জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্নিয়োগ দাবী করে জনসমাবেশ হয়েছিল, আজ সেখানে লোকে লোকারণ্য। আজ অশ্বারোহী সৈনিক কেউ নেই। তাই লোকে অনায়াসে পথ অতিক্রম করে একেবারে টিলার উপরে উঠে গেল।

বড় সায়েব বদলি হয়ে গেছেন। নূতন বড় সায়েব ধীর, স্থির, গম্ভীর—বয়সের অনুপাতে বিচক্ষণ। তিনি নেতাদের ভিতরে ডেকে নিয়েছেন।

বড় সায়েবের সঙ্গে টাওলারও আছে। জিলাপসী ও টেইনস তখন অফিসে ঢুকছেন।

পুলিশও এসেছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মিশ্র এক ডজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসের বারান্দার নিকটস্থ বাগানে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আগেকার দিনের মতো ভয় নেই। শিলং-এ বরদলৈ সরকার গদিতে আছেন। সুতরাং আগেকার মতো পুলিশ আর বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। সায়েবরাও বুঝতে পেরেছেন দিনকাল বদলে গেছে।

খালি ইসমাইল আসেনি। বাপের দুর্দশা নিয়ে লছমীর খুবই চিন্তা—সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। সকাল হতেই ইসমাইলকে সঙ্গে করে থানায় গেছে—জামিনে যদি খালাস করতে পারে।

চণ্ডী এসব খবর এনেছে।

লছমীর দুঃখ দেখে চণ্ডীরও খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু উপায় কি? বোধনের অপরাধ অমার্জনীয়। কেবল যে সে গোমাংস স্পর্শ করেছে তাই নয়, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লাগাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক—বোধন শয়তানের কবলে পড়েছে।

চণ্ডীর মনে গভীর আঘাত লেগেছে। দ্বারভাঙ্গা জেলার সেই দেশ গাঁয়ের কথা ওর মনে পড়ছে। সেখানে রোজগার ছিল না, সন্দেহ নেই। এখানে রোজগার আছে, কিন্তু ধর্ম ও সদাচার সব কিছু লোকে পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। গাঁয়ে থাকলে ইসমাইল কি কখনো বোধনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত? কখনো পারত না, কিন্তু এখানে পেরেছে। এখানে কোনো

বাধা বাঁধন নেই, সমাজ নেই। আর বোধন ? গাঁয়ে থাকলে সে কি কখনো এরকম অনাচার করতে সাহস করত ? সব বাঁধন এখানে খুলে গিয়েছে। এর পরিণাম কি ? এই কথাটাই কাল সারারাত ধরে স্বামীজীর সঙ্গে চণ্ডী আলোচনা করেছিল। নেপালী পুরোহিত ও প্রধানের সঙ্গেও পরে এবিষয়ে ওর অনেক আলোচনা হয়। স্বামীজী বললেন যুগধর্মকে অস্বীকার করা শক্ত, ধর্মকে সংস্কার করতে হবে। পরমহংস ও বিবেকানন্দ তাই করে গেছেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজও তাই করছে। অতীতে শংকরাচার্য, কবীর, নানক, চৈতন্য, শংকরদেব- এঁরাও তাই করে গেছেন। তা না হলে ধর্ম থাকত না। ধর্ম ছেড়ে মানুষ থাকবে কি করে ?

চণ্ডীর কাছে এবার এসে দাঁড়াল বুড়ো নাসিরুদ্দীন। এসেই জিগ্যেস করল, 'কিছু কি বুঝতে পারছ, চণ্ডী ?'

'কিসের কথা ?'

'ধর্ম নেই। আল্লার রাস্তা লোকে ছেড়ে দিয়েছে। কাল রাত্তিরের ঘটনার কথা শোনবার পর থেকে মনটা মক্কার দিকে ঝু কেছে। ভাবছি হজ করতে যাব। শয়তানের রাজত্বে আর থাকা যায় না। আল্লার রাজ্য কবে হবে জানি না। কেয়ামতের দিনে এসব লোক কি করে তিষ্ঠোবে ?'

'কাদের কথা বলছ ?'

'এইসব শয়তান মানুষেরা।'

চণ্ডী হেসে হেসে বলল, 'একজনকে তুমি মানুষ করে তুলেছো। সেইটাই পথ। জেবউন্নিসা কেমন আছে ? মিনুবাই থাকতে প্রায় ওর দেখা পেতাম। কিন্তু তখন ওকে ঘেন্না করতাম। এখন বুঝেছি সে সত্যের পথ চিনে নিতে পেরেছে। সেই পথই ভগবানের পথ। শয়তানের পথ ছেড়ে ভগবানের পথ গ্রহণ করাই হল ধর্ম।'

নাসিরুদ্দীন হেসে উত্তর দিলেন, 'ওকে দেখলে আশা হয়। একেবারে বদলে গেছে মেয়েটা। কিন্তু ওর শরীরটা দেখে দুঃখ হয়।'

'কেন, কি হয়েছে ?' চণ্ডী কৌতূহলবশত জিগ্যেস করল।

'মেয়েদের মন বুঝা ভার। কিছু একটা অসুখ ওকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। বলে লিভার খারাপ। কিন্তু আমি তো জানি পাগলী সতীত্ব রক্ষার পণ নিয়েছে। মনে প্রাণে দিনরাত খালি একটি লোকের চিন্তায় ও মগ্ন থাকে। আমি তো ওকে জানি। ও জানাতে চায় ও ব্যাভিচারিনী নয়, সতী। কিন্তু মনটার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেহটার অবনতি ঘটছে। একেবারে অস্থিচর্মসার...'

'সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতো শোনাচ্ছে যেন। ভালোই। পান্নুর মনও দেখছি ওই দিকে যাচ্ছে। মেয়েদের মন কেবল এক দিকেই ঝোঁক নেয়—পুরুষের দিকে। ওদের প্রেমের কোনো পুরুষের মধ্যে ওরা পরমপুরুষের সন্ধান করে।' চণ্ডী এবার থামল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলল, 'আমার মনও ধর্মের প্রতি ঝুঁকছে ক্রমাগত। আমি শান্তি চাই, মুক্তি চাই।'

দুই বুড়ো মিলে অনেকক্ষণ ধরে ধর্মকথা আলোচনা করল।



খানিকক্ষণ বাদে ইসমাইল এসে পৌঁছল। ওর মুখে হাসি নেই। চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'কিছু হল না। কেবল চোখের দেখা হল।'

চণ্ডী ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'বোধন কেমন আছে?'

'কাঁদছে। পুরুষ মানুষকে এভাবে আগে কখনো কাঁদতে দেখিনি। রাতটা হাজতে কাটিয়ে ওর মনে খুবই যন্ত্রণা। এখন বুঝতে পারছে ওর আসল বন্ধু কারা। সিং-জী একবারও আসেনি। রাতে একজন সামান্য মজুরের কি হল না হল তা নিয়ে না সিং-জীর মাথা ব্যথা না টাওলার সায়েবের। বোধন তো লোভের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গ মাত্র।'

'আর ও কি করল?'

'লছমী? প্রথমে খুব কাঁদল। তারপর হঠাৎ বাপকে খুব গালাগাল দিতে লাগল। বাপের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করল। তারপর বলল, 'ভালো হয়েছে উচিত শাস্তি হয়েছে। শাস্তি হওয়াই ভালো যদি বাপের শিক্ষা হয়।'

'তবে তো ঠিকই বলেছে। ওর জন্যে আমার ভারি ভয় ছিল। বোধনকে নিয়ে এর পর কি করবে?'

'কি আর করবে? কেস টিকবে না। গিয়াসুদ্দীন সায়েব টাওলার আর সিং-জীর বিরুদ্ধেও এজাহার দিয়ে এসেছেন। কাজেই ঢেউ একটু উঁচুতে উঠতে না উঠতে, ধপ করে নিচে নেমে যাবে।' ইসমাইল একটু থেমে জিগ্যেস করল, 'এখানে কি হচ্ছে?'

'কথাবার্তা।'

নাসিরুদ্দীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বলল, 'কিছু যে হবে আমার তা মনে হয় না। চারিদিকে অন্ধকার দেখছি। আমি হজ করতে যাবই যাব।'

ইসমাইল বলল, 'তুমি না হয় হজ করতে গেলে। কিন্তু এখানে আমরা কী করব? একটু আগে মিশ্র বলছিল যে টাওলার না কি লড়াই করার জন্য কোমর বেঁধেছে। এটা তো প্রথম পর্ব মাত্র। আরো যে কি হবে কে জানে!'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'কেউ জানে না, একমাত্র আল্লাই জানেন।'

চণ্ডী বলল, 'কি আর হবে? দেশে এত যে সব ঘটনা ঘটছে তা থেকে কোনো শিক্ষা কি লাভ করো নি? আরো সংঘর্ষ ঘটবে।'

ইসমাইল বুঝতে পারল চণ্ডীর কথাই সত্য। সংঘর্ষ অনিবার্য। হজ করতে গেলেও সংঘর্ষ হবেই। কাজেই অনাগতের সম্মুখীন হওয়াটাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো হজ।



কিছুক্ষণ বাদে গিয়াসুদ্দীন সাহেব বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখেও হাসি নেই। বড় সায়েব ভালো মানুষ, কিন্তু নিতান্তই অকর্মণ্য মানুষ। তাছাড়া সদ্য এসেছেন।

টাওলারের দুষ্ট বুদ্ধির কাছে তাঁর সরল সাধারণ বুদ্ধি পরাস্ত হল। নেপালী মন্দিরের ব্যাপারে কোম্পানী কোনো দায়িত্ব নিলেন না। পুলিশের কাছে কেস যখন রুজু কর হয়েছে, তখন আইন মতে যা হবার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে য়ুনিয়নের আটাশ দফা দাবী নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। টাওলার বলে দিয়েছে এসব দাবী কোম্পানী মেনে নিতে অসমর্থ। প্রতিষ্ঠানে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার জন্যই নাকি এই সব দাবী পেশ করা হয়েছে। কোম্পানী এসব গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু বড সায়েব বলেছেন কোম্পানী নিজের থেকেই বাড়িঘর তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্কুলও হবে। বাকী বিষয়ে ভাববার কোনো দরকারই নেই। কোম্পানী খবর কাগজ মারফত এসব কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

গিয়াসুদ্দীন সাহেব যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে টাওলারকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন। কিন্তু সায়েবরা খুবই ধূর্ত। ওরা ধৈর্য ধরে সব কথা শোনে, কিন্তু ওদের পেটের কথা আর কেউ টের পায় না।

প্রধান জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'এখন সংগ্রাম ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আমাদের আইনের সাহায্য নিতে হবে। লেবার কমিশনারের কাছে সাহায্য চাওয়ার এই হল প্রকৃত সময়।

□

সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। কাজের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু সকলেরই মন আশঙ্কায়, রাগে, অপমানে আর আশাভঙ্গের বেদনায় ভারাক্রান্ত। কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে—এ বিষয়ে আর একটুও সন্দেহের অবকাশ নেই। শহরে যুদ্ধের বিষাণ বাজতে শুরু করেছে।

একত্রিশ

বোধন খালাস হয়ে গেল। কেস টিঁকল না। এই রকমই যে হবে সকলেই বুঝতে পেরেছিল। তাই মনের দুঃখে মনে রেখেই তারা চুপচাপ রইল।

লছমী একদিন আবার তার বাপকে দেখতে গিয়েছিল। বাপ তাকে আদর করে বসাল। দু'জনের মধ্যে অনেক সুখ দুঃখের কথা হল। লছমী বলল, 'তুমি কিন্তু বাবা, আবার ওরকম করতে যেয়ো না।'

বোধন বলল, 'না, করব না।'

কিন্তু বোধন তার কথা বেশি দিন রাখল না। আবার সিং-জীর সঙ্গ ধরল। একদিন

বোধনের পদোন্নতিও হল। সিং-জী বলল, 'টাওলার সায়েব বোধনের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট।' বোধনের মতো অস্থির লোকের পক্ষে টাওলার সায়েবের অনুগ্রহ ঈশ্বরের আশীর্বাদের তুল্য। সেই অনুগ্রহ লাভ করে বোধন আবার আগের মতো য়ুনিয়নের সমালোচক হয়ে উঠল।

শ্রমিকদের নালিশ লেবার কমিশনারের কাছে গিয়ে পৌঁছল। শিলং-এ তখনো কংগ্রেসের শাসন চলছে। অসামরিক বিষয় সম্পর্কে আজকাল একটু সমীহ করে চলতে হচ্ছে। সেই জন্য লেবার কমিশনার চেষ্টা করলেন দুই পক্ষের মধ্যে একটা আপস রফা করে দিতে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। সরকার তখন কোর্ট অব এনকোয়ারি নিযুক্ত করে শ্রমিকদের দাবীর যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করার ভার দিলেন। সদস্যেরা সবাই ডিগবয় শহরে এসে দুই পক্ষের আবেদন নিবেদন ও মতামত শুনলেন। বিচারক মণ্ডলীর নেতৃত্ব করছিলেন একজন সীনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট। দুই পক্ষের মতামত শোনবার পর কোর্ট অব এনকোয়ারি তাঁদের রায়ও দিলেন। রায় শ্রমিকদের সপক্ষেই গেল। রায়ে লিখিত হল : শ্রমিকেরা যে আটাশ দফা দাবী উপস্থিত করেছে তার প্রত্যেকটিই যুক্তিসম্মত, কোম্পানীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কোম্পানী এই দাবীগুলি মেনে নিলে ঔদ্যোগিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে।

রায় হাতে এলে পর বড় সায়েব আরেকবার টাওলারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। কিন্তু টাওলার গোঁয়ার। কিছুতেই রায় মেনে নিতে রাজি হল না। বড় সায়েব নিরুপায় হয়ে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত ঠিক করে কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে চিঠি দিলেন, এবং সুপারিশ করলেন চাকুরীর স্থায়িত্ব ও বাসস্থান বরাদ্দ করা প্রভৃতি কয়েকটা দাবী মেনে নেবার জন্য। বড় সায়েবের এই সুপারিশের কথা মৌখিকভাবে য়ুনিয়নের নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হল। য়ুনিয়ন এত অল্পে সন্তুষ্ট হবে কেন? বলল, বিচারকমণ্ডলীর নিরপেক্ষ রায় যতক্ষণ কোম্পানী পুরোপুরি মেনে না নেবেন, য়ুনিয়ন সন্তুষ্ট হতে পারে না। বড় সায়েব বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি কিন্তু য়ুনিয়নকে বুঝাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। য়ুনিয়নকে ধৈর্য ধরতে বললেন।

ধৈর্য ধরে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। বিনা ছুটিতে পূজা, ঈদ, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বড়দিনও পার হল। লণ্ডনে কোম্পানীর সামনে অন্য একটা সমস্যা দেখা দিল। য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আগত প্রায় বলে মনে হতে লাগল। কোম্পানীকে তেলের উৎপাদন ও সরবরাহের কাজটা অব্যাহত রাখতে হবে। বলা হল, শ্রমিকদের এই কথাটা বুঝিয়ে বলতে। যুদ্ধের সময় ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে লেগে থাকা তাদের পক্ষে কোনো কাজের কথা নয়।

কিন্তু শ্রমিকেরা সেকথা কী করে মেনে নিতে পারে?

যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে জিনিসের দাম চড়তে লাগল। চালের দর ছিল পাঁচ টাকা, হঠাৎ বেড়ে গিয়ে হল ত্রিশ টাকা। সেই নিরিখে কাপড়ের দামও

বাড়ল। একদিন শ্রমিকদের বেশ বড়ো একটা দল ঘেরাও করল য়ুনিয়নের অফিস—তাদের নেতৃত্বে ছিল বোধন।

ততদিনে বরুয়া সহকারী সম্পাদকের পদে কায়েম হয়ে গেছেন। অফিসে তিনিই ছিলেন, বোধনকে দেখেই তিনি বুঝলেন এই ঘেরাও-এর পিছনে নিশ্চয় আছে সিং-জীর চক্রান্ত। তিনি গিয়াসুদ্দীন, মাল্‌া সিং আর প্রধানকে ডেকে আনার জন্য খবর পাঠালেন। তারপর বোধনকে বললেন, 'কি বলতে চাও বলো।'

বোধন বলল, এক বছর পার হয়ে গেল। কি করতে পেরেছে য়ুনিয়ন? বেকার চেঁচামেচি করে লাভ কি? য়ুনিয়ন ভেঙে দিন। আমরা চাঁদা দিয়ে এ য়ুনিয়ন চালিয়ে যেতে পারব না। এ পর্যন্ত একটা দাবীও তো পূরণ হল না।'

বরুয়া সবাইকে বসতে বললেন।

কিন্তু কেউ বসল না।

বরুয়া এবার বললেন, 'য়ুনিয়ন কোম্পানীকে নোটিশ দিয়েছে। যদি একুশ দিনের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হয়, তা হলে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করবে। সেইজন্যে একটা কথা বলে রাখি। সবাইকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হবে। ধর্মঘট না করলে কিছু হবে না। সায়েবরা তা না হলে দাবী মেনে নেবে বলে মনে হয় না।'

বোধন জবাব দিল, 'ধর্মঘট করে কি হবে? আবার অশান্তি। আমরা ওসবের মধ্যে নেই।'

'না যদি থাকো, কোম্পানী কিছু আমাদের দেবে না।' বরুয়া গর্জন করে উঠলেন, 'যদি এতই তোমার শক্তি থাকে, তা হলে তুমি এসে নেতা হও। তুমি হলে গিয়ে টাওলার সায়েবের বিশ্বাসভাজন, সিং-জীর সঙ্গে তোমার গলাগলি বন্ধুতা। সুতরাং তুমি যদি উঠে পড়ে লাগো, একটা কাজের মতো কাজ হলেও হতে পারে।'

শ্লেষের বাণে জর্জরিত হয়ে বোধন বলল, 'আমি নেতা নই, আমি যাব কেন?'

বরুয়া এবার ঠাট্টা করে বললেন, 'এখানে নেতা বলতে আছে কে? আমরা সকলেই কর্মী। একমাত্র তুমিই তো নেতা। তা না হলে তুমি কি শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারতে? আমরা সবই জানি।'

বোধনের মুখখানা শুকিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল বরুয়ার এই কথার কি মানে। কিন্তু সে হাসতে হাসতে বলল, 'বোধনের এত যদি শক্তি থাকত তা হলে তো হয়ে যেত। লেখাপড়া জানিনা, গজমুর্খ লোক। আপনাদের ওপরেই আমাদের ভরসা ছিল। কিন্তু দেখতে পেলাম, মাইনে বাড়া তো দূরের কথা, কেবল জিনিস-পত্রের দাম বাড়ল। এই য়ুনিয়ন ভেঙে দেওয়া দরকার। আমরা আর মেম্বর থাকব না, আলাদা য়ুনিয়ন গঠন করব।'

ঠিক সেই সময়ে য়ুনিয়ন অফিসের সামনে, সদর রাস্তা দিয়ে আসাম লাইট ইন-ফেন্ট্রির কতিপয় অশ্বারোহী সায়েব সদলে কুচ করতে করতে ফিল্ড-এর দিকে ধাবমান হল।

শ্রমিকদের মুখে যুগপৎ ফুটে উঠল বিস্ময় ও আশঙ্কা।

যুদ্ধ তা হলে কি আরম্ভ হয়ে গেছে ? চা-বাগান থেকে অনেক সায়েব এসেছে এই প্যারেডে যোগ দিতে। সবার মুখ কেমন যেন গম্ভীর। কেন এই গম্ভীর ভাব—যুদ্ধ আসন্ন বলে না অন্য কোনো কারণে, তা বুঝতে পারা শক্ত।

বোধন এবার বরুয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এরা আবার এসে পড়েছে। এরা থাকলে ধর্মঘট হবে কি করে ? একটা গুলির তো মামলা।'

বরুয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বোধন, তুমি গণশক্তির কথা কিছুই জানো না। এ শক্তিকে গুলি দিয়ে বিদ্ধ করা যায় না, তরোয়াল দিয়ে কাটা যায় না, আগুন লাগিয়ে পোড়ানো যায় না, ঝড়তুফান একে টলাতে পারে না। তোমার মনে যদি ভয় থাকে তাহলে সরে যাও। আমাদের আন্দোলন ভাঙবার জন্যে চেষ্টা কোরো না। ভাঙতে তো পারবেই না, উলটে নিজেই ছেঁকা খাবে।'

ইতিমধ্যে গিয়াসুদ্দীন, মালা সিং ও প্রধান এসে পড়লেন।

বোধন এবার চুপ করল। বরুয়া কিছু না বললেও তিনজনেই বুঝতে পারলেন কি জন্য বরুয়া ওঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন। বরুয়া বোধনের বিরুদ্ধে কিছু বলবার আগেই গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কিছু বলতে হবে না, বরুয়া। একে দেখামাত্র সব কথা বুঝতে পারছি। এরা কেবল লোকজন জড়ো করে ক্ষান্ত দেবার পাত্র নয়। প্রচার-পত্র ছাপিয়েছে, লোক ভাঙাচ্ছে আর আলাদা য়ুনিয়ন গড়বার চেষ্টা করছে। কেমন বোধন, যা বলছি সব ঠিক বলছি তো ?'

বোধন প্রধানের চোখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল। প্রধানের চোখে একটা ঘৃণা মিশ্রিত প্রচণ্ড রাগ। এক বছর আগে নেপালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে এই রাগের চেহারা বোধন দেখেছিল। প্রধানের চোখ দেখে ভয় ঢুকেছে ওর মনে, তাই গিয়া-সুদ্দীনের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলনা বোধন।

গিয়াসুদ্দীনের মুখে একটা শান্ত সৌম্য ভাব। তিনি বুঝলেন বোধন কেন চুপ করে গেল। কিন্তু সাময়িক ভয়বশত বোধন চুপ করে থাকলে কি হবে, সে তো কোম্পানীর দালাল হয়ে কাজ করছে, আর কোম্পানীর শক্তি তো কিছু কম নয়। য়ুনিয়নের চেয়ে সে অনেক বেশি শক্তিশালী। য়ুনিয়নের শক্তি যদি থাকত, তাহলে নেপালী মন্দিরের ঘটনার পরেই বোধনদের ঠিক পথে আনা সম্ভব হত। কিন্তু তা তো আর করা গেল না। কেবল রাগ করে এই কু-শক্তিকে পরাজিত করা যাবে না। কেবল কংগ্রেস সরকারের উপর নির্ভর করে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর হবে না। তার চেয়ে বড়ো কোনো একটা শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি হল প্রেমের শক্তি—তার জন্যে দরকার আত্মবিশ্বাস ও সহনশীলতা।

প্রধান তখনো বাঘের মতো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছেন বোধনের দিকে। হঠাৎ গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'বোধন, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমাদের সামনে এখন মস্ত সমস্যা। কেবল আমাদের ওপর নির্ভর করলে য়ুনিয়ন চলবে না, তোমাদেরও সাহায্য দরকার। এসো, বসো সবাই।'

গিয়াসুদ্দীন সাহেব না হয়ে অপর কেউ যদি এমন নরম সুরে কথা বলতেন, তাহলে

প্রধান তা মেনে নিতে হয়তো পারতেন না, বরুয়া ও মালা সিং-এর পক্ষে এরকম সহনশীলতার পক্ষপাতী হওয়া কঠিন হত হয়তো। কারণ বোধনের কীর্তিকলাপ ক্রমেই অসহনীয় হয়ে পড়ছে। বোধনের দল মানুষের মন ভাঙতে লেগেছে। যে কেউ য়ুনিয়নের সমালোচনা করছে তার কোনো-না-কোনো উপায়ে পদোন্নতি হচ্ছে। সমালোচকেরা সবাই টাওলারের সুনজরে পড়ছে।

কিন্তু গিয়াসুদ্দীন সাহেব বলেছেন যখন, তাঁর কথা না মেনে উপায় নেই।

বোধন স্থির হল—আস্তে আস্তে য়ুনিয়ন অফিসের ভিতরে ঢুকল। পিছনে পিছনে বাদ বাকী আর সকলে ঢুকে পড়ল। অফিসের ভিতর এবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হল।

গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বোধন, তোমরা যদি মনে করো য়ুনিয়ন কাজ করতে অপারগ, তাহলে তুমি আর তোমার সঙ্গীরা সবাই এসো—আমরা তোমাদের ওপর পরিচালনার ভার তুলে দেব। তোমাদের কথা মানব। পারবে ভার নিতে?'

বোধন আমতা আমতা করে জবাবে বলল, 'আমরা কি করে য়ুনিয়ন চালাব বাবু? লেখাপড়া কিবা জানি, মগজই বা কতটুকু? কিন্তু...'

বোধন আবার একবার তাকাল প্রধানের দিকে। প্রধানের চোখ বাঘের চোখের মতো জ্বলছে। মালা সিং দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন। বরুয়া মাথা হেঁট করে বসে আছেন। গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'বলো, বলো মন খুলে কথা বলো।'

বোধন বলল, 'আপনারা শ্রমিকদের কথা শোনেন নি। তারা কতদিন এভাবে কাটাবে? তার চেয়ে বরং মিং-জোর বুদ্ধিই ভালো। সায়েবদের সঙ্গে মিলে মিশে য়ুনিয়ন করলে আমাদের দাবী পূরণ করার সুবিধা হবে। আসল কথা হল দাবী পূরণ নিয়ে। আমরা তো মুরগীর লড়াই করতে আসিনি, অনর্থক কেন শক্তি ক্ষয় করব। যুদ্ধ তো এসে গেল। শুনছি কংগ্রেস সরকারও পদত্যাগ করবে। এই শহরে আবার সায়েবদেরই প্রতাপ হবে। তখন য়ুনিয়ন এভাবে দাবীও করতে পারবে না। একেবারে পিষে ফেলবে। টাওলার সায়েব তো হাত গুটিয়ে বসে নেই।'

প্রধান আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'এরকম গৃহশত্রুকে কুকরী দিয়ে দু'টুকরো করে কাটতে হয়।' বরুয়া নিজের ক্রোধ সম্বরণ করলেন যদিচ, প্রধানের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ালেন। মালা সিং গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই সব যা বললে, তা তো নতুন কথা নয়, বোধন। এসব কথা সবাই জানে। কিন্তু আসল কথাটা কি জানো, তোমার নিজের মন ভেঙে গেছে বলে তুমি অন্যদেরও মন ভাঙাতে লেগেছো। যুদ্ধে হার জিত আছেই—আমরা যুদ্ধে নেমেছি। সেজন্যে আমাদের মনোবল থাকা দরকার। তুমি আর তোমার দলের লোকেরা মনোবল হারিয়ে শত্রুকে লাই দিতে লেগেছো। এ কাজ করা ঠিক হয়নি।'

বোধন বলল, 'আপনি যে কি বলছেন সর্দারজী! কোম্পানী আমাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কোম্পানী আমাদের শত্রু হতে যাবে কেন? কোম্পানী আমাদের মিত্র। আমরা তো এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি, এসেছি কোম্পানীর সঙ্গে

মিলেমিশে কাজ করতে। আমাদের টাকা পয়সা ও আর সবকিছুর মালিক হল কোম্পানী। কিছু দেবার হয়তো কোম্পানীই দেবে, সরকার দেবে না।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'সে কথা কে না বোঝে? কিন্তু তোমরা যদি সায়েবদের বলে কয়ে কিছু পেতে পারো, করো না কেন? এসো, তোমরাই য়ুনিয়নের ভার নাও, এখুনই তোমাদের হাতে সব ভার তুলে দেব। এখন বলো তোমরা, ভার নিতে তৈরি আছো কি?'

বোধন চুপ করে রইল। গিয়াসুদ্দীন আবার বললেন, 'সত্যিই তো, কেন আমরা যুদ্ধ করতে যাব? যুদ্ধ না করেই আমাদের দাবী আদায় হবে বলেই তো আমরা অপেক্ষা করে আছি। ভালোই হল, তোমার তো প্রভাব আছে সায়েবদের ওপরে। একটা মীমাংসা ঘটিয়ে দাও তাহলে।'

বোধন আস্তে আস্তে বলল, 'আমি পারব না।'

'কেন পারবে না?' গিয়াসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'এই তো এখুনি বললে কোম্পানীর সঙ্গে মিলে মিশে দাবীগুলো পূরণ করতে হবে। আমরা এতদিন তাহলে কি করলাম?'

বোধন জব্দ হয়ে গেল। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সে বলল, 'য়ুনিয়নের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে টেরোরিস্টদেব গড রয়েছে।'

'কোন্ টেরোরিস্ট এখানে আছে বলো দেখি?'

'সেই যারা মাঝে মাঝে আসে তারা। আর চ্যাটার্জি।'

গিয়াসুদ্দীন এবার হো হো করে হাসতে লাগলেন, বললেন, 'এসব মিছে কথা বলতে এসো না, বোধন। এখানে এসেছিলেন নেহরু, নেহরু তো তোমাদের বড় সায়েবের সঙ্গে চা খেয়ে গেছেন...'

বোধন একটা ঢোক গিলে বলল, 'না, না, নেহরুর কথা বলতে যাব কেন?'

'তবে কে? গোস্বামী? বলাইচাঁদ বাবু? এঁরা যে টেরোরিস্ট, কে বলল তোমাকে? এরা কংগ্রেসী। আর চ্যাটার্জি কবে টেরোবিস্ট দল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাঁকে তো সর্বদাই চোখের সামনে দেখতে পাও। পুলিশ কতদিন তাঁর ঘরে খানাতাল্লাস করেছে। কিছু কি পেয়েছে তাঁব ওখানে? মিছে কথা বলে লোক ঠকাচ্ছ কেন?'

বোধন এবার একেবারে চুপসে গেল। সে বলল, 'আপনাব সঙ্গে তর্ক করি এমন আমার ক্ষমতা নেই গিয়াসুদ্দীন সাহেব। আমাব মাথায় কিছু নেই। সিং-জীর কাছে যখন যাই, তাঁর কাছেও জব্দ হই। আবাব আপনার এখানে এলে এখানেও জব্দ হই। কিন্তু য়ুনিয়নের কথাটা আলাদা, সত্যি কথা বলতে কি, য়ুনিয়নের প্রতি আমার আর বিশ্বাস নেই। কেন তা বলতে পারি না। আর কেবল আমার অবিশ্বাস হয়েছে এমন নয়, আরো অনেকেরও। য়ুনিয়ন হেরে যাচ্ছে...'

গিয়াসুদ্দীন হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছো—বিশ্বাস হারিয়েছে। আমরা এখন

সেই কথাটাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি। কি করলে বিশ্বাস ফিরে আসবে? ধর্মঘট করলে সমর্থন করবে কি করবে না?'

বোধন হতবুদ্ধি হয়ে বলল, 'কি করে করব? ধর্মঘট করলে বুঝি কিছু হবে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

গিয়াসুদ্দীন বলল, 'আমরাও বুঝি ধর্মঘট করতে চাই? চাই না। কিন্তু এখন ধর্মঘট না করে উপায় কি?'

বোধন চুপ করে রইল।

গিয়াসুদ্দীন এবার দৃঢ় স্বরে বললেন, 'দেখো বোধন। ধর্মঘট চাও বা নাই চাও, ধর্মঘট হতে বাধ্য। তোমার যদি ধর্মঘটে বিশ্বাস না থাকে—নাই থাকল। তা নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়ো না। য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বের কোরো না। তুমি তো নিজে লেখোনি, লোকে তোমায় যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়েছে। একদিন এরকম করতে গিয়ে তো বিপদে পড়েছিলে। নেপালী মন্দিরের কথা মনে আছে নিশ্চয়। আর তেমন ভুল কোরো না কখনো। সিং-জী আর টাওলার তখন কোথায় ছিল? সেই কথাটা মনে রেখো। এবার যেতে পারো। বাড়ি গিয়ে সব কথা ভালো করে ভেবে দেখো।'

বোধন উঠে পড়বার জন্য নিসপিস করছিল। কোনো রকমে পালাতে পারলেই সে যেন বাঁচে। কাউকে কিছু আর না বলে বোধন উঠে চলে গেল।

□

বোধন চলে যাবার পর য়ুনিয়নের কার্যালয় আবার কর্মতৎপর হয়ে উঠল।

মালা সিং বললেন, 'বোধনের শিক্ষা হবে বলে আপনি মনে করেন নাকি?'

গিয়াসুদ্দীন জবাব দিলেন, 'করি। না যদি শিক্ষা হয় ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের কাজ করে যাব।'

মালা সিং বললেন, 'আমরা যে আমাদের কাজ করে যাব সে কথা ঠিক। কোম্পানীর মতামত তো এক প্রকার জানাই গেল। আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন কালকেই বসানো যাক। ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিশ্চয় কারো আপত্তি হবে না। যথা সময়ে নোটিস দেওয়াও প্রয়োজন।'

প্রধান বললেন, 'বোধন যা বলল, তা খুব বেঠিক নয়। লোকেরা সত্যিই আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। কিন্তু সে লোক ভাঙাচ্ছে, তাই আমার এত রাগ।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'রাগের নাম চণ্ডাল, তাই তাকে পরিহার করাটাই ভালো। আমাদের ওপর এখন একটা মহৎ দায়িত্ব এসে পড়েছে। এই ভার বহন করতে হলে আমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা দরকার, আমাদের চিন্তাকে শুদ্ধ রাখতে হবে, বিশ্বাস জাগিয়ে রাখতে হবে। এই কয়েকটা দিন আমি শহরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। শ্রমিকদের উপর আমার বিশ্বাস বেড়েছে—ওরা আমাদের বিপাকে ফেলবে না।'

প্রধান বললেন, 'আমারও তাই ধারণা।'

কথাবার্তার পর তিনজনে বেরিয়ে পড়লেন। বরুয়া নিজের অফিসের কাজ করতে রয়ে গেলেন।

বত্রিশ

সেদিনটা ছিল পয়লা মার্চ। রিফাইনারী, খনি আর অফিসের একশো জন শ্রমিকের নামে কোম্পানী বরখাস্তের নোটিস জারি করল। তাদের বেশির ভাগই য়ুনিয়নের সক্রিয় সদস্য। তাদের একজনাকেও বাদ দেওয়া হল না, এমন কি কোম্পানীর পরম প্রিয় কর্মচারী গিয়াসুদ্দীনও এ-যাত্রা রক্ষা পেলেন না।

য়ুনিয়নেব কার্যনির্বাহক সমিতি ইতিপূর্বে কোম্পানীর কাছে ধর্মঘটের নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছে। নোটিসে বলা হয়েছিল যদি কোর্ট অব এনকোয়ারির রায় অনুসাবে কোম্পানী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের দাবী পূরণ না করে, তাহলে শ্রমিকেরা আইনসম্মত ভাবে ধর্মঘট করতে বাধ্য হবে। কিন্তু নোটিস অনুসারে নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন, কোম্পানী য়ুনিয়নের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে দিল।

সারা শহরে হুলুস্থূল পডে গেল। বরখাস্ত হবার খবর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে য়ুনিয়ন অফিসে দলে দলে লোকেরা আপনা থেকে জমায়েত হল। সকলের মনে দুঃখ ও সংশয়। অতঃপর কি হবে? কর্মকর্তারা তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে ধর্মঘট করা সম্পর্কে সারা শহরে যথেষ্ট প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। কেবল ডিগবয়ে নয়, প্রতিবেশী অঞ্চলেও প্রচার চালানো হয়েছিল। শ্রমিকদের ব্যারাক, বস্তি, দোকানপাট, হাটবাজার—সব জায়গা থেকে তাঁরা সকল শ্রেণী লোকের সমর্থন লাভ করেছিলেন।

বরখাস্তের নোটিস পেয়ে কর্মকর্তারা মনে করলেন নোটিস অগ্রাহ্য করে ধর্মঘট করাটাই ঠিক হবে। তার ফলে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ প্রভৃতি অন্য যে সব কাজ মুলতবী ছিল, সেগুলি করতে লেগে গেলেন।

য়ুনিয়ন অফিসে সমবেত জনতাকে ময়দানে নিয়ে যাওয়া হল, আর সেখানে বিরাট এক জনসভা হল। জওহরলাল নেহরুর আসার সময়েও এত বিরাট জনসমাগম হয়নি। সভায় স্থির হল অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করা হবে। দাবী আগের মতোই থাকল, কেবল আটাশ দফার সঙ্গে যুক্ত হল বরখাস্ত করা কর্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবী। সেই দাবী জানিয়ে একটি পত্রও পাঠানো হল কোম্পানীর অফিসে।

য়ুনিয়ন যখন এই সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময়ে জেবউন্নিসার শরীর স্বাস্থ্য দ্রুত অব-

নতির পথে। কয়েকদিন ধরে সে কিছুই মুখে তুলছিল না। নাসিরুদ্দীনের মন যতই মক্কার দিকে ঝুঁকতে লাগল, ততই যেন জেবউন্নিসা আসন্ন নিঃসঙ্গতার বিষাদে ম্রিয়মান হতে থাকল।

সেদিন নাসিরুদ্দীন বাক্স-পেঁটরা বেঁধে স্টেশনে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জেবউন্নিসা দাদাজানকে ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন বিফল মনোরথ হল, তার মনের অস্থিরতা সঞ্চারিত হল তার দেহে। সেদিন জলের কল থেকে বালতিতে জল আনতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে পড়ে, তলপেট ও পায়ের দিকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে অচেতন হয়ে পড়ল।

নাসিরুদ্দীন বাক্স-পেঁটরা বাঁধাছাঁদা ছেড়ে পন্নুকে খবব দিল, পান্নু খবর দিল ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে জেবউন্নিসাকে হাসপাতাল নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। নাসিরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে সে বলে গেল, 'দাদাজান, তুমি যেয়ো না। যেয়ো না তুমি। তুমি চলে গেলে আমি কী করে থাকব?'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'জেবউন্নিসা, কেন এত কাতর হচ্ছিস? এ দুনিয়ায় কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। আমিও কি তোকে ধরে বাখতে পারব? মুসলমান হয়ে জন্মেছি যখন, একবার হজ কবতে যেতে হয়—কতদিনই বা বাঁচব কে জানে?'

জেবউন্নিসা বলল, 'সব জানি, সব বুঝি, দাদাজান। কিন্তু মন মানে না।'

জেবউন্নিসাকে ফেলে চলে যাওয়া শক্ত। সে কেবল তার নাতনী নয়—বন্ধুও। কিন্তু কোরাণের নির্দেশ পালন করা তার পবিত্র কর্তব্য। এ-জীবনে কত গুণাহ হল —তার কি কোনো হিসাব আছে? এই পাপী শহরে থাকতে তার আর মন টিঁকছে না। মৃত্যুকালও তো ক্রমে আসন্ন হয়ে আসছে, সুতরাং ধর্মের আহ্বান তার পালন না করলেই নয়। সংসারের মায়াপাশে বন্দী হয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব। তাই যদি থাকে, তাহলে কেয়ামতেব দিনে কি দুরবস্থা হবে কে জানে? জেব-উন্নিসাকে মনে মনে আল্লার হাতে সমর্পণ কবে, বাক্স-পেঁটরা হাতে যখন সে চলে যাবার জন্য একেবারে তৈরি, সেই সময় এল চণ্ডী।

চণ্ডীর সেই বিবাগের ভাব হঠাৎ যেন উবে গেছে, চোখে মুখে দারুণ উৎসাহ। চণ্ডী এসে খবর দিল যে য়ুনিয়ন ধর্মঘট করবে স্থির করেছে। দোসরা মার্চ রাত বারোটার পর থেকে শহরে সর্বত্র কর্মবিরতি—রিফাইনারী, খনি, অফিস—সব বন্ধ থাকবে।

চণ্ডী বলল, 'আজ কিছুতেই তোমার যাওয়া চলে না, নাসিরুদ্দীন সাহেব। আমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে বেখে তুমি হজ করতে গিয়েও শান্তি পাবে না। এখানেই থাকো, তুমি না থাকলে নিচেব দিকের মজুরদের সামাল দেবে কে?' চণ্ডী একান্ত অনুনয় করে বলল, 'তুমি থাকো। ধর্মঘট সফল হলে পর তুমিও চলে যাবে এই পাপী নগর ছেড়ে, আমিও চলে যাব। পান্নুকে ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে চলে যাব।'

'আমিও তো তাই করেছি। আমার জেবুকে আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আর...'

'না, আর কিছু নয়, তোমায় থাকতেই হবে।' এবার চণ্ডীর কণ্ঠস্বর দৃঢ়। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নাসিরুদ্দীন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডীর সামনে। একদিকে শ্রমিকদের আহ্বান, অন্য দিকে আল্লার। কেবল চণ্ডী নয়, ইসমাইল ও গিয়াসুদ্দীন সাহেবও আসছিলেন, তাকে যেতে মানা করতে। ডাক্তারেও খবর পাঠালেন যে জেবউন্নিসা নাকি ক্রমাগত তার দাদাজানের কথা বলছে।

কিন্তু সংসারের আহ্বান বড় না ধর্মের আহ্বান? নিশ্চয় ধর্মের আহ্বান অনেক অনেক বড়ো।

সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে নাসিরুদ্দীন খোদার নির্দেশ মাথায় তুলে নিল। চণ্ডীরা সবাই বিমর্ষ হয়ে ফিরে গেল।

ট্রেন ছাড়তে আর বেশি সময় নেই। নাসিরুদ্দীন তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলবার জন্য প্রস্তুত। ঠিক সেই সময়ে এসে পড়লেন আহমদ সাহেব ও মৌলভী সাহেব। মোটরে করে তাঁরা স্টেশন থেকে ফিরে আসছেন। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে সে-বছর আর হজ-যাত্রা হবে না। সারা বিশ্বে যুদ্ধের বিষাণ বেজে উঠেছে। কোন্ মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ লাগে তার ঠিক নেই। সরকার হজ যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে।

নাসিরুদ্দীনের হাত থেকে পোঁটলা পুঁটলি খসে পড়ল মেঝেতে। নিশ্চয় খোদার ইচ্ছা তা হলে অন্যরকম। বুড়োর অন্তর হঠাৎ জেবউন্নিসার জন্য কেঁদে উঠল। আহমদ সাহেব ও মৌলভীকে বিদায় দিয়ে, নাসিরুদ্দীন সোজা হাসপাতালের দিকে পা বাড়াল। মেয়েটা ওর খোঁজ করছে—বুড়োকে ওর দরকার। একসময় জেবউন্নিসা ছিল অগ্নিশিখার মতো সুন্দর, তার বুকে ছিল বিদ্যুতের প্রাণচাঞ্চল্য। তখন সে কিন্তু নিজেকে নিজে চিনত না, ভেবেছিল সায়েবদের কামাশক্তির পাত্রী হয়েই ওকে ওর সারা জীবন কাটাতে হবে। তখনো ওর অন্তরে সু-চেতনার উদয় হয়নি। মিনুবাই ওকে আপন ভাগনীর মতো দেখত। সেই সাধ্বীর স্নেহে জেবউন্নিসার প্রাণে সুচেতনার উদ্ভব হয়েছিল। নাসিরুদ্দীনের অপত্য স্নেহ তার সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে সে নিজেকে নিজে চিনে নিতে পারল। কামাশক্তির অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারল। মুক্তিলাভ করে সে জীবিকা উপার্জনের অন্য পথের সন্ধান করল। সেই রকম একটা সময়ে, তার নারীসত্তা বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হল প্রথম প্রেমের ফুল। সে এক আশ্চর্য রহস্য। কিন্তু ইসমাইলের বিরূপতার ফলে সেই রহস্য মাধুরী অন্তর্হিত হল, তার স্থান নিল আত্মক্ষয়কারী সুচিরস্থায়ী বিষাদ। ইসমাইল তাকে গ্রহণ করতে পারল না, তার প্রাক্তন বেশ্যাবৃত্তির জন্য। সে সেই জীবনের সকল কলুষ থেকে মুক্ত হবার জন্য গ্রহণ করল সতীত্ব ব্রত। কিন্তু এই কঠোর আত্মসংযমের ফলে যে অসহ্য মনোবেদনা তাকে আচ্ছন্ন করল, তারই পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটল শরীরের দুর্বলতার রূপে। রিক্ততার বিষাদে তার পুষ্পিত পল্লবিত দেহ দিন দিন শুকিয়ে গেল। কেমন করে যে যকৃতের বিকার শুরু হল, তা এখন বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব। নানাকারণে এই রোগ হতে পারে—কিন্তু রোগ দুরারোগ্য হল মনের যন্ত্রণা থেকে।

নাসিরুদ্দীন জেবউন্নিসার এই সতীত্ব ব্রতের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম কাছে থেকে দেখেছে বলে, ভালো করে বুঝতে পারে। এক দাদাজান ছাড়া জেবউন্নিসার ব্যথা বেদনা আর কেউ বুঝতে পারে না। সেই জন্যই সে কিছুতেই চায়নি যে নাসিরুদ্দীন তাকে ফেলে কোথাও চলে যায়। যেদিন হজে যাবার জন্য নাসিরুদ্দীনের রওনা হবার কথা, সেদিন তার নিরন্তর দুশ্চিন্তা যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল।

নাসিরুদ্দীন দ্রুত পা চালিয়ে চলল হাসপাতালের দিকে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই—রাস্তাটা পড়ে আছে মরা সাপের মতো। শহরেও অঘটন আসন্ন—সায়েবদের একাধিপত্যের উপর শ্রমিক শক্তি আঘাত হানতে উদ্যত। শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আল্লার শক্তি। শ্রমিক বিদ্রোহের ফলে একটা বছরের মধ্যে সরোবর টিলার ভিৎ কেঁপে উঠেছে। তবে কি মানুষের সৎ চেষ্টার অবসান এখনো ঘটেনি।

না, ঘটেনি।

এই শহর যেন এক রোগিনী।

ডাক্তার নার্স সবাই মিলে রোগিনীকে রোগমুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

এবার আর হজ করতে যাওয়া হল না নাসিরুদ্দীনের। কিন্তু তা হলে কি হয়? এই শহরের সকল গুণাহ যেন ধর্মঘটকারীদের হুঙ্কারে ছিন্নভিন্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ যেন জেবউন্নিসার সতীত্বব্রতের মতো অতিশয় দুরূহ এক সাধনা।

তেত্রিশ

মিসেস ফ্লেমিং জয়পুরের কাছে একটা নাগাগ্রাম থেকে ফিরে আসছেন। আরো একটা প্রবন্ধ লেখার মতো মালমশলা তিনি সংগ্রহ করে আনছেন। সঙ্গে এবার দুর্গা-নয়নমণি দু'জনেই ছিল। অনেক ফোটো তুলে এনেছেন সেখান থেকে। একটা সপ্তাহ কাটিয়েছেন কনিয়াক নাগাদের গাঁয়ে। ওদের গেনা উৎসবের বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য টুকে এনেছেন ওঁর সেই নোট বইয়ে। আনন্দে মনপ্রাণ অধীর। নয়নমণি নাগাদের গান শিখে এসেছে। দুর্গা সব জিনিসপত্র নিজে বয়েছে। মোটর গ্রাম পর্যন্ত যায় না বলে, বেশ কিছুটা রাস্তা পায়ে হেঁটে চলতে হয়েছে।

কিন্তু শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তিনি যেন আনন্দপুরী ছেড়ে একটা বিষাদপুরীতে ঢুকছেন। শহরটা যেন মরে গেছে—কলকারখানা দোকানপাট সব বন্ধ। তখন সন্ধ্যা নাবছে—টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। আসবার পথে ওঁদের কয়েকটি অসমীয়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছিল—সেই সব গ্রামে আসন্ন বহাগ বিহুর আনন্দমুখর পরিবেশ, লোকে ঢোল পেঁপা বাজিয়ে বিহুগানের তালিম দিচ্ছে।

এই পরিবেশ থেকে মেমসায়েব ফিরে এলেন নিঃশব্দ শহরে নির্জন বাংলো বাড়িতে।

প্রবেশ পথের গেট খুলে দিল বুড়ো মালী। সালাম দিল মেমসায়েবকে। গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে মেমসায়েব নয়নমণি ও দুর্গাকে পিছনের সীট থেকে নামিয়ে দিলেন। তারপর নিজে নেমে এলেন। মালী তখনো আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। মেমসায়েব জিগ্যেস করলেন, 'কি হয়েছে মালী ?'

'ধর্মঘট, মেমসায়েব। সব বন্ধ। কারখানা দোকানপাট অফিস...'

'বন্ধ ?'

'হ্যাঁ, সায়েবদের বাংলোর বাবুর্চি খানসামারাও কেউ বাকি নেই—সবাই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।'

মেমসায়েবের খিদে তেষ্টা দুই-ই পেয়েছিল। নয়নমণিকে বললেন, 'যাও নয়নমণি, একটু কিছু খাবার তৈরি করে আনো। আমি এখানেই বসছি।'

মেমসায়েব দোতলার ড্রইংরুমে বসলেন। নয়নমণি ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল। দুর্গা ওপরের বারান্দায় উঠে মেমসায়েবের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। মেমসায়েবের কালো আলসেশিয়ান কুকুরটা এসে মেমসায়েবের পায়ের কাছে দাঁড়াল। তার মুখে একটা বিরহের অভিযোগ। ওর মাথাটাতে হাত বুলিয়ে মেম-সায়েব খানিকক্ষণ আদর করলেন। তারপর মেঝের উপর পড়ে থাকা ফোর্থ এপ্রিল তারিখের ষ্টেটসম্যান কাগজটা খুলে নিলেন পড়তে। প্রকাণ্ড হেড লাইন REDS SEIZE THE TOWN—পাঁচ কলম-ব্যাপী দীর্ঘ রিপোর্ট শহর বিপ্লবীদের কবলিত।

কাগজের বর্ণনা পড়ে মিসেস ফ্লেমিঙের নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

এই শহরটা নাকি ষড়যন্ত্রকারীরা সকলে মিলে অধিকার করে ফেলেছে। কল-কারখানা দোকানপাট সব বন্ধ।

বিশ্বাস হল না মেমসায়েবের। এরকম হতেই পারে না।

মেমসায়েব ফোন করবার জন্য গেলেন। ফোন তুলে হিগিনস-এর খোঁজ করলেন—হিগিনস বাড়িতে নেই। টাওলার, জিলাপসী, টেইনস—সবাইকে একাদি-ক্রমে ফোন করলেন। বাংলোতে কেউ নেই।

মেমসাহেব ফোন নামিয়ে রাখলেন। মনে যুগপৎ ক্রোধ ও বিরক্তি। তার মধ্যে নয়নমণি ঘুরে এল মুখখানা বিষণ্ণ। বলল, 'মেমসায়েব, চা পাতা আছে, চিনি নেই। ব্রেড আছে, মাখন নেই। কলা আর দু'চারটা ফল আছে শুধু। চিনি দুধ ছাড়া চা আপনি যদি খেতে চান তো করি।'

বিরক্তিতে মেমসায়েব বললেন, 'যা আছে তাই নিয়ে এসো।' নয়নমণি আবার ভিতরবাড়িতে ঢুকে গেল। মেমসায়েব ড্রইংরুমেই বসে থাকলেন। তাঁর বুক ওঠানামা করছে আর ক্লান্তিতে চোখের পাতা যেন বুজে আসছে। এবার তিনি দুর্গাকে ডেকে বললেন, 'মোটরে একটা শ্যাম্পেনের বোতল আছে—নিয়ে এসো।'

দুর্গা নীরবে একতলায় নেমে গেল আর কিছুক্ষণ পরেই বোতলটা এনে মেমসায়েবের সামনে একটা টেবিলের উপর রাখল, তারপর একটা গেলাস এনে দিল।

মেমসায়েব এক গেলাস শ্যাম্পেন পান করে ধীরে ধীরে দুর্গাকে বললেন, 'দুর্গা একবার যাও তো, গাড়িটা নিয়েই যাও। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখে এসো। পয়সাও নিয়ে যাও, খাদ্যদ্রব্য কিছু পাও তো নিয়ে এসো—চিনি মাংস, ব্রেড মদ আর যা যা পাও।'

দুর্গা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মোটরে এখন না বেরোলেই ভালো, মেমসায়েব।'

মেমসায়েব আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কেন?'

মোটর নিয়ে গেলে দোকানীরা চিনতে পারবে। তাছাড়া পথে স্বেচ্ছাসেবক দেখে এসেছি। কোথায় কে কি বলবে, কিছু কি ঠিক আছে?'

দুর্গা মিছে বলেনি। মেমসায়েব আরো এক গেলাস শ্যাম্পেন খেয়ে বললেন, ঠিকই বলেছো। হেঁটে হেঁটেই চলে যাও। আর পয়সা নিয়ে যাও—কুড়িটা টাকা।' এই বলে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে মেমসায়েব বিশটা টাকা বের করে দিলেন।

দুর্গা নোটগুলো পকেটে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মেমসায়েব দুর্গার দিকে তাকালেন—খাকী পোশাকে বেশ মানিয়েছে—বেশ শক্ত সমর্থ দেহখানা, গায়ের রঙও বেশ পরিষ্কার। সারা দেহে একটা আত্মপ্রত্যয় প্রচ্ছন্ন, কিন্তু মুখটা আজ চিন্তান্বিত।

মিসেস ফ্লেমিঙের কপালের শিরাগুলো যেন চিড়িক খেয়ে উঠল। কোথাও কোম্পানীর নিশ্চয় সাংঘাতিক কোনো ভুল হয়ে গেছে। তা না হলে এমন হবে কেন? টাওলারের অনমনীয় মনোভাবের কথা তিনি তো ভালো করেই জানেন। মিঃ হিগিনস বোধহয় সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় আছেন। ধর্মঘট হতে দেওয়াটাই ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে।

কেবল ভুল নয়, একটা অসহনীয় দুর্যোগ যেন ঘনিয়ে এসেছে শহরের ওপরে। দুর্গার চোখের দিকে তাকিয়েই তিনি সেকথা আঁচ করতে পেরেছেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, চারিদিক নির্জন, ভয়াবহ নির্জনতা! লোকেরা যে যেখানে সে সেখানে; কাছে, দূরে, সর্বত্র। এখানকার ইংরেজরা নিজের থেকেই এই সব লোককে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সায়েব অফিসারদের সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের কোনো সামাজিক আদানপ্রদান নেই। আজ ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবধানের জায়গায় জ্বলে উঠেছে শ্রেণী সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ। আর এই সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে এক ভীষণ রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে। য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আসন্ন—যে কোনো মুহূর্তে হিটলারের সেনাবাহিনী অন্যান্য দেশ অধ্যুষিত করতে পারে। অপর দিকে ভারতে কংগ্রেস-আন্দোলন পৌঁছে গেছে চরম পর্যায়ে। এসময়ে টাওলারের এই শ্রমিক-দলন নীতি শহরে ইংরেজের সুনাম নষ্ট তো করবেই, ইংরেজের মানবিকতা আর সংস্কৃতিরও সমাধি রচনা করবে। সূর্যাস্তের রক্ত রঙে পশ্চিমের দিগন্ত লাল—তারই পিছনে অন্ধকার, ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার।

অধিক সময় তিনি স্থির হয়ে সেখানে আর বসে থাকতে পারলেন না। মেমসায়েব এবারে নিজেই নেমে গিয়ে মোটরের সীটে ফেলে রেখে আসা তাঁর নোট বইখানা নিয়ে এলেন। তারপর আলোর সুইচ টিপে সেইসব নোট ভালো করে পড়তে লাগলেন।

তার মন চলে গেল সভ্যতা থেকে অনেক দূরে।

সেখানে মানুষের অন্য একটা চেহারা। এই দূরের রাজ্যে নগ্নতা এখনো মানুষের অঙ্গের ভূষণ। পাহাড়ের উঁচু মালভূমিতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এরা গ্রাম বসিয়ে ঘর বাঁধে। সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এদের জীবন যাত্রার পরিক্রমা, আশা আকাঙ্ক্ষাও সুনির্দিষ্ট। সেইজন্যেই যেন সেই দূরের দেশে মানুষের দেহমনের স্বাস্থ্য এখনো অটুট। বসন্তোৎসবের নাচ একটা দেখেছিলেন মিসেস ফ্লেমিং। যুবকযুবতীদের সেই সমবেত নৃত্যে সমস্ত প্রাঙ্গন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মানুষের মন। কেবল যে নর্তক-নর্তকীদের দেহ চঞ্চল হয়েছিল এমন নয়, দর্শক সাধারণ ও প্রকৃতির মধ্যেও যেন সেই চাঞ্চল্যের ছোঁয়া লেগেছিল। বিজলী বাতি, পাকা দালান আর মোটর এরোপ্লেন না থেকেও মানুষ যে তার জীবনযাত্রায় বিমল আনন্দ উপভোগ করতে পারে—তার প্রমাণ এই সহজ সরল নাগাদের জীবন।

হ্যাঁ, এখানে থেকেও কত জানবার কথা জানতে পারা যায় না, কত জ্ঞান আয়ত্ব করা যায় না, কত ঈপ্সিত জিনিস নাগালের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু একটা জিনিস পাওয়া যায়—তা হল আনন্দ। সেই ক'টা দিন এই অভিশপ্ত শহর থেকে দূরে থাকার ফলে, মিসেস ফ্লেমিং গায়ের বর্ণ, বিদ্যা বা সামাজিক দূরত্বের সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আদিম জীবনের স্বাদ পেয়ে তিনি নিজেকে যেন ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ক্ষণিকের স্বপ্নের মতো সে-সব স্মৃতি যেন মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে এখানে পড়ে আছে—একটা রুক্ষ নগরী, আর সেখানে ঘটতে চলেছে শ্রেণী সংঘর্ষের করুণ মনমালিন্যের একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

'নয়নমণি! নয়নমণি!' অধীর হয়ে মেমসায়েব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে যেন একটা নিঃসঙ্গতার বেদনাও প্রচ্ছন্ন হয়েছিল।

নয়নমণি একটা ট্রে-তে করে চা, ব্রেড, কলা আর কয়েকটা কমলা লেবু নিয়ে, সাবধানে পা ফেলে ড্রইংরুমে উপস্থিত হল, আর মেমসায়েবের বিহ্বল অবস্থা দেখে হাসিমুখে বলল, 'চা খান। চা খেলে ভালো লাগবে।'

মেমসায়েব টি-পটটা দেখে একটু যেন আশ্বস্ত হলেন। কাপে চা ঢেলে শুকনো পাঁওরুটির সঙ্গে খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আরো তো একটা কাপ আছে। তুমিও চা খাও, নয়নমণি। বোসো এখানে।'

মেমসায়েবের দাক্ষিণ্য দেখে নয়নমণি আশ্চর্য হয়ে গেল। এই প্রথম তিনি ওকে নিজের কাছে বসিয়ে খেতে বললেন। নয়নমণি বলল, 'আপনার সঙ্গে বসে আমি কি করে খাই, মেমসায়েব? আমি কি আপনার সঙ্গে সমান?'

মেমসায়েব একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নয়নমণি! এইরকম মেম মেম হয়ে দূরে দূরে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না। বলতে পারো, কিসে আমি তোমার চাইতে বড়ো?'

থতমত খেয়ে নয়নমণি বলল, 'কেন ওকথা বলছেন মেমসায়েব? সব বিষয়েই আপনি আমার চেয়ে বড়ো—বিদ্যায়, শক্তিতে, গুণে, সকল বিষয়ে। তাছাড়া রক্তেও আমরা সাধারণ, মানুষ আপনারা উঁচু জাতের।'

মেমসায়েব কাপটা নামিয়ে বিশেষ বিরক্তির সুরে বললেন, 'রক্ত সব লোকেরই সমান। চীনা, ভারতীয়, ইংরেজ, রুশী সকলের গায়ে একই মানুষের রক্ত। এসব ভুল ধারণা, তুমি আর আমি দু'জনে দু'জনের সমান। তুমি মানুষ, আমিও মানুষ বুঝেছো? বোসো, চা খাও।'

মেমসায়েবের কথা শুনে নয়নমণি অবাক, ভাবল এটা মেমসায়েবের খেয়াল মাত্র। কিন্তু আদেশ যখন দিয়েছেন, পালন করতে হবে। সুতরাং খুবই সংকুচিত হয়ে সে একটা সোফার এক কোণে বসল। মেমসায়েব নিজে 'টি-পট' থেকে চা ঢেলে দিলেন। নিজের ভাগের মাখনহীন পাঁওরুটির টুকরো, কলা ও কমলালেবু নয়নমণিকে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে বসে খাবে, নয়নমণি। আমাদের দেশে এইরকম করে খায়। এদেশে এলে ইংরেজদের মনে কি যে ঢোকে। এত বদলে যায় যে আর চেনা যায় না। একটা হাম-বড়া ভাব ওদের পেয়ে বসে। কিন্তু সত্যিই কি এদেশে যারা আসে সে সব ইংরেজই বড়ো? কিছুতেই নয়, তা হতে পারে না। বেশির ভাগই টাওলারের মতো, মিথ্যা আত্ম-অভিমান বজায় রাখার জন্যে ওরা ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় করতেও পিছপা হয় না। আমার আর এদেশে থাকতে ভালো লাগছে না, নয়নমণি। এখান থেকে শীগ্‌গিরি চলে যাব।'

মেমসায়েব সহজ আন্তরিকতার সুরে এ-সব কথা বললেন দেখে, নয়নমণির মন যেন গলে গেল। এক টুকরো পাঁওরুটি মুখে দিয়ে সে বলল, 'মেমসায়েব, কখনো কি এমনিভাবে ইংরেজরা আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে একত্র বসে খাবে? আমার তো মনে হয় না সেরকম কখনো হতে পারে। তাঁরা কেন আমাদের সমান সমান বলে মেনে নেবেন? কিন্তু কেন আপনি চলে যাবেন, মেমসায়েব? আপনি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

নয়নমণির কথা শুনে মেমসায়েব হাসতে লাগলেন, বললেন, 'তুমি তো ইতিহাস পড়োনি, তোমায় আর কি বলব? পড়লে জানতে আজ যে জাত শীর্ষে উঠেছে, কাল তা নেমে যেতে পারে সবার নিচে। ওপরে যারা উঠেছে, তারা তলার লোকেদের দাবিয়ে রেখে নিজেদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। তারা তখন জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারে না, ফলে তাদের পতন হয়। ইংরেজদেরও তাই ঘটছে। সেইজন্যে এখানে থাকলে আর শান্তি পাব না।'

এরকম কথা নয়নমণি এই প্রথম শুনল। নিজেদের দেশের লোকের মুখে শুনলে,

সে কথা স্বদেশী যুগের কথা বলে উড়িয়ে দিত, কিন্তু স্বয়ং মেমসায়েব যখন এরকম কথা বলছেন, সে কথা উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। এই মেমসায়েব একেবারে আলাদা ধরণের মানুষ। নয়নমণিদের বিয়েটা তিনিই জোর করে ঘটিয়েছেন, তা না হলে প্রধান কিরকম মূর্তি ধারণ করত কে জানে। আর প্রাক্তন বড় সায়েবের স্ত্রী বলে তাঁর মনে কোনো অহংকার নেই—অসাধারণ স্ত্রীলোক ইনি। ইচ্ছা হলেই ভারতীয়দের বাড়িতে যাওয়া আসা করেন। নিশ্চয় পৃথিবীতে বড় একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা হচ্ছে, তা না হলে মেমসায়েবের মুখে এরকম কথা বেরোবে কেন? নয়নমণি জিগ্যেস করল, 'সায়েব আর এদেশী মানুষ, কখনো কি সমান সমান হবে, মেমসায়েব?'

মেমসায়েব বললেন, 'নিশ্চয় হবে। তা না হলে এসব আন্দোলন কেন? হ্যাঁ, তোমরা যখন নিজেদের সমান বলে ভাবতে শিখবে, তখনি তোমরা সমান সমান হবে। এমন এমন জিনিস যা কোনো মানুষ কাউকে হাতে ধরে দিতে পারে না, নিজের হাতে খেতে হয়। এরা সব ঠিক কাজ করেছে...'

'কারা?' নয়নমণি সবিস্ময়ে জিগ্যেস করল।

'এই ধর্মঘটকারীরা...'

নয়নমণি এবার আরো অবাক হল। প্রাক্তন বড় সায়েবের মেম স্বয়ং ধর্মঘট সমর্থন করছেন!'

মেমসায়েব চা খাওয়া শেষ করে বললেন, 'এরাই একদিন জিতবে, কিন্তু সে জয় কখন ঘটবে জানিনা, আমি তো সবজান্তা নই।'

এই বলে মেমসায়েব ড্রইং রুমে অস্থিরভাবে এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করতে লাগলেন।

নয়নমণি একটা কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে লাগল।



অনেকক্ষণ ধরে নয়নমণি দুর্গার পথ চেয়ে রইল। তারপর ড্রইংরুম থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। দুর্গার জন্যে কিছু খাবার জোগাড় করে রাখতে হবে। মেমসায়েব শোবার ঘরে ঢুকলেন; কিন্তু শুতে তিনি পারলেন না। ঘন ঘন গলা খাকরি ও মাঝে মাঝে অস্ফুট বেদনার কাতর শব্দ ভেসে আসছে শয়নকক্ষ থেকে। মানুষ যখন ভিতরের যন্ত্রণা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না, নিজের অজ্ঞাতসারে অস্বাভাবিক কাতরোক্তি করতে থাকে। এসব শব্দ যেন সেই অন্তর্বেদনার অভিব্যক্তি। মেমসায়েবের মনে যে কি দুঃখ, তা জানতে পারা খুবই শক্ত। তবে স্পষ্ট দেখা যায় ওঁর মনটা দরাজ ও হৃদয়টা সুন্দর। অন্যায়, অসাম্য এইসব দেখলেই উনি যেন আর সহ্য করতে পারেন না, মনে হয় হঠাৎ কী যেন একটা করে বসবেন। ছুতোর মিস্ত্রি রাঁদা চালিয়ে একই তক্তার উঁচু নিচু অংশ যেমন সমতল করে, তেমনি করে রাঁদা চালিয়ে মানুষের উচ্চ নীচ ভেদাভেদ যে ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না—তা যেন

মেমসায়েব বুঝতে চান না। তিতি জোর দিয়ে কেবলই বলেন, 'হতেই হবে। হবে না কেন?' মনে তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সেই শক্তি প্রতিহত হলে তাঁর মুখ থেকে এইরকম কাতরোক্তি শোনা যায়।

আর কারো মুখে এরকম কাতরোক্তি ইতিপূর্বে নয়নমণি শোনেনি।

অনেকক্ষণ ধরে নয়নমণি ঠাঁয় বসে রইল। রাত গভীর হল, তবু দুর্গার দেখা নেই। কি হল তার? আগে তো কখনো এমন করেনি!'

ওকি, হঠাৎ বাইরের ঘরের কাঠের মেঝের উপর জুতোর শব্দ শোনা গেল যে! নয়নমণি কান পাতল ওদিকে, শব্দটা দুর্গার জুতোর তো নয়। তবে কার? এত রাত্রে কে এসেছে মেমসায়েবের কাছে? এর আগে কেউ তো কখনো এভাবে আসেনি!

সত্যিই তো কে যেন একজন এসেছে, কে যেন মেমসায়েবের শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে। নয়নমণির মনে যুগপত আশঙ্কা ও কৌতূহল। সে আস্তে আস্তে অন্ধকারে এদিক ওদিকে হাত পা চালিয়ে, ড্রইংরুম ও শয়নকক্ষের মাঝখানের করিডরে দাঁড়িয়ে মেমসায়েবের শয়নকক্ষের দিকে উঁকি দিল।

নয়নমণির কানদুটো লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সেই জঘন্য পশুটা—জিলাপসী! দরজার ওপর সে টোকা মেরেই চলেছে। নয়নমণি হতভম্ব হয়ে সেখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ পরে শয়নকক্ষের দরজাটা খুলল। মেমসায়েবের গলা শোনা গেল— 'এখানে কি দরকার, আপনার?'

জিলাপসী ইংরেজীতে কি জবাব দিল নয়নমণি ধরতে পারল না, কিন্তু কথার ধরন ও তার ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে পারল, জিলাপসী মেমসায়েবের সম্মান রেখে কথা বলছে না।

কিছুটা সময় দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। তারপর জিলাপসী চুপচাপ সরে পড়ল।

নয়নমণি কিছু বুঝল না কি হল। ওর পাশ দিয়েই জিলাপসী দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল। দেয়াল ঘেঁষে যে নয়নমণি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাও জিলাপসী লক্ষ্য করেনি।

জিলাপসীর বিদায় হবার পর মেমসায়েব শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে, নয়নমণির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নয়নমণি, দেখো এসে তো বোতলে একটু শ্যাম্পেন আছে কিনা। মাথাটা আমার ঘুরছে।'

টেবিলের ওপরে বোতলটা দেখে নয়নমণি বলল, 'আছে।'

'একটু নিয়ে এসো গেলাসে ঢেলে।'

মেমসায়েব এই বলে শয়নকক্ষে ঢুকে গেলেন।

নয়নমণি গেলাসটা দিতে গিয়ে দেখল, মেমসায়েব পিঠের দিকে কতকগুলো বালিশ উঁচু করে, হেলান দিয়ে শুয়েছেন, আর নিজের মনে কী সব যেন বলছেন। নয়নমণি গেলাসটা তাঁর হাতে দিলে পর চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'শুনছো?'

'কি ?'

'জিলাপসী সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবে। নোটিস দিয়েছে।'

নয়নমণি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

মেমসায়েব ওর সরল মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ভাগ্যবতী, এসব কিছুই বুঝতে পারো না।'

'কি মেমসায়েব ?'

'যুদ্ধে যাবে জিলাপসী, আর আমাকে খবর দিতে এসেছে এই শয়নকক্ষে। কেবল খবর দিতে তো আসেনি, এসেছিল বীরের মতো আমার আলিঙ্গন দাবী করতে। কী স্পর্ধা!'

মেমসায়েব গেলাসের সবটুকু শ্যাম্পেন এক চুমুকে শেষ করে, নয়নমণির হাতে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'শোনো নয়নমণি! তুমিও মেয়েমানুষ, আমিও মেয়েমানুষ। আমরা দুজনাই জানি পুরুষ মানুষ যদি খারাপ আচরণ করে, কেমন করে তার জবাব দিতে হয়। যুদ্ধের উত্তেজনা থেকে ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে।'

নয়নমণি এসব কথার কোনো জবাব দিল না, মেমসায়েবও কোনো জবাব চাননি। সে গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

□

কিছুক্ষণ পরে দুর্গা এসে উপস্থিত হল। কয়েকটা ডিম আর পাঁওরুটি ছাড়া আর কিছু সে জোগাড় করে আনতে পারেনি। এসবও সে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য ভাণ্ডার থেকে খুঁজে পেতে এনেছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ ধরে দোকানপাট সব বন্ধ। কোনো জিনিস কেনার জো নেই।

নয়নমণির হাতে জিনিষগুলো দিয়ে দুর্গা তার নিজের বাসায় ফিরে যেতে চাইছিল। নয়নমণি জিগ্যেস করল, 'কিছু কি খাবে না ?'

'না, বাড়ি গিয়েছিলাম। পান্নু চা আর মোহনভোগ খেতে দিল। এখন এলোপাতাড়ি খাবার জিনিস খরচ কোরো না, মেমসায়েবের কষ্ট হবে।'

নয়নমণি দুর্গার মুখে মেমসায়েবের কষ্ট হতে পারে কথাটা শুনে খুব খুশি হল। দুর্গার কথা বলার ধরনেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল মেমসায়েবের প্রতি তার কত গভীর সহানুভূতি। সে বলল, 'একটা ব্যাপার ঘটেছে, দুর্গা।'

'কি ?'

'মেমসায়েবের এখানে জিলাপসী এসেছিল।'

'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? মেমসায়েবের কাছে সায়েব এসেছে।'

নয়নমণি ক্ষুণ্ণ হল, বলল, 'আমার কাছে যদি ওরকম কোনো লোক আসত, আমি তার গলাটা কেটে ফেলতাম।'

দুর্গা বুঝতে পারল জিলাপসী কেন এসেছিল। সে বলল, 'ভারি অন্যায় করেছে সায়েব। এ সায়েবটা একেবারে জানোয়ার—মস্ত জানোয়ার।'

নয়নমণি বলল, 'বাংলোয় এভাবে মেমসায়েবকে একা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।' একটু থেমে বলল, 'অবশ্য মেমসায়েব ভয় ডর কাকে বলে জানেন না। কাকেও পরোয়া করেন না। কোম্পানীকেও নয়।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এবার সোৎসাহে বলল, 'মেমসায়েব আজ কি করেছেন, জানো? একসঙ্গে বসে চা খেতে বাধ্য করলেন আমায়। কি কাণ্ড! মেমসায়েবের সঙ্গে একসঙ্গে বসা—কস্মিনকালেও এরকম ঘটেনি।'

কথাটা শুনে দুর্গা আশ্চর্য হল। শ্রমিকদের মধ্যেও মেমসায়েবের প্রতি শ্রদ্ধা অসীম। সে তো এইমাত্র দেখে এসেছে। সাহায্য ভাণ্ডারে সকল নেতারা বসে আছেন। মেমসায়েবের কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই শুনে, গিয়াসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'এই মেমসায়েবের জন্যেই আমার এখনো ইংরেজ চরিত্রের প্রতি একটু আস্থা রয়ে গেছে। অন্যদের আচরণ দেখে বিশ্বাস প্রায় হারিয়েছিলাম।' সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে ওর শ্বশুর প্রধান বললেন, 'মেমসায়েবের কোনো অহংকার নেই, সবাইকে সমান বলে দেখেন।' তারপর আরো অনেকে মেমসায়েবের নানা গুণগরিমার কথা বললেন। সব কথা মনেও নেই। দুর্গা বলল, 'টাওলার অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছেন, মেমসায়েব শান্তিজল ছিটিয়ে দিতে চাইছেন।'

ততক্ষণে স্বয়ং মেমসায়েব বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে একটা প্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠেছে, তিনি হয়তো অনুমানে বুঝে থাকবেন যে স্বামী-স্ত্রীতে সম্ভবত ওঁর কথাই বলাবলি করছে।

মেমসায়েব জিগ্যেস করলেন, 'দুর্গা, শহরে কি হচ্ছে, বলো তো?'

দুর্গা উৎসাহ-ভাব বর্ণনা দিতে লাগল। বাছা বাছা কয়েকজন অফিসার ছাড়া কেউ কাজ করতে যায়নি। লোকে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার জন্যে চাঁদা তুলছে। ইসমাইলের নেতৃত্বে একটা স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠিত হয়েছে। সায়েবরা ভাবছে বাইরে থেকে কিছু ফালতু শ্রমিক আনিয়ে কাজ চালাবে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতাপে বাইরের লোক ঢুকতে পারেনি। হিগিনস সায়েব পাগলের মতো হয়েছেন। একদিকে কোম্পানী টেলিগ্রাম করছে কাজ চালু রাখার জন্যে, অন্যদিকে কংগ্রেস সরকার টেলিগ্রাম করছে শ্রমিকদের সঙ্গে সত্বর একটা মীমাংসা না করলে পদে পদে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। কিন্তু টাওলার সেই আগের মতো খাও খাও করছে—ধর্মঘট যেন-তেন-প্রকারেণ ভাঙতেই হবে এই নাকি তার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। ডিব্রুগড় থেকে পুলিশ কমিশনার রাওলট সায়েবকে ডেকে এনেছে। পুলিশ সায়েব আসাম রাইফেলস মোতায়েন করে রেখেছেন। আর লাইট ইনফেন্টি র কিছু অশ্বারোহী তো আছেই এখানে।

আর আজ সন্ধ্যা থেকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করেছে।

'কেন?' মেমসায়েব জিগ্যেস করলেন।

'আইনের কথা আমি কি করে জানব, মেমসায়েব? শুনেছি স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কোথাও কোনো কারণে যদি সংঘর্ষ বেঁধে যায়, সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।'

মেমসায়েবের মুখে বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু মনের কথা তিনি প্রকাশ করলেন না। ভয়ে তাঁর বুক দুরু দুরু, তাহলে সংঘর্ষ লাগার উপক্রম হয়েছে। তিনি এবার ফোনের কাছে গিয়ে ফোন তুলে নিয়ে মিঃ হিগিনস-এর খোঁজ করলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না—বাংলো থেকে কে যেন জানাল তিনি গেছেন শিলং-এ। মেমসায়েব ফোনটা রেখে দিলেন। কেন গেছেন তা বুঝতে দেরি হল না, নিশ্চয় মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা করছেন। ভালোই হয়েছে; কিন্তু হিগিনসের অনুপস্থিতিতে টাওলারকে সামাল দেবে কে? সে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

মেমসায়েব বললেন, 'শুনছি দুর্গা, য়ুরোপে যুদ্ধ বাঁধবে।'

দুর্গা আশ্চর্য হল—'যুদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

তারপর মেমসায়েব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমিও চলে যাব ভাবছি। এখানে আর থাকা নয়। ভালো লাগছে না।'

মেমসায়েব শোবার ঘরে চলে গেলেন।

নয়নমণির মনটা গভীর বিষাদে ভরে গেল। সে বলল, 'মেমসায়েবের খুবই খারাপ লাগছে। ধর্মঘট চলবে কত দিন?'

দুর্গা বলল, 'পান্নুর সঙ্গে আজ অনেক দিন পর অনেক কথাবার্তা হল। ও সকলকে চা করে খাওয়াচ্ছিল। একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছে পান্নু। কত কথা যে শিখেছে কি বলব। আর শিখবে নাই বা কেন? বাবার ওখানেই তো মিটিং বসে। ধর্মঘট নাকি বন্ধ হবে না। সায়েবদের বোঝাপড়ায় আসতে হবে। য়ুনিয়নকে মেনে নিতে হবে। নেতাদের আবার কাজে নিতে হবে।

নয়নমণি দুঃখ করে বলল, 'ধর্মঘট চলতে থাকলে আমি মেমসায়েবকে হারাব। শিক্ষা পণ্ড হয়ে যাবে...।'

'কিন্তু মেমসায়েব চিরকাল এখানে থাকবেন কেন?

নয়নমণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওকে মনে হয় যেন আমার মায়ের মতো—যদিও উনি বিদেশী। আমাদের চিরকাল নিজের কাছে কেনই বা রাখবেন? কিন্তু ধর্মঘট যদি না হত, বেশ কিছুকাল থাকতেন নিশ্চয়।'

দুর্গা নয়নমণির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলল, 'আমি তো আছিই। আমি থাকলে তুমি কি সুখী হবে না?'

নয়নমণি বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকলে সুখী হব না কে বলল? কিন্তু মেয়েদের বুঝি স্বামী থাকলেই আর কিছু চাইতে পারে না? মেমসায়েবের সঙ্গে থেকে বুঝেছি, আমারও একটা মন আছে, কিছু কিছু গুণ আছে। সেইসব ফুটিয়ে তুলতে কে সাহায্য করবে? তুমি তো সেরকম সাহায্য করতে পারো না। তার জন্যে বিদ্যা থাকা দরকার, শিক্ষা থাকা দরকার। পুরুষের সঙ্গে আমি যে সমান, সে চেতনাটা তো তিনিই আমায় দিয়েছেন।'

'সমান?'

'হ্যাঁ।'

দুর্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। নয়নমণির সঙ্গে বিয়ে হবার সময় ওর কল্পনায় আরেক ধরণের ছবি ছিল। খুব আনন্দে সে সংসার রচনা করবে, ভালো বাড়িতে বসবাস করবে, ভালো খাওয়া দাওয়া হবে। নয়নমণি হবে ঘরের গৃহিনী। ওদের ছেলেমেয়ে হবে, ও বাবা হবে। কিন্তু নয়নমণি শুরু থেকে বলে আসছে সে মেমসায়েবের মতো হতে চায়। মেমসায়েবের প্রথম সন্তান নাকি হয়েছিল বিয়ের চার বছর পরে। এ-ও বলছে, এর নাকি তাড়াতাড়ি সন্তান হবার দরকার নেই। কেমন করে জন্মনিরোধ করতে হয় মেমসায়েবের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। দুর্গার সন্তান কামনায় ও সর্ব্বদা বাধা দিয়ে আসছে। মেমসায়েবের এতটা প্রভাব দেখে মাঝে মাঝে ওর রাগ হয়। ও তো সায়েব নয়, নয়নমণিও মেমসায়েব নয়। তাহলে কেন ও চায় না সন্তান? সন্তান ব্যতিরেকে মেয়েদের আরো বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি কিছু থাকতে পারে? নয়নমণি ইংরেজী শিখছে—কি হবে ইংরেজী শিখে? নয়নমণি কাজ করে, সে তো ও চায় না। আর হ্যাঁ, সত্যিই ওর গানের গলাটা ভালো। ও লখনউ যেতে চায়, শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে চায়। এইসব চিন্তা মেমসায়েবই ঢুকিয়েছে ওর মনে, বলেছেন উনিই টাকাপয়সা দেবেন, স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। কিন্তু ওকে ছেড়ে দিতে দুর্গার ভারি ভয়। দূরের জায়গা—সেখানে নয়নমণিকে একা থাকতে হবে। এসব তো ভালো কথা নয়, কিন্তু তা বললেই নয়মমণি রেগে জ্বলেপুড়ে যায়। মেমসায়েবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বুঝি টু শব্দটি করতে পারবে না? মেমসায়েব ওর চেয়ে সব দিক থেকে বড়ো সে তো সত্যি। তবু দুর্গা মনে মনে ভাবছে নয়নমণিকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু নয়নমণি ইতিমধ্যে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে লখনউ-এর স্কুলে। ওকে জিগ্যেস না করেই পাঠিয়েছে—এই স্পর্ধা ওর ভালো লাগেনি। ও তো স্বামী!

নয়নমণি বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'না, কই কিছু তো হয়নি। আমি শুধু ভাবছি, মেমসায়েবের সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি যদিবা মেমসায়েব হয়ে উঠতে পারো, আমি কিন্তু সায়েব হয়ে উঠতে পারব না। সে রকম শিক্ষাদীক্ষা শক্তি ক্ষমতা ধনদৌলত আমার নেই।'

দুর্গা এবার অকারণেই হাসল।

নয়নমণিও হেসে বলল, 'আমি তো মেমসায়েব হতে চাই না, মানুষ হতে চাই। তাতে তুমি বাধা দিয়ো না, বাধা দিলে ভারি দুঃখ পাবো। খুবই খারাপ লাগবে। নতুন একটা পথ যখন পেয়েছি, সে পথে চলতে দোষ কি?'

'দোষ কিছু নেই, আমি তো সে পথে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারব না।'

'এসব বাজে কথা বোলো না, দুর্গা। তুমি সায়েব হয়ে উঠবে—সে আমি একেবারেই চাই না। শুধু চাই যে মনটাকে মুক্ত রাখবে—ছোট করে রাখবে না।'

দুর্গা আর কিছু বলল না, ধীরে ধীরে সে একতলায় নেমে গেল—মনে হলে সে যেন নয়নমণির চেয়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

নয়নমণি অন্তরালে থাকলে সে যে এক মুহূর্তও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এখন সে-ই ওর সর্বস্ব। বাপ ও বোনের সঙ্গে এখন তো সে সম্পূর্ণ বিছিন্ন। সেই বাড়িতে ও আর ফিরে যেতে পারে না। কিন্তু নয়নমণিকে সে নিজের মত অনুসারে চালনা করতে পারছে না, নিজের মতো করে গড়ে নিতেও পারছে না। মেমসায়েব তাকে যেন তুক করেছেন। বাংলোতেই থাকে বেশির ভাগ সময়। মেমসায়েব যেতে দেন না। ধরণ-ধারণ আদব কায়দা সবই যেন ওর সম্পূর্ণ বদল হতে লেগেছে। ওকে যে কম ভালোবাসে তা নয়, কিন্তু ওর নিজের ইচ্ছাশক্তি যেন প্রবল হয়ে উঠছে। সেই জন্যেই দুর্গার ভয়। মেমসায়েব চলে যেতে চাইছেন জেনে, সেই কারণে দুর্গা মনে মনে খুব অখুশি হয়নি।

এদিকে শুয়ে থাকতে আর পারলেন না মেমসায়েব। অস্থির হয়ে রান্নাঘর থেকে নয়নমণিকে ডেকে এনে জিগ্যেস করলেন, 'কি রাঁধছো ?

'অমলেট ভাজব ভাবছি।'

'বেশ, তাই কোরো। একটা কথা বলার জন্য ডাকলাম।'

'কি, বলুন।'

'আমি যদি চলে যাই তোমার নামে কিছু টাকা রেখে যাব—তা থেকে লখনউ-এ তোমার পড়ার খরচ হয়ে যাবে। আরো একটা কথা ভাবছি, গাড়ীখানা দুর্গাকে বেচে দেব। ও ট্যাক্সি করে তাহলে চালাবে। ও কত টাকা পারবে দিতে ?

নয়নমণি বলল, 'অত টাকা ও কোথায় পাবে ? মেমসায়েবের গাড়ী তো খুব দামী গাড়ী।'

মেমসায়েব অনেকক্ষণ ভাবলেন, 'ওকে জিগ্যেস করে দেখো তো, ট্যাক্সি চালাতে চায় কিনা। টাকার কথাটার পরেও একটা মীমাংসা হতে পারে।'

চৌত্রিশ

শহরে নানারকম প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে। কোম্পানীর পক্ষের সব প্রচারপত্র। সেইসব পড়ে বোধনের মতিগতি আবার খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। সিং-জী বোধনের বাড়িতে প্রচার পত্রগুলো রেখে যায়। বোধনই বিলি ব্যবস্থা করে। প্রচার পত্রগুলোর সার মর্ম হল এই : রিফাইনারী ও খনির কাজ চালাবার জন্য সায়েবরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শ্রমিকেরা কাজে যদি ফিরে না আসে তাহলে সায়েবরা অন্য লোক নেবে, কিন্তু কিছুতেই শ্রমিকদের দাবী মেনে নেবে না। রাজনৈতিক চক্রান্তের

কাছে সায়েবরা মাথা নোয়াবে না। যে সব শ্রমিক কাজে ফিরে যাবে, তারা সকল রকম সুবিধা তো পাবেই উপরন্তু পুলিশ তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে।

টাওলার সায়েব বসে থাকার লোক নয়। রিফাইনারী চালাবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে সিং-জীকে লাগিয়ে, ফালতু লোক আমদানী করেছে। তলায় তলায় নাকি লোক নিতেও আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভলণ্টিয়ারদের ভয়ে তাদের শহরে এনে ফেলতে পারেনি।

য়ুনিয়নের ফাণ্ড শূন্যে পৌঁছেছে। য়ুনিয়ন এদিকে ওদিকে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠিয়েছে। কিন্তু তা থেকে টাকা পয়সা খুব কমই উঠেছে। এদিকে বারো হাজার শ্রমিকের খাদ্য সংগ্রহের সমস্যা রয়েছে। লোকেদের অসন্তোষ বাড়ছে। লোকের গভীর আস্থা ছিল কংগ্রেস সরকার কিছু একটা করতে পারবে বলে। কিন্তু কই, কিছুই তো করতে পারল না। কোম্পানী এক চুলও নড়ল না। এখন নাকি কংগ্রেস সরকারই পদত্যাগ করার কথা ভাবতে লেগেছে।

এসব সকলের জানা কথা।

এদিকে আচম্বিতে একটা ঘটনা ঘটে গেল। বোধনের নেতৃত্বে প্রায় একশো জন শ্রমিক খনিতে কাজ করার জন্যে বেরিয়েছিল। ইসমাইল খবর পেয়ে ভলণ্টিয়ার নিয়ে শ্রমিকদের পথ আটকাল। ইসমাইল ছিল ভলণ্টিয়ারদের অধিনায়ক।

দু'দলে মুখোমুখি দাঁড়াল ঠিক চণ্ডীর বাসার কাছে— সেই ময়দানে।

তর্কাতর্কি আরম্ভ হল।

বোধন বলল, 'জোর জবরদস্তি করতে এসেছো কেন? সরে যাও। সরে যাও বলছি, তা না হলে আমরা পুলিশ ডাকব।'

ইসমাইল শান্তভাবে বলল, 'এতগুলো লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে এমন কাজ করতে যাবেন না। মিনতি করে বলছি।'

বোধনের দল শুনতে চাইল না। বিদ্রূপ করে বলল, 'য়ুনিয়ন কি আমাদের খাওয়াবে, না কাজ দিতে পারবে?' কত তাদের অভিযোগ।

কিন্তু ইসমাইলও অচল অটল।

কে যেন মিশ্রকে গিয়ে খবর দিল। মিশ্র পুলিশের দল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল—ভাবখানা এই যে শান্তিভঙ্গ হলেই পুলিশ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। অতঃপর কে যেন গিয়ে সায়েবকে খবরটা দিল। স্বয়ং টাওলার সায়েব ও রাওলট সায়েব ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখানে এসে পৌঁছল।

বোধনের তেজ বেড়ে গেল, সে বলল, 'ইসমাইল সরে যাও। পথ ছাড়ো— আমাদের যেতে দাও, তা না হলে ভালো হবে না বলছি।'

রাওলট সায়েবও বলল, 'এদের পথ ছেড়ে দাও।'

কিন্তু ইসমাইলের দল অচল অটল।

খানিকক্ষণ ধরে উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। বোধন তখন ভাবতে লেগেছে কি করবে না করবে, এমন সময় একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে

ফেলল লছমী। উর্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে সে বোধনের সামনে সটান শুয়ে পড়ল। চীৎকার করে বলল, 'বাবা, আমার বুকের ওপর লাথি মেরে যেতে যদি পারো তো যাও। তোমার এতই স্বার্থবুদ্ধি, যে তুমি এতগুলো শ্রমিকের হক নষ্ট করতে এসেছো? কে তোমায় এই উসকানী দিল? সায়েবের প্ররোচনায় শ্রমিকদের মর্যাদা কি ভুলে গেছো?'

বোধন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে বলল, 'লছমী, তুই সরে যা।'

'না, কিছুতেই সরে যাব না আমি।'

ব্যস্। ওইখানেই বোধনের হম্বিতম্বির ইতি। সে পিছন দিকে গোঁত্তা মেরে সেখান থেকে ফিরে গেল। টাওলার আর রাওলটের চক্ষু স্থির—তারাও ফিরে গেল। টাওলার বুঝল বোধনের ওপর আর আস্থা রাখা চলবে না। মিশ্র ও তার পুলিশের দল ও ফিরে গেল থানায়। এ যাত্রা ইসমাইলের ভলণ্টিয়ার দলের জয় হল।

খবরটা যখন য়ুনিয়ন অফিসে গিয়ে পৌঁছল, সকলেই লছমীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। সেদিন থেকে লছমীকে ভরতি করে নেওয়া হল য়ুনিয়ন অফিসের কাজে। তার উপর ভার দেওয়া হল মেয়েদের সংগঠন করার কাজ। লছমী পান্নুকে সঙ্গে করে বস্তি, ব্যারাক আর শ্রমিকদের বাসা বাসায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের মনোবল দৃঢ় করার কাজে লেগে গেল। তাতে কাজও হল।

□

বরুয়ার স্ত্রী সবই বুঝতে পারেন। বাবা তাঁর ঘোর কংগ্রেসী, জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন। তবু মাস মাইনে এবার হাতে না পেয়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে খিটমিটি বাধিয়ে দিলেন। ছেলের অন্নপ্রাশন হয়নি, তার জন্যে খরচ ধরেছিলেন পনেরো টাকা। সেই পনেরো টাকাও বরুয়া দিতে পারলেন না। ওদিকে বিহু এসে গেছে। এবার বিহু তো নয়—বিষ। দেড়মাস ধর্মঘট চলছে, বরুয়ার সংসার চালানো দায় হয়েছে।

একদিন বরুয়া গিয়েছিলেন সদলবলে বিহু গান গাইতে—উদ্দেশ্য গান গেয়ে য়ুনিয়ন ফাণ্ডের জন্য টাকা তোলা।

বরুয়ার স্ত্রী ছেলে কোলে করে বেরিয়ে এল বসবার ঘরে। বরুয়া পান সাজ-ছিলেন। স্ত্রী বললেন, 'এবার বাড়িতে বিহু হবে না নাকি?'

'না।'

'এভাবে কি করে চলবে? আমার হাতে তো একটা পাই পয়সাও নেই।'

বরুয়া হেসে বলল, 'সহধর্মিনীর পরীক্ষার এইতো সময়।'

'ধর্মঘট করে কার যে কি হবে জানি না। লাভের মধ্যে নিজের চাকরীটাও তো খুইয়েছো।'

বরুয়া হেসে হেসে বললেন, 'কেবল চাকরী কেন, দরকার হলে...

'দরকার হলে—কি করবে বললে?'

'তোমাকেও ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'ইস, আমায় বুঝি পারবে ছেড়ে যেতে ?'

'য়ুনিয়নের চেয়ে স্ত্রী বড়ো নয়, এমন কি প্রাণও বড়ো নয়।'

'এসব বড়ো বড়ো কথা। বরফুকনের মতো কথা বলছো।'

বরুয়া এবার গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন, 'তোমার মুখে এরকম ঠাট্টা শোভা পায় না। তুমি তো জানো আমি য়ুনিয়নের সহকারী সম্পাদক।'

বরুয়ার স্ত্রী কথাটার তাৎপর্য গ্রহণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক বুঝলেন না। তিনি বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করলেন, 'কি হয়েছে বলো তো—বুঝিয়ে বলো।'

য়ুনিয়নের মেরুদণ্ড ভাঙবার চেষ্টা করছে টাওলার সায়েব। সিং-জী তার ডান হাত, সে এবার গেছে ফালতু লোক আনতে। আজই হোক কালই হোক তারা এখানে এসে পৌঁছবে। কোম্পানী জোর করে এদের কাজে সামিল করে দিতে চায়। বারো হাজার শ্রমিকের মুখে অন্ন উঠছে না। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। আমাদের প্রাণপণে বাধা দিতে হবে। কি যে হবে জানি না...'

বরুয়ার স্ত্রীর মুখখানা শুকিয়ে গেল, উদ্বেগ দেখা দিল। খুবই খারাপ খবর। চাকরী ফিরে না পেলে আবার পোঁটলাপুঁটলী বেঁধে ফিরে যেতে হবে গ্রামের বাড়িতে। সেখানে থাকা মানে পচে মরা। তিনি বললেন, 'কিন্তু একটা মীমাংসা করে ফেলো না কেন ?'

'আমরা তো করতেই চাই—কোম্পানী চায় না।'

বরুয়ার স্ত্রী শুধোলেন, 'ওদের দয়া মায়া ধর্ম বলতে কিছু নেই নাকি ?'

'নেই।'

প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষের ভয়। ইসমাইল তার ভলণ্টিয়ার বাহিনী নিয়ে সব সময় লুকিয়ে-ছুপিয়ে আনা ফালতু শ্রমিকদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাস মাইনে না পেয়ে লোকেরা পাগলের মতো হয়ে আছে। দুঃখের নিশা যেন আর ফুরোতে চাইছে না। তার ওপর এখন ভয় হচ্ছে যে কাজ যেতে পারে। সায়েবরা মাঝে মাঝে রিফাইনারী চালাচ্ছে—অফিসারদের কেউই ধর্মঘটে যোগ দেয়নি। ওদিকে বড় সায়েব চলে গেছেন শিলং। এখন টাওলার সায়েবের একচ্ছত্র অখণ্ড প্রতাপ। কিন্তু এতগুলি শ্রমিকের চোখে ধুলো দিয়ে, বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানী করাটা খুব সহজ কাজ নয়। তিনসুকীয়ার প্ল্যাণ্টে-ও কাজকর্ম্ম বন্ধ। ফিল্ড-এর অবস্থা শোচনীয়—একটা খনিতেও কাজ হচ্ছে না। ড্রিলিং ডিপার্টমেণ্টের সকলেই ধর্মঘট করেছে। বাংলোতেও বাবুর্চি খানসামা কেউ নেই। সায়েবদের রান্নাঘরেও ধর্মঘট।

বরুয়া ধর্মঘটের কথা ভাবছিলেন। তাঁর স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে বরুয়ার কোলের দিকে এগিয়ে বললেন, 'বিভূতিকে তুমি একদিনও ভালো করে কোলে করোনি। কী সুন্দর আধো আধো কথা বলে—একবার যদি শুনতে।'

বরুয়া ছেলের দিকে হাত বাড়ালেন, কিন্তু ছেলে আসতে চাইল না। স্ত্রী কপট রাগে ছেলেকে বকে বললেন, 'কি ছেলে রে, বাপকে চেনে না।' তারপর স্বামীকে

খোঁটা দিয়ে বললেন, 'কি করে আর চিনবে—বাপের তো কেবল মিটিং, মিটিং আর মিটিং। ছেলেকে ডেকে নেবারও সময় নেই, ছেলের মায়ের সঙ্গে কথা বলবারও সময় নেই।' তারপর আবার একটু হেসে বললেন, 'ঠিক আমার বাবার মতো তোমার অবস্থা হয়েছে। বাবা মাষ্টারী ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে নাবলেন। সংসারখানা পড়ল মা'র ঘাড়ে। রাতে যে আমাদের না খেয়ে থাকতে হত, সে কি করে আর বাবা জানবেন ? কংগ্রেসের মানুষ, সকল লোকের কথা ভাবতে হয় তাঁকে। বাবা বাড়িতে থাকলে অবশ্য আলাদা কথা, কোথা থেকে যেন চাল এনে দেন। আমাদের বিভূতিরও দেখবে, হয় তো একই দশা হবে।'

বরুয়া হাসতে হাসতে বললেন, 'হবার হলে হবে। এরকম অবস্থায় না হওয়াটাই আশ্চর্য হত হয়তো।'

'কাজ ছেড়ে আবার চাষবাসের কাজ ধরবে নাকি ?'

'বলা যায় না। আপাতত তো এখানেই আছি।'

খানিকক্ষণ বাদে বাপুচাং গ্রামের বিহুর দল বরুয়ার নামঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ঢোল পেঁপা বাজিয়ে বিহুগান গেয়ে বরুয়াকে ডাকতে এল। আজ ট্রাকে উঠে কয়েকটা চা-বাগানে যাবার কথা আছে। বিহুগান গেয়ে যদি কিছু পয়সা তোলা যায়!

ঢোল পেঁপার বাজনা শুনে বিভূতি চমকে উঠল। জীবনে এই প্রথম সে বিহুগান শুনছে। ওকে জড়িয়ে ধরে মা ভিতর ঘরে নিয়ে গেলেন, বরুয়া হাত পা ধুয়ে নিজের পুজোর ঘরে ঢুকলেন, তারপর নিত্যনৈমিত্তিক পুজো সেরে নিলেন কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে। বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে বরুয়ার স্ত্রী ভিতর ঘরের খিড়কি দরজার আড়াল থেকে বিহুর নাচ দেখতে লাগলেন। কোলে শুয়ে বিভূতির তন্দ্রা এল।

বাপুচাং গ্রামের বিহুর দল এ অঞ্চলে বিখ্যাত। সন্ধ্যা নামছে, এক ঝাঁক কাক উড়ে এসে বসল অশত্থ গাছের ডালে ডালে, সেখানেই ওদের বাসা। ঢোল পেঁপার ধ্বনিতে ওদের কর্কশ কা কা ডুবে গেল। ঢোলের তালে তালে নাচনী নাচতে লাগল, গায়নী টকঠকি বাজিয়ে গাইতে লাগল :

ইফালে টকার মাত সিফালে টকার মাত
মাজত শোলেংগুরি সূঁতি।
টকার মাত শুনি বাঢ়িল সতিয়নী
পুলিয়ে ধরিলে গুটি॥

(এদিকে বাজে টকঠকি ওদিকে বাজে টকঠকি,
শোলেংগুরি লতা দোলে মাঝে,
টকঠকির বাজনা শুনে ছাতিন মাথা তোলে
ফল ধরে ডালে পুলিগাছের।)

নাচনী এবার তীব্র গতিতে নাচতে লাগল। ঢুলির ঢোলের তাল যেন ওর পায়ের

তালের সঙ্গে তাল রাখতে আর পারছে না। সেই চরম মুহূর্তে গানের কথা আর শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে ধারে কাছের প্রতিবেশীরা বিহু দলের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। প্রথম গীত শেষ হতেই, গায়নী আরো একটা গীত শুরু করল ঃ

কোম্পানীর চাকরী করিছোঁ লাহরী
খাবলৈ নজোরে ভাত।
তোমাক আনিম বুলি বাট চাই থাকোতে
যৌবন মরহি গল।

(কোম্পানীর চাকরী করছি আমি রূপসী
জোটে নাকো পেটে আমার ভাত,
তোমায় ঘরে আনব বলে চেয়ে থাকি পথে
যৌবনে মোর ছাতা পড়ে যায়।)

তারপর আবার গান, আবার নাচ, আবার ঢোলের বোল।

হাত মেলি হালটি ঘঁহিবি মালতী
চুলি মেলি ঘঁহিবি তেল।
চারি আলির মূরলৈ আহিবি লাহরী
দেশর ডেকা ল'রার মেল।
কোম্পানীর তেল কল মাহ দিন চলা নাই
খাদর তেল তুলিব কোনে ?
বার হেজার মণিচর আলৈ আথানী
পেটর ভোক পূরাব কোনে ?

(হাতে হলুদ গায়ে হলুদ মাখো ওরে মালতী
চুল খুলে মাখো গন্ধ তেল।
চৌমাথার মোড়ে গিয়ে দেখে এসো রূপসী
দেশের সব যুবক দলের মেল।
কোম্পানীর তেলের কল সারাটা মাস চলে না
খনির তেল উঠবে কেমন করে ?
বারো হাজার মানুষের দেশগুলোর কেউ নেই
কবে ওরা খাবে পেট ভরে ?)

সমবেত গীত নৃত্য অবিরাম চলতে লাগল এইভাবে।

বরুয়ার স্ত্রী বিহু গান শুনতে শুনতে ঘর সংসারের কথা যেন ভুলে গেল। নামঘরের সামনের মাঠটা দর্শকে ভরে গেল। ঋতু উৎসবের এমনি আকর্ষণ।

বরুয়া ভিতর বাড়িতে হাতের কাছে যা জামা কাপড় পেল, তাই পরে বেরিয়ে

এলেন বিহু দলের সঙ্গে যোগ দিতে। হঠাৎ স্ত্রীকে দেখে ওর মনটা কেমন যেন আর্দ্র হয়ে উঠল, ডাকলেন, 'কাঞ্চন!'

'কি হয়েছে?' এরকম নরম আদরের ডাক আগে বরুয়ার স্ত্রী কখনো শোনেন নি। তিনি বরুয়ার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'রাত করে ফিরবে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা রাত একটু হবে।'

স্ত্রীর চোখে একটা কাতর মিনতি। 'তাড়াতাড়ি এসো। আজকাল আমার সব সময় ভারি যেন একা একা লাগে।'

বরুয়া স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করলেন, তারপর গালে একটা চুমো দিয়ে বললেন, 'আর বেশিদিন তোমায় একা একা থাকতে হবে না। তাড়াতাড়িই কিছু একটা ঘটবে। হয় জয় নয়তো পরাজয়। কিছু যদি না হয়, তাহলে একটা দোকান বসাব। স্বাধীন ব্যবসায় লাগতে হবে—বুঝেছো?'

স্ত্রী বললেন, 'আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় হয়।'

'কিসের ভয়?'

'এসব আমি কিছু বুঝতে পারি না। পুলিশ, মিলিটারী, ধর্মঘট—তুমি ঘরে ফেরা না পর্যন্ত আমার স্বস্তি হয় না।'

বরুয়া আরো একটি চুমো খেয়ে বললেন, 'চিন্তা করে কি লাভ? নিজের ওপরে বিশ্বাস রেখো।' এবার স্ত্রীকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে বরুয়া বিহুর দলের সঙ্গে যাত্রা করতে তৈরি হল।

সেই সময়ে বাইরে লছমীর গলা শোনা গেল, 'বরুয়া বাবু, বরুয়া বাবু!'

কথা বলতে বলতে সে হাঁপাচ্ছে। বোধহয় দৌড়ে এসেছে।

'কি হয়েছে, লছমী?'

'সাংঘাতিক খবর। গিয়াসুদ্দীন সাহেব এখুনি আপনাকে যেতে বলেছেন। বিহুর দলের সঙ্গে আপনার যাওয়া হবে না।'

'কি খবর?'

'চৌমাথার কাছে অশথ গাছের তলায় দুই ট্রাক-ভরতি ফালতু মজুরের দলকে, ইসমাইলের দল ঘেরাও করে রেখেছে। আসাম রাইফেলস-এর সৈন্যেরা আসছে। সায়েবরাও আসছে ঘোড়া চেপে। কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না।'

বরুয়া বললেন, 'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

বিহু গান ইতিমধ্যে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। বালুচাং গাঁয়ের দল ও দর্শকের দল চৌমাথার দিকে দৌড়তে লাগল।

বরুয়া লছমীকে জিগ্যেস করলেন, 'কে কে আছে সেখানে?'

'সবাইকেই তো দেখলাম—চ্যাটার্জি, চণ্ডী, গিয়াসুদ্দীন, প্রধান, মালা সিং...।'

বরুয়ার স্ত্রী হঠাৎ কাতর হয়ে বরুয়ার হাত দু'টো ধরে বললেন, 'তুমি যেয়ো না। সবাই গিয়ে কি করবে ?'

বরুয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'বাধা দিতে নেই।'

স্ত্রী আবার বললেন, 'যেয়ো না।'

বরুয়া স্ত্রীর কথায় কান দিলেন না, কর্তব্যের আহ্বানে তিনি কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন ?

স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বিভূতিকে শোওয়াবার জন্যে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। লছমীর খারাপ লাগল। বড় সরল মানুষ—খুব ভয় পেয়েছেন। ওর মনে হল, কিছুক্ষণ বরুয়ার স্ত্রীর কাছে থাকাটা ভালো। তাই শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিভূতিকে শুইয়ে দিয়ে বরুয়ার স্ত্রী লছমীর দিকে তাকালেন। ওঁর চাহনীতে একটা যেন রাগ আছে। ডাকতে এসেছিল বলে লছমীর প্রতি রাগ—যেন ডাকতে এসে লছমী অন্যায় করে ফেলেছে।

লছমী বলল, 'আপনি কেন এত চিন্তা করছেন ?'

বরুয়ার স্ত্রী জিগ্যেস করলেন, 'কি হয়েছে, তুমি ভালো করে বলো তো।'

লছমী বলল, 'হাজার দুই লোক নিয়ে বেশ কয়েকটা ট্রাক এসে ডিগবয়ের উপকণ্ঠে পৌঁছেছে বিকেল নাগাদ। সেইসব ট্রাকগুলোর মধ্যে দুটো শহরে প্রবেশ করবে বলে আসছিল। কেন যে আসছিল, তা না বললেও হবে। ইসমাইলের ভলন্টিয়ার দল গিয়ে ট্রাক দু'টোকে রুখতে চাইল। দু-দলে তর্কাতর্কি শুরু হল। প্রথম প্রথম ভলন্টিয়ার ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন। আস্তে আস্তে আরো অনেক লোক জমা হল সেখানে। সায়েবরাও খবর পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত। কোথা থেকে যেন আসাম রাইফেলস-এর লোকেরাও এসে পড়ল। আমি এখানে আসা পর্যন্ত ট্রাক দুটো ঠাঁই দাড়িয়েছিল। ইঞ্জিন চলছে কিন্তু নড়াচড়া করতে পারেনি। কি হবে কে জানে!'

'ওখানে তুমি গিয়েছিলে কি করে ?'

লছমী হাসতে লাগল, 'আমি ? আমি কোথাও যাব না কেন ? আমি তো সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। পুরুষদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে কাজ করছি। এখন তো আমি চৌরাস্তাতেই ফিরে যাব। মেয়েরা কেন পিছনে পড়ে থাকবে ? কোম্পানী আমাদের স্বামীদের কাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে, আর আমরা কিছু না বলে ঘরের কোনে বসে না খেয়ে না দেয়ে মরব ? সে হতে পারে না। কিছুতেই পারে না। কাউকে আমি ডরি না। আপনি তো জানেন, আমার বাবা একদিকে, আমার স্বামী আরেক দিকে। বাবাকে আমি আর দেখতে পারি না, সিং-জীর সঙ্গে জুটে বাইরে থেকে মজুর আমদানী করতে লেগেছেন...'

বরুয়ার স্ত্রী লছমীর মুখখানা একবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন। সত্যিই ওই মুখে লেশমাত্র ভয় বা সংশয় নেই। মেয়েমানুষ যে এত নির্ভীক হতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। হঠাৎ তাঁর মনেও যেন সাহস জাগল, তিনি

বললেন, 'মেয়েদের মধ্যে কি যেন কাজ করছ তোমরা? কই, আমার এখানে তো একবারও আসোনি এতদিন।

'আপনার কচি ছেলে ছেড়ে আপনি বেরোতে পারবেন না মনে করে এতদিন আসিনি। আসা দরকার হলে নিশ্চয় আসব। মেয়েরা যে ছেলেদের সমান, কোনো অংশে হীন নয়, আমরা তা প্রমাণ করতে চাই। আচ্ছা, এখন আমি চলি। ঘটনাস্থলে যেতে হবে। সেখানে থাকতে হবে। পারলে কিছু করতেও হবে।'

লছমী দৌড়ে চলে গেল। 'আশ্চর্য মেয়ে'—বরুয়ার স্ত্রী মনে মনে বললেন।

পঁয়ত্রিশ

বরুয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন। সারা মাঠখানার উপর ছড়িয়ে আছে পাতলা একটা অন্ধকার। প্রথমে তিনি কিছু ঠাহর করে উঠতে পারেননি। কিন্তু যেখানে ট্রাক দুটো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে রাস্তার ধারের বিজলী বাতির আলো এসে পড়েছে। ইঞ্জিন চলছে, ট্রাক দু'খানা ঘেরাও করে রেখেছে ইসমাইল, গিয়াসুদ্দীন, মালা সিং, প্রধান আরো অনেক লোক।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে আসাম রাইফেলস-এর প্লাটুনটা। দেখে মনে হচ্ছে একদল ভূত যেন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে।

ইসমাইলদের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি তেজী ঘোড়ার উপর তিনজন মদগর্বিত সায়েব। তারা যেন ইংরেজ নয়—ইংরেজের প্রেতাত্মা। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে পিস্তল—টাওলার, জিলাপসী ও টেইনস।

বড় সায়েব হিগিনস ডিগবয়ে নেই, তাই টাওলার রাজ্যপাটে উঠেছেন। তিনি হয়েছেন পাট-রাজা।

ট্রাক-এর সামনে যে জনতার দঙ্গল, তাদের সংখ্যা হবে পাঁচ শো মতো। বিশৃঙ্খল জনতা। গিয়াসুদ্দীন, মালা সিং ও প্রধান—তিনজনই চীৎকার করে সবাইকে বলছেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, উত্তেজিত না হতে। কিন্তু লোকেরা শুনবে কেন? প্রতিপক্ষের উদ্দেশে গালাগাল দিচ্ছে। রাগে ফেটে পড়ছে। কেউ কেউ বলছে, ট্রাক-এর ইঞ্জিন বন্ধ করবার জন্যে। কেউ কারো কথা শুনছে না, নিজেরাই বলে যাচ্ছে। হুলুস্থুল কাণ্ড।

বরুয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন জনতা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। ইতিমধ্যে চণ্ডী কোথা থেকে এসে হাজির। বরুয়াকে দেখে বলল, 'কখন এলেন?'

'এইমাত্র।'

'আমিও এই এলাম, স্বামীজীর ওখানে খবর পেয়ে।'

চণ্ডী ট্রাক দু'টোর দিকে তাকাল। বরুয়া ও চণ্ডী একই দৃশ্য দেখছে। কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু একটা কিছু বিহিত করতেই হবে।

গিয়াসুদ্দীনেরা এখনো কিছু করতে পারেন নি।

টাওলার সোজা হুকুম দিল, 'ড্রাইভার ট্রাক চালাও। ডরো মৎ।' টাওলারের প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়াটা যেন নাচতে লেগেছে। ড্রাইভার ট্রাক চালাবার উদ্যোগ করাতে শ্রমিকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, চালিয়ো না।' ড্রাইভার নিজেও তো মজদুর শ্রেনীর লোক, তার বিবেকে বাধল। ইঞ্জিনটাই চলতে লাগল, ট্রাক চলল না।

টাওলার আবার চেঁচিয়ে উঠল 'গাড়ি চালাও!'

ড্রাইভার আবার চালাতে চেষ্টা করল। সামনে যারা ছিল তারা ঠেলে হটিয়ে দিতে চাইল ট্রাকটাকে। আবার ড্রাইভারের বিবেকে কামড় দিল। না, পয়সার জন্য অতগুলি লোককে চাপা দিয়ে মারতে পারবে না কিছুতে।

হঠাৎ বরুয়া দেখলেন চণ্ডী পাশে নেই। সে জনতার ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাক ড্রাইভারের কেবিনটার দিকে। অতর্কিতে কেবিনের দরজা খুলে, ড্রাইভারকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে, ড্রাইভিং সীট্-এ বসে চণ্ডী স্টার্ট বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর বুকে লাগল গুলি। বরুয়া দেখলেন, তাঁর অনতিদূর থেকে গুলি ছুড়ল জিলাপসী। তিনি সইতে পারলেন না, ঘৃণায় রাগে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'হত্যাকারী!'

জিলাপসী এবার চেঁচিয়ে বলে উঠল 'চালাও ড্রাইভার! গাড়ির স্টার্ট কে বন্ধ করে দেখে নেব।'

বরুয়া আর সইতে পারলেন না। গুলির আওয়াজে জনতার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলেও, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল একেবারে বেপরোয়া। গিয়াসুদ্দীন চণ্ডীর রক্তাক্ত দেহখানা নিজের কাঁধের উপর তুলে নিয়ে, চীৎকার করে ধারেকাছের সব লোককে বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা খেতে না পেয়ে মরলেও মরছি, গুলির ঘায়ে মরলেও মরছি—একই কথা।'

গুলির শব্দ শুনে জনতা যত না ভয় পেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়েছিল ট্রাক-এর উপর যেসব বহিরাগত ফালতু মজুর ছিল তারা। পিছনের ও সামনের দুটো ট্রাক থেকেই একজন দু'জন করে লোক খসে পড়ছিল, ঘেরাও হতেই। গুলি মারার পর কেউ কেউ লাফিয়ে নিচে নেমে পালাতে শুরু করল।

সেই দৃশ্য দেখে টাওলার তিষ্ঠোতে পারল না, আবার হুকুম দিল, 'ড্রাইভার চালাও গাড়ি, তা না হলে তোমাকেও গুলি করব।'

এইবার ড্রাইভার ভয়ে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করল।

মুহূর্তের মধ্যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে ঠেলেঠুলে কয়েকজন ধর্মঘটী মাড্‌গার্ড-এর উপর উঠে পড়ল, তাদের কেউ কেউ ড্রাইভারের হাত চেপে ধরে বলল, 'খবরদার বলছি, চালিয়ো না।'

ড্রাইভারের হাতটা ধরে কে একজন তাকে কেবিন থেকে বাইরে আনতে চাইছিল হেঁচকা টানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বরুয়া লক্ষ্য করলেন, জিলাপসী গুলি করছে। ড্রাইভারকে টানাহেঁচড়া করছিল যে লোকটি, সে ধপ্ করে পড়ে গেল।

এবার জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল। ট্রাক-এর লোকগুলো ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কোন দিকে যে পালাল, তা আর টাহর করা গেল না।

টাওলার আবার চেঁচাল, 'ড্রাইভার, চালাও গাড়ি।'

এবারকার হুকুমটা যেন উপহাসের মতো শোনাল, কারণ দুটো ট্রাকই তখন শূন্য। ট্রাক-এর ধারে কাছে তখনো যে-সব ধর্মঘটী জড়ো হয়েছিল, তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি হট্টগোল শোনা গেল। ওদের কেউ কেউ সামনের ট্রাকটার ড্রাইভারকে নামাবার চেষ্টা করতে লেগেছে। বরুয়া দেখলেন, এবার পা-দানী বেয়ে উঠছে ইসমাইল। জিলাপসী আবার তার পিস্তল নিশানা করল।

বরুয়া কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে, দৌড়ে গিয়ে জিলাপসীর একটা ঠ্যাং ধরে হিঁচড়ে টান মেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে ওকে নামিয়ে ফেললেন মাটিতে, জিলাপসী পিস্তল-শুদ্ধ মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটল পিস্তল থেকে—বরুয়ার বুকেই লাগল গুলিটা। বরুয়া পড়ে গেলেন।

বোধন কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বরুয়ার দেহটার কাছেই জিলাপসী ছিল মাটিতে পড়ে। এবার সে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়াটা তখনো স্থির দাঁড়িয়ে। জিলাপসী রেকাবে পা দিয়ে উঠতে যাবে, এমন সময় কে যেন দুমদাম ঢিল ছুঁড়তে লাগল সায়েবদের দিকে। একটা ঢিল এসে লাগল জিলাপসীর মাথায়। জিলাপসী যেন অন্ধকার দেখল। পর মুহূর্তে ভয় পেয়ে সে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিকে ওদিকে বাকি গুলিগুলো ছুঁড়ল। তারপর মরি বাঁচি করতে করতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঊর্ধশ্বাসে পালাল। সেই সঙ্গে টাওলার ও টেইনসও পালিয়ে গেল। টাওলারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। নূতন করে নিযুক্ত করার জন্য যেসব ফালতু মজুর এনেছিল, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল। যেসব ধর্মঘটী ঘেরাও করেছিল—তারাও একে একে চলে গেল।

অশত্থ গাছের তলাটাই কেবল রক্তে রাঙা হয়ে রইল।

কোথা থেকে যেন দৌড়ে এল লছমী। ওর খোঁপা খসে পড়েছে, হাস্যময়ী মেয়েটি এখন কাতর হয়ে কাঁদতে লাগল, 'কোথায় গেলে বাবা গো। কোথায় গেলে তুমি? সায়েবদের জন্যে কত তুমি করেছিলে। এখন সায়েবের গুলিতেই মরলে তুমি ...।'

ট্রাকদু'টো খালি হয়ে গেছে। জনশূন্য ময়দানের পাশে, রাস্তার ধারে তখনো আসাম রাইফেলস-এর প্লাটুন দাঁড়িয়ে। সৈন্যেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো। লছমী কেঁদে চলেছে, ওর কান্না শুনে কোথা থেকে যেন গিয়াসুদ্দীন সাহেব এসে পড়লেন। বরুয়ার দেহটার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন

কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটু গেড়ে সাবধানে বরুয়ার গুলিবিদ্ধ বুকের উপর একটু হাত বুলিয়ে যেন আপন মনেই বললেন, 'শেষে আপনিও চলে গেলেন। চ্যাটার্জি গেল। চণ্ডীও গেল।' তিনি আস্তে আস্তে দেহটা কোলে তুলে নিতে যাচ্ছেন, এমন সময় কোথা থেকে বন্দুকের গুলির মতো হঠাৎ এসে পড়ল পুলিশ কমিশনার রাওলাট। এসেই বলল, 'দেহ ওঠাতে যাচ্ছ কেন? নেওয়া চলবে না...।'

গিয়াসুদ্দীন শান্ত সুরে বললেন, 'লোকগুলোকে বাঁচাতে এলেন না কেন, পুলিশ সায়েব। এখন মৃতদেহ নিতে এলেন?'

রাওলট গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ছিলাম না। মৃতদেহ পোস্ট-মরটেম করতে হবে। ভ্যান-এ তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

ইতিমধ্যে লছমীর কাঁদাকাটার পালা শেষ। কাউকে কিছু জিগ্যেস না করেই সে সোজা গিয়ে দাঁড়াল পুলিশ কমিশনারের সামনে। চোখ থেকে তখনো তার অঝোরে চোখের জল ঝরছে। লছমী বলল, 'যদি ধর্ম থাকে তোমরা জাহান্নামে যাবে। কৃমিকীট খাবে তোমাদের। বরুয়ার স্ত্রীর শাপ লাগবে, পান্নুর শাপ লাগবে, আমার শাপ লাগবে, সকলের শাপ লাগবে তোমাদের ওপর। মানুষকে গোরু মোষের মতো মেরে ফেলার শাস্তি দেবেন ভগবান।'

রাওলট লছমীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শাট্ আপ্!' তারপর মিশ্রকে ডেকে বলে দিল, 'ঘটনাস্থলের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন রাখো। একটাও দেহ যেন কেউ না নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে কেবল পুলিশ পাহারা দেবে—আর কেউ থাকবে না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থল ঘেরাও করল পুলিশ। তারপর মিশ্র আবার এসে দাঁড়াল রাওলটের সামনে।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। লছমী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাওলটের দিকে। আর চোখের জল ঝরছে না; চোখ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।

রাওলটের লম্বাটে মুখখানা বিরক্তিতে কুঞ্চিত অথচ কৌতূহলও যে নেই তা নয়।

সে বুঝতে পারছে, লছমীর চোখে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই ঘৃণার অর্থও সে বুঝেছে।

গিয়াসুদ্দীন বরুয়ার দেহখানা কোল থেকে নামিয়ে মাঠের উপর শুইয়ে দিল।

আলো এসে পরেছে বরুয়ার প্রাণহীন মুখের উপর। গিয়াসুদ্দীন হাঁটু গেড়ে তাঁর সেই মুখখানার দিকে তাকালেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কিছু কি আছে? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সহজে আসা যাওয়ার মতো মানুষ সহজ জীবন থেকে মরণে ও মৃত্যু থেকে জীবনের মধ্যে আসাযাওয়া করতে পারে না কেন?

গিয়াসুদ্দীনের মুখে প্রথম প্রথম একটা প্রতিশোধের স্পৃহা ফুটে উঠেছিল। এই সব সায়েবদের মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বুঝলেন, প্রতিশোধে কোনো ফল হয়না, প্রতিশোধ নিষ্ফল। কোম্পানী একটা অশরীরী প্রেতের মতো।

কোম্পানীর রক্ষাকর্তা ব্রিটিশ সরকারও অশরীরী বস্তু মাত্র।' এদের গুলি করে মারা নিরর্থক।

তা হলে কি করা উচিত ?

সামনেই বোধনের মৃতদেহ পড়ে আছে। স্তানু ট্রাক্‌চুটের অদূরে একটা উঁচু ঢিপির উপর পড়ে আছে চণ্ডী ও চ্যাটার্জির শবদেহ। চারজন মানুষ মেরে ফেলল সায়েব তিনজন। পুলিশ যেন তামাশা দেখল। আইনকে ওরা দলিত মথিত নিশ্চিহ্ন করে দিল। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার ছাড়া এভাবে কেউ জনতার উপর গুলি ছুঁড়তে পারে না। কিন্তু ওরা কুকুর বেড়াল মারার মতো মানুষ মেরে, বাংলো বাড়ি গেছে 'গরম পানী' খেতে। মজুরের রক্তে ওরা বাতি জ্বালাবে। মজুরের মাংস ওদের ডিনার। শিলং-এ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। চাকরের সরকার। আই. জি. পি কেবল গভর্নরের কথা শোনে, হোম মিনিস্টারের কথায় কান দেয় না।

লছমী চীৎকার করে বলল, 'যদি ধর্ম থাকে তাহলে এদের সবাইকে পোকায় খাবে।'

গিয়াসুদ্দীন উঠে এলেন। তারপর লছমীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এদের শাপ দিয়ে মারতে পারবিনা রে, লছমী।'

লছমী বিরক্তি ভরে তাকাল গিয়াসুদ্দীনের দিকে, বলল, 'ধর্ম নেই বলে ভাবছেন কি ? ভগবান বুঝি নেই ? ওরা এত সহজে কি পার পাবে ?'

রাওলট একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লছমীর দিকে। তার অন্তরে আগুন জ্বলছে—অপমানের নয়, বিরক্তির। টাওলার খুবই ভুল করেছে। ওদের আরো কেউ নিশ্চয় ভুল করেছে। কেউ প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে কুকুর বেড়ালের মতো মানুষ মেরেছে। রাওলট বুঝতে পারছে না, এখন সে কি করবে। ভুল হয়ে গেছে মস্ত। মিশ্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আসাম রাইফেল্‌সও ছিল। সাদা চামড়ার ভয় ? না, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা এস. পি.-র অর্ডার না পেলে ওরা কি করতে পারত ?

মিশ্র সত্যি কথাই বলেছে শ্রমিকেরা হিংসার আশ্রয় নেয়নি। টাওলার কিংবা জিলাপসীর গুলি করার কোনো অধিকার ছিল না। তারা আইন লঙ্ঘন করেছে।

রাওলট ডায়েরী পকেট থেকে বের করেছে। সত্য কথাটা লিখতেই হবে। কিন্তু টাওলার আর জিলাপসী দুজনেই ওর বন্ধু। কি লিখবে ?

গিয়াসুদ্দীন লছমীকে বললেন, 'ধর্ম নেই, ঈশ্বর নেই। থাকত যদি এমনটা হতে পারত কি ?'

রাওলট সায়েবের বিবেকে ঘা দিল কথাটা। সে ডাকল, 'গিয়াসুদ্দীন, এদিকে আসুন তো।' মিশ্রকে বলল, 'তুমি যাও, দেখো গিয়ে এম্বুলেন্স আসছে কিনা।' মিশ্র বেরিয়ে গেল।

গিয়াসুদ্দীন এগিয়ে এলেন। আগে আগে তাঁর হাতে আর জামায় কেরাসিন তেলের দাগ থাকত, আজ তাঁর হাতে ভা'য়ের রক্তের দাগ। তিনি সামনে দাঁড়াতেই রাওলটের বুক খানা কেঁপে উঠল। সে বলল, 'আই এম সরি।'

গিয়াসুদ্দীন বহু কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন। জীবনে এরকম সংযম এবার হয় তো তিনি প্রথম দেখালেন। এই ক'টা দিনের ধর্মঘটের ফলে তিনি একটি শিক্ষা লাভ করেছেন—সে হল সংযমের শিক্ষা। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কতটুকু কাজই বা করতে পারে? সমবেতভাবেই বা কতটুকু? কাজ করতে পারা না পারার উর্ধে, মানুষের অন্তরে আরও একটা যেন শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। সেটা যে ধর্ম বা ভগবান নয়, সেকথা তিনি নিশ্চিত জানেন। সেটা হয় মানব প্রকৃতি অথবা ইতিহাস। এর মধ্যে কোনটা যে মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় কিংবা সংঘর্ষে প্রবর্তনা দেয়,—তা তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। তবে এই শক্তিই প্রেমকে প্রকাশ করে, প্রেম নিয়ন্ত্রণ করে। গিয়াসুদ্দীন মুখ নীচু করে বললেন, 'আমি যদি মরতাম বেশি খুশি হতাম। বেঁচে থাকার দরুণ বড়ো যন্ত্রণা পাচ্ছি। জানেন রাওলট সায়েব, ইংরেজ চরিত্রের ওপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল। আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই আঘাতটাই ভারি অসহনীয় হয়ে উঠেছে।'

রাওলটের মুখখানা কালো হয়ে গেল। আবার ডায়েরীখানা বের করে বলল, 'আপনার কিছু বলবার আছে কি? এই ক'জন লোক কীভাবে মরল—সেই বিষয়ে।'

গিয়াসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'আছে।'

তারপর শুরু থেকে কী কী সব ঘটেছিল তার বর্ণনা তিনি দিয়ে গেলেন। কথা বলা শেষ হতেও তিনি দেখলেন রাওলট নোট লিখেই চলেছে।

'এই বিবৃতির ফলে কিছু কি লাভ হবে?'

রাওলট জবাব দিল না। সে ডায়েরীটা বন্ধ করতে যাচ্ছে এখন সময় লছমী বলল, 'আরো একটা কথা লিখে রাখো সায়েব।'

'কি?'

'এই সমস্ত বিষয়ের কোনো বিচার হবে না। আমার বাবাকে টাওলার সাহেব তার নিজের লোক বলে মনে করত। সব সায়েবই ভাবত বাবা ওদেরই লোক। কিন্তু ফল কি হল? কোনো দয়া মমতা নেই তোমাদের। পারবে কিছু করতে?'

তার মধ্যে মিশ্র ফিরে এসে সেলাম দিয়ে অদূরে দাঁড়াল।

রাওলট সায়েব বিষণ্নভাবে বলল, 'এসব প্রশ্নের জবাব ক্রমে ক্রমে পাবে। এখন লাশ ক'টা হাসপাতালে নিয়ে যাও মিশ্র, এম্বুলেনস এসেছে কি?'

'এসেছে, কিন্তু শ্রমিকেরা শব তুলে নিতে দিতে চায় না...।'

রাওলট সায়েব এবার গিয়াসুদ্দীন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পোস্ট-মর্টেম করা বিশেষ দরকার। সুতরাং আপনি শ্রমিকদের একটু বুঝিয়ে বলুন...।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

গিয়াসুদ্দীন চলে গেলেন। রাওলট মিশ্রকে এম্বুলেনসের কাছে চলে যেতে বললেন।

লছমী তখনো অগ্নিদৃষ্টিতে সায়েবের দিকে তাকিয়ে আছে। রাওলটের সহ্য হল না সেই দৃষ্টি। সে আস্তে আস্তে বিষণ্নমনে নতশিরে সেখান থেকে সরে গিয়ে একেবারে অশত্থ গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আবার

একবার তাকাল লছমীর দিকে। তখনো লছমীর দৃষ্টি অগ্নিবাণ হানছে। সায়েবের মনে হল, মেশিনগানের ফায়ার পাওয়ারের চেয়েও এ মেয়েটির চোখের আগুন যেন বেশি ভয়ংকর। রাওলট বুঝতে পারছেন, এ দৃষ্টি হল সমস্ত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জাতির ঘৃণা বিদ্বেষের প্রতীক।

হঠাৎ সে দেখল, লছমীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আরো একজন স্ত্রীলোক। মাথায় ঘোমটা, পরণে মেখলা। বরুয়ার শবদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তিনি চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। সে কী কান্না! বোধহয় বরুয়ার স্ত্রী। লছমী বরুয়ার স্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তারপর তাঁর কাছে এসে কি যেন সব বলতে লাগল। কিন্তু বরুয়ার স্ত্রীর কানে একটা কথাও ঢুকল না—সে কেবল কাঁদতে লাগল—কাঁদছে তো কাঁদছেই। সেই কান্নার ঢেউ এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল রাওলটের হৃদয়।

এই মর্মন্তুদ শোকের কারণ যে ঘটিয়েছে, সে রাওলটেরই বন্ধু। সকলেই ওরা সাদা চামড়া। অন্ততপক্ষে এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় এখন সেইভাবেই ভাবছে ওদের সম্বন্ধে।

কিছুসময় সেইভাবে কাটল। হঠাৎ এম্বুলেনসের শব্দ শোনা গেল। এম্বুলেনস এসে বরুয়ার দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে নামল মিশ্র, তারপর গিয়াসুদ্দীন ও পান্নু। মিশ্র বরুয়ার স্ত্রীকে বলল শবদেহের কাছ থেকে সরে যেতে। কিন্তু বরুয়ার স্ত্রী অসহায় ভাবে কেঁদে উঠলেন, 'কেন নেবে কেড়ে আমার বুক থেকে? ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও।'

দেহখানা আঁকড়ে ধরে রইলেন।

রাওলটের কপালটা ঘামছে। রুমাল বের করে সে ঘন ঘন ঘাম মুছছে।

মিশ্র গিয়াসুদ্দীনের মুখের দিকে তাকাল। তাঁর মুখেও একটা অসহায় ভাব। তিনি তাকালেন পান্নুর দিকে। পান্নু গিয়াসুদ্দীনের মুখখানা দেখে একেবারে হতভম্ব—দু'জনে যেন পরস্পরকে জিগ্যেস করছে, কি করা যায়। তারপর কথাটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

পান্নু এগিয়ে গিয়ে বরুয়ার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বৌদি, বৌদি। চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই। বরুয়াবাবু ইহজগত ছেড়ে চলে গেছেন। ওঁর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে কি লাভ?'

কিন্তু বরুয়ার স্ত্রী উঠতে চাইছেন না।

আবার সেই আকুল ক্রন্দন।

পান্নু এবার লছমীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো লছমী। এখন আমাদেরই পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে হবে। দুঃখ শোক যদি ভাগ করে না নিই, সহ্য করা শক্ত হবে। এসো, এসো...।'

লছমী এসে বলল, 'ঠিকই বলেছ। তুমি আমায় ঠেকা দেবে, আমি তোমায়

ঠেকা দেব, আর আমরা দুজনে মিলে ওঁকে ঠেকা দেব। তা না হলে ছিন্নমূল গাছের মতো পড়ে যাব আমরা . ।'

লছমীও একদিক থেকে বরুয়ার স্ত্রীকে গিয়ে ধরে উঠাল। দু'জনে ধরাধরি করে তাঁকে দেহটার কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু বরুয়ার স্ত্রীর কান্না বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পান্নু ও লছমীও চোখের জল ফেলতে লাগল। বরুয়ার স্ত্রী ওদের বলতে লাগলেন, 'তোমরা তোমাদের বাবাকে হারিয়েছ, আমি হারিয়েছি স্বামীকে। স্বামীকে হারালে স্ত্রীর সর্বস্ব যায়।'

রহার রহদৈ, তিপামর ভাদৈ, শালগুরির আঘোনী বাই।
তিনিওর ডিঙিত ধরি তিনিও কান্দিছে, সমন্ধত একোটি নাই ॥

তিনজন তিনজনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে—সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।

□

রাওলটের পক্ষে সে দৃশ্য দেখা যেন অসহ্য মনে হল। সেখান থেকে সে আস্তে আস্তে সরে গেল।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, একখানা মোটর আসছে, মোটরের হেড লাইটের আলো এসে পড়ল রাওলটের উপর। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে সরে যেতে চাইছিল, ততক্ষণে মোটরটা এসে ওর কাছেই থেমে গেল। মোটর থেকে নাবলেন মিসেস ফ্লেমিং। পিছনের সীট থেকে দরজা খুলে বেরোল নয়নমণি ও দুর্গা। বেরিয়েই তারা উর্ধশ্বাসে ছুটল কান্নার শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। ওদেরও তো কাঁদতে হবে—বাপের জন্য আর বাপের সঙ্গী সাথীদের জন্য। সেইজন্যেই ওরা এভাবে দৌড়ে গেল। আজ কাঁদবার দিন, শ্রমিকদের শোকের দিন, সকলের শোকের দিন।

মিসেস ফ্লেমিং ডাকলেন, 'মিঃ রাওলট।'

—'Yes, madam.'

—'What is this killing for? It is a policy of bankruptcy. Cannibals are abroad.'

রাওলটের বুকের উপর যেন ভারী একটা বোঝা। সে বলল, 'I am sorry. Something very undesirable has happened.'

তারপর তিনি সমস্ত ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে গেলেন। বর্ণনা শেষ হলে পর মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'Mr. Higgins committed a mistake. He should not have allowed a free hand to Towler. Call him back...'

রাওলট কিছু বললেন না। এদিকে বরুয়ার স্ত্রী কান্নায় যেন ফেটে পড়লেন। রাওলট হঠাৎ বললেন, 'You seem to be in good terms with the natives here. Go and take Barua's wife home. She needs

something which I cannot give, but you can.. You know so much...'

মিসেস ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন রাওলটের গলাটা যেন ধরা ধরা, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

রাওলট বিদায় নিয়ে চলে গেল। মিসেস ফ্লেমিং আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে মোটরের ভিতর বসলেন।

এম্বুলেনস স্টার্ট দিল, আস্তে আস্তে চলে গেল মিসেস ফ্লেমিঙের গাড়ির পাশ দিয়ে। এতক্ষণ গাড়ির ভিতর থেকে মিসেস ফ্লেমিং শোকের দৃশ্য দেখছিলেন আর নিজের মনে আবৃত্তি করছিলেন :

Dissolve thick cloud, and rain
That I may say
The gods themselves do weep...

এবার তিনি শুনতে পেলেন বরুয়ার স্ত্রীর হৃদয় বিদারক কান্না। দুর্গা ছোট ছেলের মতো চেঁচিয়ে কাঁদছে।

গিয়াসুদ্দীন তাকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন, 'এত দিনে বাপকে চিনতে পারলি, দুর্গা। কী সাহস তোর বাপের। সোজা গিয়ে ড্রাইভারের হাতখানা চেপে ধরল। একটুও ভয় করল না। এত যে ওর সাহস ছিল, বুঝতেই পারিনি।'

পান্নু বলল, 'কদিন থেকেই বাবা যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলেন। বেশির ভাগ স্বামীজীর ওখানে পড়ে থাকতেন। আমায় বলতেন, ভগবানই সত্য, আর সকলি মিথ্যা।'

কথাটা শুনে গিয়াসুদ্দীনের ভালো লাগল। হঠাৎ পান্নু বলল, 'চ্যাটার্জি যে এভাবে মৃত্যু বরণ করে নিতে পারবেন, ভাবিনি। একদিন বলেছিলেন শক্তির পরিচয় দিয়ে যাবেন। দিয়েই গেছেন তিনি।'

গিয়াসুদ্দীন এবার আশ্চর্য হয়ে পান্নুর দিকে তাকালেন। এই প্রথম যেন লোকের মুখে চ্যাটার্জির প্রশংসা শোনা গেল। ওরকম চুপচাপ ও লাজুক মানুষটার বুকে যে এতখানি দুঃসাহস ছিল, কে আর জানত সে কথা? চণ্ডীকে মরতে দেখেও সে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এতটা সাহস হয়তো তাঁর নিজেরও নেই।

মিসেস ফ্লেমিংকে দেখে দুর্গার কান্না হঠাৎ থেমে গেল।

মিসেস ফ্লেমিং এসে শোকগ্রস্তদের সামনে দাঁড়ালেন—যেন পাশ্চাত্য দেশের দেবী প্রতিমার মতো। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এই সব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দুঃখশোকের অতীত কোনো লোকে তিনি বাস করেন। গায়ে একটা লালরঙের বুটিদার জামা, মুখখানা রূপের আলোয় উজ্জ্বল। দুর্গার মনে হল, যেন মূর্তিমতী দয়া এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে।

'দুর্গা, পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই—কেঁদো না।'

এই সামান্য কয়েকটি কথা শুনেই দুর্গার মন যেন শান্ত হয়ে গেল। সেই সময়টুকুর

মতো সে ভুলে গেল মেমসায়েবের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ জমা হয়েছিল তার মনের মধ্যে। নয়নমণিকে তিনি উচ্চাকাঙ্খী করে তুলেছেন, সে এখন সন্তান চায় না, লখনউ যাবার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে, সেখানে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা করবে। এই মুহূর্তে সেই সমস্ত অভিযোগ অতি তুচ্ছ মনে হল। কী দয়া মেমসায়েবের—বিলেতে ফিরে যাবার আগে নাকি ওকে শস্তায় মোটরখানা দিয়ে যাবেন, দামটা একটু একটু করে দিলেও চলবে। দুর্গার বাপ মারা গেছে শুনে, ওকে নিয়ে মোটর ছুটিয়ে চলে এসেছেন নিজে—ওকে মোটর চালাতে দেননি। এত তাঁর বিবেচনা। চামড়ার রঙ আর দেশ ভিন্ন হোক মেমসায়েব যেন মিনুবাইয়ের অবতার।

দুর্গা বলে উঠল, 'মেমসায়েব!'

'কি?'

'আমার ছুটি দরকার। পান্নুর সঙ্গে বাড়ি গিয়ে—সেখানেই থাকতে হবে। বাবার মুখাগ্নি করতে হবে, তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তিও করতে হবে।'

'বেশ, যেয়ো'খন। নয়নমণিকেও কি যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

মেমসায়েবের একটু চিন্তা জাগল, তারপর শুধোলেন, 'কয়েকটা দিনের জন্যে একজন কাউকে পাওয়া যাবে কি?'

দুর্গা ভালো করে ভেবে দেখল, তারপর গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা করে বলল, 'নাসিরুদ্দীন খানসামাকে ডাকলে পাওয়া যেতে পারে। গিয়াসুদ্দীন সায়েব যদি ওকে বলেন, নিশ্চয় তাঁর কথা রাখবে।'

গিয়াসুদ্দীন চিন্তিতভাবে বললেন, 'কেবল আমার মুখের কথার খাতিরে সে যাবে কিনা জানি না। জেবউন্নিসার শক্ত অসুখ, সে হাসপাতালে আছে।'

দুর্গা বলল, 'আপনি একবার বললেই হয়ে যাবে।' দুর্গার বিশ্বাস খুব দৃঢ়।

গিয়াসুদ্দীন রাজি হলেন কথা বলতে।

হঠাৎ বরুয়ার স্ত্রী আবার কেঁদে উঠলেন, 'মা গো, আমার কী হল মা! কেন মরতে বেঁচে আছি আমি?'

মেমসায়েব আবার ডাকলেন, 'নয়নমণি, এঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এসো গাড়িতে।' নয়নমণি লছমীকে বলল কথাটা। লছমী পান্নুকে বলল, বরুয়ার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে। পান্নু হাতখানা সরিয়ে নিলে পর, নয়নমণি গিয়ে কোমরটা জড়িয়ে ধরল। তারপর ওরা দুটিতে ধরাধরি করে বরুয়ার স্ত্রীকে বসিয়ে দিল মোটরের পিছনের সীটে।

মেমসায়েব বললেন, 'নয়নমণি, তুমিও চলো। বরুয়ার স্ত্রীকে তাঁর বাসায় রেখে আসি গিয়ে। তারপর হাসপাতাল গিয়ে নাসিরুদ্দীন খানসামাকে ধরতে হবে। তখন তোমার ছুটি।' এরপর গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি যদি ইতিমধ্যে নাসিরুদ্দীনকে বলে রাখতে পারেন, খুব খুশি হব।'

গিয়াসুদ্দীন বিষণ্ণভাবে জবাবে বলল, 'এখন আমায় একবার হাসপাতালে এমনিতেই যেতে হবে। পোস্টমর্টেম করার পর দেহগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে

হবে। তার পর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি বরুয়ার স্ত্রীকে যে ওঁর বাড়ি নিয়ে চললেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'I am sorry for what has happened. These were preventible deaths.'

গিয়াসুদ্দীন কৌতূহলভরে মেমসায়েবের দিকে তাকালেন। এ যেন নিয়তির এক অদ্ভুত পরিহাস। যারা গুলি করে তারাই আবার সহানুভূতি দেখাতে আসে। এক হাতে রক্ত পান করে, অন্যহাতে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দেয়।

মেমসায়েব মোটর চালিয়ে চলে গেলেন।

বরুয়ার ঘরে গিয়ে মেমসায়েব দেখলেন, একখানা ছোট্ট সংসার। বসবার ঘরে জওহরলালের মস্ত একটি ছবি। টেবিল, চেয়ার ঢাকা দেবার ব্যবস্থা নেই। মাথার উপরে বিজলী পাখা নেই। বিজলীবাতিও নেই এই বাড়িতে।

নয়নমণি ধরে ধরে বরুয়ার স্ত্রীকে নিয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিল। মেমসায়েবও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন। দেখলেন ছোট্ট একটা শোবার ঘরে ঘরজোড়া বিছানা, তার উপর শুয়ে আছে একটি দেবশিশু। তার সামনে বসে আছেন একজন অপরিচিতা মহিলা—প্রধানের স্ত্রী, নয়নমণির মা। তিনি শিশুটির দেখাশোনা করছেন।

বরুয়ার স্ত্রী বললেন, 'আমার সব গেল। এখন কাকে নিয়ে বেঁচে থাকব? তুমি তামাশা দেখতে এসেছো, মেমসায়েব? চাকরী খাবার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু মানুষ মারার অধিকার আছে কি? বলো তো শুনি?'

নয়নমণির মা আস্তে শিশুটিকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বললেন, 'সব যাবে কেন, মা। এই তো আছে তোমার বিভূতি...।'

মেমসায়েব বললেন, 'I am a woman, too! I know it is brutish—I mean, what they have done.'

নয়নমণি বরুয়ার স্ত্রীকে কথাটা বুঝিয়ে দিল।

বরুয়ার স্ত্রী আবার কাঁদতে লাগলেন।

মিসেস ফ্লেমিং আর যেন সইতে পারলেন না। না না না, এরা কখনো বুঝবে না। একটা অলংঘনীয় প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে সাদা চামড়া ও কালো চামড়াদের মাঝখানে। সিমেন্টের দেয়াল ভেদ করে যেমন জল চুঁইয়ে যেতে পারে না, ঠিক তেমনি সহানুভূতি এই অলংঘনীয় ব্যবধান ভেদ করে যথাস্থানে পৌঁছুতে পারে না। এই ভুল বোঝাবুঝির অন্ত হবে কবে?

কবে আসবে সেদিন?

ছত্রিশ

সেদিন অগণিত লোকের ভিড় হাসপাতালে, রাস্তায়, শ্মশানে।

শবদেহগুলি বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে, গিয়াসুদ্দীন সাহেব ভিড় ঠেলে গিয়েছিলেন জেবউন্নিসার ওয়ার্ডে। নাসিরুদ্দীন সেখানেই ছিল। জেবউন্নিসার শরীর দিনের পর দিন কেবলি খারাপ হচ্ছে। লিভারের অসুখ তো আছেই, ডাক্তার এখন সন্দেহ করছেন পেটের মধ্যে ক্যানসার। নাসিরুদ্দীন খুবই মনমরা হয়ে গেছে। হজ করতে যাওয়া হল না, যুদ্ধের আশঙ্কায় জাহাজ চলাচল বন্ধ। শ্রমিক য়ুনিয়নের অবস্থাও ক্রমে নড়বড়ে হয়ে আসছে। প্রায় দু' মাস হতে চলল। সায়েবরা মানুষও মারবে, আবার শ্রমিকদের কাজ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত বিরত হবে না—এ ভয় এখনো বুড়োর মনে। ওর শেষ আশার স্থল ছিল জেবউন্নিসা। এখন সে-ও মৃত্যুশয্যায়—ডাঃ পাঠক বলেছেন বাঁচবার আশা কম।

গিয়াসুদ্দীন এলেন যখন দাদাজানে-নাতনীতে কথাবার্তা হচ্ছিল—পান্নুর কথা, লছমীর কথা, বরুয়ার স্ত্রীর কথা। সকলের খবর নিয়েছে জেবউন্নিসা—কেবল ইসমাইলের কথা সে কাউকে জিগ্যেস করেনি। ওর সমস্ত অন্তর ওই একজনের বেলা অকারণ অভিমানে ভরে থাকে। এতদিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে, তবু একটি দিনের জন্যও ইসমাইল খোঁজ খবর নিতে আসেনি। সত্যি জেবউন্নিসা ওকে ভালোবাসত, এখনো বাসে। ওর যে ভালো লাগে না, সে অন্য কথা। কিন্তু লোকটা মরে গেছে না বেঁচে আছে, একটিবারও খবর নিতে নেই? জেবউন্নিসা জানে এ অভিমান অর্থহীন। সে যাই হোক, ইসমাইলকে অন্তর থেকে ক্ষমা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গিয়াসুদ্দীন জেবউন্নিসার কাছে গিয়ে তার শুকনো মুখখানার দিকে তাকিয়ে স্নেহে বেদনায় আকুল হয়ে বললেন, 'তুই কিরকম ছিলি মা, আর এখন কি তুই হলি!'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'মানুষের রূপ যৌবন তো চিরকাল থাকে না। চাঁদ যেমন কলায় কলায় ক্ষয় পায়, তেমনি রূপ যৌবনও ক্ষয় পায়। আবার প্রতিপদের পর শুক্লপক্ষ আসে যখন, তখন কলায় কলায় বাড়ে।'

কথাটা বলে নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ও এখন কথায় কথায় স্তোকবাক্য বলে রোগিনীকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। জেবউন্নিসা কলায় কলায় নিষ্প্রভ যে হচ্ছে এবং কখনো যে ওর শুক্লপক্ষ আসবে না, সে কথা ডাক্তার জানে, জেবউন্নিসা নিজে জানে আর বুড়ো দাদাজানও জানে। কিন্তু তবু মানুষ নিজেকে ভুলিয়ে রাখে, মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না।

জেবউন্নিসা বলল, 'কেন মিথ্যে ভাওতা দিচ্ছ, দাদাজান? আমি বেঁচে থেকে কি করব? বরুয়ার মতো মানুষ মরে গেল, আমার থেকে কি হবে?'

হঠাৎ চুপ করে কিছুক্ষণ সে ভাবল, তারপর জিগ্যেস করল, 'বরুয়ার স্ত্রীর কিভাবে চলবে গিয়াসুদ্দীন সাহেব?'

কথাটা গিয়াসুদ্দীন নিজেও এ পর্যন্ত ভাবেন নি। এ সময় কেউ কি কারো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে? এখন যে সামূহিক বিপর্যয়। এরপর কোম্পানী কি করবে কে জানে? তিনি জবাবে বললেন, 'জানি না। চাঁদা তুলতে হবে। আর অদৃষ্ট যদি ভালো হয় ক্ষতিপূরণ পেতে পারে...।'

জেবউন্নিসা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'একটা কথা বলে রাখি, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। বরুয়াবাবুর মৃত্যুর পর থেকে কথাটা আমি ভাবছি। আমি যে বাঁচবো না, তা সত্যি। আমার সামান্য কিছু টাকা আছে পোস্ট অফিসে, প্রায় দু'শো মতো হবে। সে টাকাটা আমি বরুয়াবাবুর স্ত্রীকে দিয়ে যেতে চাই।'

গিয়াসুদ্দীন ওর কথা শুনে মুগ্ধ হলেন, বললেন, 'এখন থেকে এত ভাবনা করে মরছো কেন? আগে ভালো হয়ে ওঠো তো...।'

জেবউন্নিসা বলল, 'আমি বলে গেলাম আমার কথা। সময়টা এখন খারাপ পড়েছে। পরে সময় না-ও হতে পারে।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'কি যে বলছো, নাতনী। এমনি করে আপদ ডেকে আনিস না। তোর দাদাজানের মুখ তাকিয়েও তোকে বেঁচে থাকতে হবে।'

জেবউন্নিসা বলল, 'আল্লার হুকুম এলে তুমিও কি অমান্য করতে পারবে? কেউ পারে না। তোমায় একাই থাকতে হবে আমি চলে গেলে।'

নাসিরুদ্দীনের বুকখানা ভেঙে যাবার মতো হল। মেহের চলে যাবার কত বছর পরে এই নাতনী পেয়েছিল বুকের শূন্যতা ভরাবার জন্য...।'

হঠাৎ গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর ভাবে বললেন, 'নাসিরুদ্দীন, একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আবার তুমি খানসামা হবে...।'

'খানসামা? আবার গলায় ফাঁস পরতে বলছেন, গিয়াসুদ্দীন সাহেব? কি ঘটেছিল, কেন চাকরী ছেড়েছি—সবই তো আপনি জানেন। তার উপর এই ধর্মঘটের সময়...।'

'না না—এটা গলায় দড়ি পরার মতো কাজ মোটেই নয়। মিসেস ফ্লেমিং তো এ দেশে এখনো কিছুদিন থাকবেন। তার বাংলোতে রান্নাবান্না...।'

জেবউন্নিসা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কাজ করো না গিয়ে দাদাজান। মিসেস ফ্লেমিং তো কোম্পানীর সায়েব নন। হ্যাঁ, একসময়ে বড় সায়েবের মেম ছিলেন বটে, এখন তিনি তাও নন।'

নাসিরুদ্দীন হাসতে লাগলেন, উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ গিয়াসুদ্দীনও চুপ করে রইলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'অকারণে এতটা বিদ্বেষ ভাব রাখা উচিত নয়, নাসিরুদ্দীন। তোমায় তো কোম্পানীর চাকরী করতে হবে না। কিছুদিন বাদে মেমসায়েব চলে গেলে পর, তুমি আবার ফিরে আসতে পারবে তোমার নাতনীর কাছে...।'

নাসিরুদ্দীন বললেন, 'না, না, আমি কখনো যাব না। আপনাকে আমি বুঝি। কিন্তু ইসমাইল শুনতে পেলে বলবে নাসিরুদ্দীনকে য়ুনিয়নে ঢুকতে দেওয়া যাবে না,

নাসিরুদ্দীন দালাল। এ অপবাদ বুড়ো বয়সে আমি মেনে নিতে পারব না। আর মিসেস ফ্লেমিং হাজার হলেও তো সাদা-চামড়া। তাছাড়া কতখানি তাঁর দয়ার দৌড়—কে বলতে পারে? বরফ কখনো কখনো গলে সত্যি কথা, কিন্তু ঠাণ্ডা পেলে আবার বরফ হয়।'

গিয়াসুদ্দীনের নিজেরও আস্থা হারিয়েছিল ইংরেজ চরিত্রের উপর—কিন্তু নাসিরুদ্দীনের মতো অত দূর অবধি তিনি তখনো যেতে পারেন নি। মিসেস ফ্লেমিং মানুষ ভালো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজ চরিত্র নষ্ট হয় গায়ের রঙে নয়—কাঞ্চনের মোহে। কেবল ইংরেজদের কেন, মুনাফার মোহ ভারতীয়দের চরিত্রও নষ্ট করতে পারে। এই বাঁচোয়া যে অধিকাংশ ভারতীয়ই দরিদ্র। ইংরেজরা প্রভুর জাত, মালিকের জাত। ভারতীয়েরা চাকরের জাত—মজুরের জাত। সেই কথা ভেবে গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এতদিন সায়েবদের সঙ্গে থেকেও, তাদের ভালো দিকটা বুঝতে না পারা খুবই দুর্ভাগ্য। সত্যি বলছি নাসিরুদ্দীন, তোমার এই আচরণে আমি আশ্চর্য।'

নাসিরুদ্দীন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'ভালো হোক মন্দ হোক, সায়েবদের ব্যবহার হল প্রভুর ব্যবহার। সেই প্রভুত্বকেই যখন মানব না বলে ঠিক করেছি, তাব ভালোমন্দ নির্ণয় করে কি লাভ?'

গিয়াসুদ্দীন এবার জব্দ হলেন। এ দেখি শ্রেণী সংগ্রামের কথা! চ্যাটার্জি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় নাসিরুদ্দীন বুকে জড়িয়ে ধরত। মালিকদের ভালো মন্দ বলে কিছু নেই—তারা শ্রেণীবিশেষ।

গিয়াসুদ্দীন উঠতে চাইছিল, এমন সময় ইসমাইল ঢুকল কেবিনে। মুখখানা বিবর্ণ, জেবউন্নিসাকে দেখে ও যেন চমকে উঠল। নিজের আসবার কারণ ভুলে গিয়ে শুধোল, কি হয়েছে তোমার জেবউন্নিসা? এত রোগা হয়ে গেছো কেন?'

জেবউন্নিসা হেসে বলল, 'এতদিন পরে এইটুকু কথাও যে শুধোলে, তাও ভালো। কিন্তু নিশ্চয় অন্য কোনো কাজে এসেছ এখানে।'

ইসমাইল থতমত খেল। সে যে জেবউন্নিসার কথা ভেবে আসেনি, তা একেবারে ঠিক। কিন্তু ওর কথা ভাবার কোনো যে প্রয়োজন থাকতে পারে তাও ওর মনে উদয় হয়নি। জেবউন্নিসা যে সেজন্য ওর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে, তা সে ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেনি। অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, একটা বিশেষ দরকারে আসা। কিন্তু...।'

জেবউন্নিসা অভিমান করে বলল, 'তা হলে গিয়াসুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কথা বলো। আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে মিথ্যে সময় নষ্ট করে কি লাভ?'

এবার কেবল ইসমাইল নয়, গিয়াসুদ্দীন সাহেবও অবাক হলেন। জেবউন্নিসার এ অভিমানের কোনো কারণ নেই।

নাসিরুদ্দীন জেবউন্নিসাকে বললেন, 'নিজের দুঃখ দুর্বলতাগুলো যত লোকচক্ষুর

সামনে মেলে ধরবি, ততই কেবল আঘাত পাবি। এখনো ওর প্রতি তোর এত দরদ কেন?'

জেবউন্নিসা কিছু বলল না, কিন্তু ওর দু চোখে জল এল, ও পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুল।

ইসমাইল আজ বহুদিন পরে বুঝতে পারল, জেবউন্নিসা ওকে ক্ষমাও করেনি, ভুলতেও পারেনি। কিন্তু তার আর সে কী করতে পারে? ওর মনটা অস্থির হল, বুকে কেমন একটা যেন আঘাত লাগল—এমন কি ভুলেও গেল কি জন্যে সে এসেছে। ইসমাইল ভাবতে লাগল জেবউন্নিসার কথা। বেচারা গুণাহ্-এর মধ্যে জন্মেছে, গুণাহ থেকে পালিয়ে এসেছে নিস্তার লাভের আশায়—এই কথাটাই ওর সম্বন্ধে এতদিন ভেবে এসেছে ইসমাইল। বেশ কিছুকাল ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি ভালো করে। তবু জেবউন্নিসার মনে তার প্রতি এত যে অভিমান থাকতে পারে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ইসমাইল ওর দুঃখের কারণ হতে চায় না, কখনো চায় নি হতে। তবে হয়তো তার খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক বহুকালের পরিচয় তো। অসুখে পরেছে কতদিন তাই বা কে জানে? সে হঠাৎ বলল, 'মন খারাপ কোরো না জেবউন্নিসা। আমার ভুল হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি। খবর নেবার জন্যে এখন থেকে আসতে থাকব। এবার যাই তা হলে...।'

জেবউন্নিসা মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারল না। ছি ছি, যেন ইসমাইলের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিতে হল এতটুকু সহানুভূতি! ভারি লজ্জা পেল।

ইসমাইল এবার কাজের কথাটা বলল। গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কাজ করে এসেছি গিয়াসুদ্দীন সাহেব, বহিরাগত ফালতু মজুরদের শিবিরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছি।'

শিবিরটা ছিল সিং-জীর বাড়ির সামনেই একটা কম্পাউণ্ডে। কয়েকটা খড়ের ছাউনী তুলে মজুরদের সেখানে রেখেছিল। গুলিচালনার পর বেশ কিছু লোক ছাউনী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে যারা যায়নি, তখনো তারা ছিল ওই শিবিরে। গুলিচালনার কিছুক্ষণ পরে ইসমাইল কয়েকজন সাহসী স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে, ছাউনীগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। য়ুনিয়নের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করেনি। জিগ্যেস করলে পাছে তাঁরা বাধা দেন, এই ভয় ছিল ওর মনে। উপরন্তু মনে হল, সেই রাত্রের মধ্যেই বহিরাগত লোকদের না তাড়ালে বিপদ ঘটতে পারে। গুলিচালনার পর পিকেটিং কিংবা ঘেরাও করা, আগের চেয়ে কঠিন হবে। রাওলট সায়েব পুলিশ ও মিলিটারিতে সারা শহর ঘিরে রেখেছে।

গিয়াসুদ্দীন কথাটা শুনে গেলেন, কোনো কথা বললেন না।

নাসিরুদ্দীন বরং বললেন, 'এ-রকম কাজ একটা করে ফেললে, এখন যদি য়ুনিয়নের লোকেদের পুলিশ পাকড়াও করে—কি করবে?'

ইসমাইল বলল, 'এখন আর গ্রেপ্তারের ভয় করলে চলবে কেন? চ্যাটার্জি মরে

গেছেন, চণ্ডী মরে গেছেন, বরুয়া মরে গেছেন, শ্বশুর মরে গেছেন। এত শত কথা ভেবেচিন্তে কি কোনো কাজ হয় ? বাইরের লোকগুলো পালিয়ে গেছে—ভয়েই পালিয়েছে। ভলুন্টিয়ারদের বলে দিয়েছি কড়া পাহারা রাখতে। আরো একটা কথা বলে রাখছি গিয়াসুদ্দীন সাহেব, সিংকে কখনো যদি বেকায়দায় পাই—ওর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব।'

এবারও গিয়াসুদ্দীন একটি কথাও বললেন না। তিনি কেবল একটি সিগারেট বের করে ধরালেন, আর ইসমাইলকে আপাদমস্তক একবার দেখলেন। লোকটার মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে—চোখে হিংসার আগুন।

ইসমাইল বলে চলল, 'অহিংসা-টহিংসায় কিছু হবে না। মালা সিংকে বলে এসেছি হাতে কৃপাণ নিয়ে ওদের মাথাগুলো কেটে ফেলতে—মাথার বদলা মাথা।'

গিয়াসুদ্দীন সিগারেট ফুঁকতে লাগলেন। এবারও তিনি কিছু বললেন না। নাসিরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। বলতে চেয়েছিলেন, এসব ইসমাইলের নিছক ছেলেমানুষী।

কিন্তু জেবউন্নিসার পক্ষে অসহ্য হল। মুখখানা ঘুরিয়ে ধীর গলায় বলল, 'এসব মারামারি কাটাকাটি করে কি লাভ ইসমাইল ? কৃপাণ দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে যুঝবে —এতই তোমার সাহস ?'

ইসমাইল হেসে বলল, 'দেখো জেবউন্নিসা, শুধু হাতের চেয়ে হাতে কৃপাণ থাকা ভালো। সেদিন হাতে কৃপাণ যদি থাকত, তাহলে চার জনের জায়গায় হয়তো একজন মাত্র মরত।'

জেবউন্নিসা এবার বলল, 'সায়েবের কি গুলির এতই টানাটানি যে তোমার কৃপাণ চালানো পর্যন্ত তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ?'

ইসমাইল এবার একটু অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। সে জবাব দিতে গিয়ে বলল, 'এখন মরার ভয় করলে চলবে না, মরতে হলে মরব।'

জেবউন্নিসা এবার একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ইসমাইল যেন একেবারে পাগল হয়ে গেছে। গিয়াসুদ্দীনের দিকে চাইল, নিতান্ত অসহায়ের মতো।

গিয়াসুদ্দীন সিগারেট খাচ্ছেন আর ভাবছেন কি উত্তর দেবেন ইসমাইলকে। কি করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেবল ইসমাইল নয়, হয়তো অনেক ধর্মঘটীদের মনের অবস্থা এই রকম এখন। প্রধান আর মালা সিং-এর মাথাও ঠিক আছে কিনা কে জানে ? সকলেরই মাথা গরম এখন। কার যে বেশী কার কম—তার ঠিক নেই।

ইসমাইল অতিষ্ঠ হয়ে বলল, 'কোনো জবাব যদি না দেন, তা হলে বুঝব আপনার সম্মতি আছে।'

'খবরদার', গিয়াসুদ্দীন সাহেব গর্জে উঠলেন, 'তোমার কাজের বিষয় আলোচনা করার জন্য য়ুনিয়নের কার্যনির্বাহক সভা ডাকতে হবে।'

ইসমাইল শ্লেষের সুরে বলল, 'বাঃ! দেখতে তো পাচ্ছেন য়ুনিয়ন নেতাদের বল বুদ্ধির দৌড়।'

গিয়াসুদ্দীন হেসে বললেন, 'নেতা যদি অপছন্দ হয় তো য়ুনিয়ন ভেঙে দিয়ো। কিন্তু যতদিন য়ুনিয়ন মেনে চলবে, ততদিন নেতাদেরও মানতে হবে। য়ুনিয়ন সকলের চেয়ে বড়ো...।'

ইসমাইল হাসতে লাগল। গিয়াসুদ্দীন আধখাওয়া সিগারেটটা জানালা দিয়ে দূরে ছুড়ে ফেললেন।

সেই সময় কেবিনে ঢুকল নয়নমণি ও মিসেস ফ্লেমিং।

ইসমাইল ধীরে মুখটা ঘুরিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। সায়েব-মেমদের ও আর সহ্য করতে পারে না।

মিসেস ফ্লেমিং গিয়াসুদ্দীনকে জিগ্যেস করলেন, 'কিছু কি হল ?'

'না।'

'কেন ?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এ সময়ে কোনো খানসামাই মেমসায়েবের অধীনে কাজ করতে চায় না।'

মিসেস ফ্লেমিং হাসতে লাগলেন, বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

এই বলে খানসামার প্রসঙ্গ বন্ধ করে জেবউন্নিসার দিকে তাকালেন। তারপর মনটা ওঁর বিষাদে ভরে উঠল। দু'একটা প্রশ্ন করে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। জেবউন্নিসার মুখখানা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন কোনো শাদা সায়েবের ঔরসে নিশ্চয় ওর জন্ম। ভারত ইংলণ্ডের মধ্যে যে মিলনের যজ্ঞবেদী দিন দিন সংকীর্ণ হতে চলেছে, জেবউন্নিসার ক্ষয়িষ্ণু দেহ যেন তারই প্রতীক। এইখানেই মিসেস ফ্লেমিঙের দুঃখ। ইতিহাস পড়ে তিনি ভারতে ইংরেজ-চরিত্রের এতখানি অধঃপতন দেখে, মনে মনে গ্লানি অনুভব করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ দুটি পরস্পর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। একদিকে ভারতে তারা রেল, জাহাজ, পোস্ট, টেলিগ্রাম, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়েছে, আর অন্য-দিকে তারা এদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে দারিদ্র্য, শোষণ, ভেদাভেদ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। আজ এই শহরে ইংরেজের অপকীর্তি ও কার্যকলাপ মানুষ ও মানুষের মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলেছে। তা আর পেরিয়ে যাবার উপায় নেই। জেবউন্নিসাকে মিসেস ফ্লেমিং চেনেন না। কিন্তু তার মুখে চোখে—সর্বদেহে—ইংরেজ অপকীর্তির বিরুদ্ধে যে একটা তীব্র ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তার কারণটা তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন।

কেন করবে না ঘৃণা ? কোনো ইংরেজ ওর জন্ম দিয়ে, পিতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার করে, এদেশ থেকে পালিয়ে গেছে। সে তো জানা কথা।

মিসেস ফ্লেমিং চলে যাবার পর ইসমাইল ফিরে এল। মুখে ওর তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের হাসি। গিয়াসুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইংরেজ মানুষ মেরে শেষ করছে, তবু দেখি আপনার মেম-প্রীতি যায়নি। এদের কাউকে লাই দেওয়া উচিত নয়। সাপ—সাপই—তার ছোটবড়ো নেই।'

গিয়াসুদ্দীন বলল, 'এই মহিলাটি সাপ নন। তোমার এত ঘৃণা করার কোনো দরকার ছিল না...।'

ইসমাইল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ওরা আমাদের নিয়ে কি না করেছে। ছিনিমিনি খেলেছে। টেরোরিস্টরা ঠিক করেছিল। এদের...।'

গিয়াসুদ্দীন উঠে পড়লেন, তারপর ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো ইসমাইল, এখন তোমার মাথাটা গরম হয়ে আছে। একটু যখন ঠাণ্ডা হবে য়ুনিয়ন অপিসে চলে এসো। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ না করতে পারলে সর্বনাশ হবে। তাছাড়া, এখন শ্মশানে গিয়ে অন্ত্যেষ্টির কাজ সারতে হবে। হয়তো একটা শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে আমি এখন যাই।'

এই বলে গিয়াসুদ্দীন ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কেবিনের বাইরে পা দেবার আগে জেবউন্নিসাকে এক পলক দেখে গেলেন।

নাসিরুদ্দীন একটু দুঃখিত। গিয়াসুদ্দীন সায়েব নিশ্চয় আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু পেয়ে যদি থাকেন, উপায় নেই। ইংরেজরা যা করেছে, তাদের একটা বিচার হওয়া উচিত। সে বলল, 'অসহ্য লাগছে। কি কাণ্ড করল টাওলার সায়েব। গিয়াসুদ্দীন সাহেব কি লোক ছিলেন, কি হয়েছেন। এত দরদ থাকাটা ঠিক নয়। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া উচিত।'

ইসমাইল এবার আরো উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ওদের ছাউনি পুড়িয়ে দেব না কেন? শালাদের এনেছে আমাদের জায়গায় বসাতে। যতক্ষণ বেঁচে আছি, বাধা দেবোই দেবো। আবার ঠিক এমনি করব। যদি...'

ইসমাইল স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মনে নানা রকম চিন্তা ঘুরছে—রিফাইনারী জ্বালিয়ে দিতে হবে, বাংলো পুড়িয়ে ছাই করতে হবে, সায়েবদের...

জেবউন্নিসা ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে গেল। এ তো আগেকার সে ইসমাইল নয়। এর মুখে কী রকম একটা হিংস্র ভাব। সব যেন লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। খুব শান্ত সুরে জেবউন্নিসা বলল, 'ইসমাইল, এত অধীর হয়ে পড়ছো কেন? একবার আমার কথাটা একটু শোনো দেখি।'

এবার ইসমাইল জেবউন্নিসার শুকনো মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

জেবউন্নিসা হাসছে।

এ হাসির অর্থ বুঝতে পারছে না ইসমাইল। রাগ করার সময়ে কেউ কি হাসে এ ভাবে?

জেবউন্নিসা বলল, 'তোমার রাগত চেহারাটা দেখেই হাসছি আমি। তুমি এতদিনে দেখছো সায়েবের অত্যাচার। আমি কত যে সহ্য করেছি। আর কেবল কি আমি? আমার মাকেও সহ্য করতে হয়েছে। তবু তোমার মতো আমি অধীর হইনি। এভাবে রাগ করলে কাজের কাজ কিছু হয় না। মনে যেটা এল, হুট করে তাই করে ফেলাটা—কোনো কাজের কথা নয়।'

ইসমাইল জেবউন্নিসার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল। ঠিকই তো। সায়েবের অত্যাচারের ফলেই তো জেবউন্নিসার জন্ম। জন্মাবার পরেও সায়েবের হাতে ওকে যে কত লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে—তার শেষ নেই। তবু সে কত চেষ্টা করছে মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে বাঁচবার জন্য। সে তো ধৈর্য হারায়নি। সেই ধৈর্য ধরার কথাটাই ও যেন বলতে চাইছে—'ধৈর্য হারিয়ো না, অপঘাত মৃত্যুকে ডেকে এনো না'।

কিন্তু কেন ?

কেন ওকে সাবধান করছে জেবউন্নিসা, ইসমাইল তা জানে।

ইসমাইলের মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। জেবউন্নিসার চাহনিতে একটা যেন শক্তি আছে, সেই শক্তি ওকে যেন টেনে রাখতে চেষ্টা করছে। এ চেষ্টার মধ্যে বিশেষ কোনো স্বার্থ নেই—আছে কেবল ভালোবাসা। ওর চোখে তাই একটা করুণ মিনতি ফুটে উঠছে—যেন বলছে, 'এ সব করতে যেয়ো না তুমি, করো তো আমার খারাপ লাগবে।'

ইসমাইল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। কিছুই যেন ওর মাথায় ঢুকছে না। জেবউন্নিসা দুঃখ পায়, তো ওর তাতে কি ? কিন্তু কিছু যে ওর আসে যায় না, তাও তো ও বলতে পারে না। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। সে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসেছে। নিশ্চয় পুলিশ জানতে পেরেছে। ওকে যখন তখন গ্রেপ্তারও করতে পারে পুলিশ। কেবল মানুষ-খুনী সায়েবদের কেউ যে গ্রেপ্তার হবে—তার কোনো আশা নেই। রাওলট এখনো কোনো ব্যবস্থা করেনি, করবে বলে মনেও হয় না। কিন্তু ইসমাইলের বেলা নিয়মের ব্যতিক্রম কেন নিয়ম হবে ? ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য অছিলা খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

জেবউন্নিসা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ইসমাইলের দিকে, আর ইসমাইল গভীর চিন্তায় মগ্ন—এই দৃশ্য দেখে বুড়ো বলল, 'এত চিন্তা ভাবনা করা ভালো নয়, ইসমাইল। নাতনীকে তুমি কোনো দিনই তো চিনতে পারলে না। ও সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবে। আমি এখন বুঝতে পারছি জেবউন্নিসা কি বলতে চায়। তুমি ধৈর্য ধরতে শেখো, অধীর হয়ে কোনো কাজ করতে যেয়ো না।'

ইসমাইল চুপ করে বসে রইল।

সাঁইত্রিশ

মিসেস ফ্লেমিং শূন্য বাংলোয় ফিরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বিষণ্ণ মনে উপর তলায় উঠলেন। প্রত্যেকটি পদক্ষেপই যেন যন্ত্রণা বিশেষ। নয়নমণি বলেছিল, 'না খেয়ে শুতে যাবেন না, মেমসায়েব।' কিন্তু মেমসায়েব আঘাতে আঘাতে যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। জেবউন্নিসার মুখে স্পষ্ট ঘৃণার চিহ্ন ফুটে

উঠেছিল। নাসিরুদ্দীনের প্রত্যাখ্যানের পিছনেও সেই একই ঘৃণা। তারপর দোকানের সামনে দিয়ে মোটরে আসতে ভলন্টিয়ারদের কঠোর বাক্যবাণ সইতে হল। যেসব ইংরেজ এতদিন white man's burden বহন করে এসেছে, তারা কি এই বর্ণবিদ্বেষের কঠোর আঘাত সহ্য করেনি ?

উপরে উঠে মেমসায়েব খুব কম সময়ের মধ্যে হালক' ধরনের কিছু খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর শোবার ঘরে শোবার উদ্যোগ করতেই ফোন বাজল।

'কে ? মিঃ হিগিনস ? কখন এলেন ?'

ওদিক থেকে কথা এল, 'আমরা আপনার কথা ভেবে ভারি চিন্তিত হয়ে আছি।'

'ধন্যবাদ। আমার জন্যে চিন্তা করে লাভ কি ? যারা বৃটেনের নামে কলঙ্ক লেপন করছে, তাদের কথা চিন্তা করুন।'

'করছি। আপনার কিছু কি দরকার আছে ?'

'না।'

হিগিনস আরো কীসব কথা বলে গেলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো খবর এই যে নবাগত মজুরদের ছাউনীগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আর কিছু লোককে সেজন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

মিসেস ফ্লেমিং জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু গুলিচালনার জন্যে কেউ কি গ্রেপ্তার হয়েছে ?' তার গলার স্বর কঠোর।

হিগিনস উত্তর দিলেন, 'কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মেজিস্ট্রেটের এনকোয়ারি হবে কাল থেকে।'

মিসেস ফ্লেমিং জিগ্যেস করলেন, 'তা থেকে কোনো মীমাংসা হবে কি ?'

'না।'

মিসেস ফ্লেমিং ফোন রেখে দিলেন।

তারপর শোবার ঘরে গেলেন, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। সারা ঘরে একটা ভয়াবহ নির্জনতা। এদিকে ওদিকে চাপ চাপ রক্ত, শবদেহ, অকাল বৈধব্য আর বর্ণবিদ্বেষের দৃশ্যগুলি—তাঁর চোখের সামনে আসা যাওয়া করছে। বীভৎস রসের সঙ্গে করুণ রসের একটা সংমিশ্রন চোখের উপর ভাসছে।

ফিরে আসতে তাঁর বেশ দেরি হয়েছে। দোকানের সামনে শ্রমিকদের একটি বিরাট জনতা তিনি দেখে এসেছেন। তাদের এখন মহাবিপদ—এই সংকটে নিজেদের মনে সাহস সঞ্চার করার জন্য তারা ঘন ঘন জিগির তুলছে। মৃতদেহগুলি শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য কেউ কেউ চ্যাং তৈরি করতে লেগেছে।

দোকানীরা অসন্তুষ্ট। অনেক বাকি পড়ে গেছে। শ্রমিকেরা শোধ দিতে পারছে না। য়ুনিয়নের তহবিলও শূন্যপ্রায়।

ওদিকে সিং-জীর দল নূতন লোক আমদানী করে, তাদের কাজে ঢোকাবার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলেছে। লোকেরা সেইজন্য সিং-জী প্রভৃতির বিরুদ্ধে খেপে আছে।

জনতা তখনো বোধহয় খবর পায়নি যে কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চয় খবর পেয়েছে, এখন কি করছে তারা ?

বেশির ভাগ শ্রমিক কোনোদিন অনশন কোনোদিন বা অর্ধাশনে কষ্ট পাচ্ছে, হাতে পয়সা নেই, বাড়িতে খাবারের টানাটানি, চাকরীর নিরাপত্তা নেই, উপরন্তু নির্যাতন চলছে পুরোদমে।

মিসেস ফ্লেমিঙের কোনো কিছুতে আর মন নেই। তিনি রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিলেন। বাইরে খুব বেশি গরম ছিল না, ভিতরে পাখাও চলছিল না। গুমোট আবহাওয়া—বৃষ্টি হতে পারে।

হঠাৎ বহু কণ্ঠের মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। মেমসায়েব কান পেতে শুনতে লাগলেন আওয়াজ। একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—বিরাট শোভাযাত্রা, পদশব্দ শোনা যাচ্ছে বহু দূর থেকে। বোধহয় শবদেহ নিয়ে শ্রমিকেরা শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে কিংবা গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে, উত্তেজিত জনতা প্রতিবাদ জানাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।

মিসেস ফ্লেমিঙের মনে আশঙ্কা হল—আবার কিছু ঘটবে নাকি ?

সেই সময়ে আবার ফোন বেজে উঠল।

মিসেস ফ্লেমিং জিগ্যেস করলেন, 'কে ? মিঃ জিলাপসী ?

ওদিক থেকে কথা শোনা গেল, 'আপনার কোনো সাহায্য দরকার হবে কি ? খাদ্যদ্রব্য, লোকজন...?'

'না, কিছু চাই না। আপনাদের সহায়তা ছাড়াই ভালো আছি।'

'একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। বিপদ হলেও হতে পারে। শ্রমিক ছাউনীতে আগুন লাগিয়েছে। বাংলোতে আগুন দিতে পারে...।'

'আপনি আত্মরক্ষা করুন। আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না।'

'আমরা যতটা পারি সংযত হয়েই আছি।'

'বাঃ কি চমৎকার সংযম ! চারটা মানুষ মরল ! ইংরেজের সুনাম ভেসে গেল...।'

'কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলছে জানেন ? মৃত্যুর কারণ ঠাহর করা সম্ভব হল না।'

'কিন্তু শ্রমিকেরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছে কে মেরেছে। ভগবানও সাক্ষী।'

মিসেস ফ্লেমিং ফোনটা রেখে দিলেন।

চোখে মুখে তাঁর একটা ঘৃণা ফুটে উঠল—জিলাপসীর প্রতি।

তারপর আবার ফিরে গেলেন শোবার ঘরে। শোভাযাত্রার উপর কোনো আক্রমণ হবে না তো ? শোভাযাত্রীরা আক্রমণ করে পুলিশকে জ্বালাতন করতে যাবে না তো ? ক্রমে ক্রমে শোভাযাত্রা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে চলেছে। গগনভেদী চীৎকারে কানে যেন তালা লাগছে। মেমসায়েব ছটফট করতে লাগলেন।

হঠাৎ আকাশে একটা লাল থালার মতো সূর্য উঠতে দেখা গেল। সকাল হল।

শোভাযাত্রার লেজুড়টুকু মাত্র দেখা যাচ্ছে এখন। প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ যেন চলেছে—পিছনে দলে দলে পুলিশ। একটা মোটরে সম্ভবত স্বয়ং রাওলট।

অনেকক্ষণ ধরে মেমসায়েব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে শোভাযাত্রার আর কোনো চিহ্ন নেই রাস্তায়। চারিদিক নিঃঝুম। আর শহরে থাকতে ওর মন চাইছে না। প্রবন্ধ লিখতে কিম্বা গিরিজনদের গ্রামে যেতে উৎসাহ যেন কমে গেছে। দেশে ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়েছেন। এইসব গণ্ডগোল থেকে দূরে সরে গেলে, স্বদেশীয় ইংরেজদের অধঃপতনের দরুণ তাঁর ভারাক্রান্ত মনটা যদি একটু হালকা হয়! এই পরিস্থিতিতে মিঃ ফ্লেমিংও নিশ্চয় এক মত হতেন স্ত্রীর সঙ্গে—নিশ্চয় তিনি এই বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্যের ভেদাভেদ থেকে দূরে সরে যেতে চাইতেন।

মেমসায়েব বাইরে বেরোতে, বুড়ো মালী তাঁর হাতে কতগুলো চিঠিপত্র দিল। একখানা একখানা করে চিঠিগুলো তিনি খুলে পড়তে লাগলেন—বন্ধুবান্ধবদের চিঠি। শেষ চিঠিটা এসেছে লখনউ থেকে—নয়নমণির এডমিশন, হস্টেলে থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সংগীত বিদ্যালয় থেকে মেমসায়েবকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যে নয়নমণির হয়ে তিনি এতখানি করেছেন বলে, বলেছে যে নিম্নবিত্তদের প্রতি এরকম দয়া বা করুণা হল ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁরা হবু ছাত্রীকে শুভ ইচ্ছা জানিয়েছেন।

ইংরেজ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠুরতা। বোধ করি সেকথা মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপল জানেন না।

চিঠিগুলো রেখে দিয়ে মেমসায়েব একতলায় নেমে গেলেন মোটর গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য। মোটর আজ তাঁকেই চালাতে হবে আর একা একা বেরোতে হবে। নয়নমণি আসতে পারবে না। ভাঁড়ারে খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই। সব শেষ, এখানে থাকতে ওঁর মন টিকছে না, আজ উনি ডিব্রুগড গিয়ে হাটবাজার সেরে একেবারে সন্ধ্যায় বাংলোতে ফিরবেন।

মেমসায়েব মোটর ঠিকঠাক করে ওপরে উঠতে যাবেন এমন সময় দেখলেন গেট খুলে ধীর পদে নয়নমণি ঢুকছে, হাতে একটা ঝুলি।

মেমসায়েব শুধোলেন, 'কি ব্যাপার নয়নমণি?'

'মেমসায়েবের জন্য অল্প কিছু নিয়ে এসেছি।'

'কি এনেছো?'

'মুরগীর ডিম।'

মেমসায়েব হাসতে লাগলেন, 'তোমাদের খাবার কিছু কি আছে যে আমার জন্যে এনেছো?'

প্রশ্ন শুনে নয়নমণি অবাক, ভেবেছিল এই দুর্যোগের সময় কিছু যদি যোগাড় করে আনতে পারে মেমসায়েব খুশি হবেন। থতমত খেয়ে নয়নমণি বলল, 'মুরগী তো ধর্মঘট করেনি মেমসায়েব।'

মেমসায়েব ওর কথা শুনে হাসতে লাগলেন, বললেন 'এনেছো যখন রেখে যাও, কিন্তু দাম নিয়ে যেয়ো।'

নয়নমণি বলল, 'দাম দিয়েই এনেছি।'

মেমসায়েব কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'যাও তাহলে ভিতরে রেখে এসো।'

নয়নমণি ভিতরে ঢুকে ডিমগুলো রেখে বেরিয়ে এল। মেমসায়েব তখন কাপড়-চোপড় বদলাতে লেগেছেন।

নয়নমণি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

শ্বশুরবাড়ির সামনের মাঠে প্রতিদিন শ্রমিকেরা বসে আড্ডা দেয়। কাল রাত থেকে তুলকালাম কাণ্ড। শোভাযাত্রায় বেরোবার জন্য মাঠে বহু লোক এসে অপেক্ষা করছিল। সেইসময় হঠাৎ ইসমাইলের গ্রেপ্তার হবার খবর এল। তারপর শোভাযাত্রীদের মনে প্রবল উত্তেজনা। য়ুনিয়নের নেতারা ওদের শান্ত করবার চেষ্টায় একেবারে হয়রান হয়ে গেলেন। নয়নমণির এসব হুলুস্থুল আর ভালো লাগে না। দুর্গাকে সে বলেছিল বাংলোয় ফিরে যাবার কথা, সেখানে শান্তি আছে, হট্টগোল নেই। কিন্তু দুর্গা রাজি হয়নি, বাড়িতে শ্রাদ্ধ-শান্তির সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলোয় সে ফিরে যেতে পারে না। তাছাড়া কতদিনই বা বাংলোয় থাকতে পারবে ওরা। মেমসায়েব তো চলেই যাবেন, তখন নিজেদের জন্য একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই কথাটাই নয়নমণির ভালো লাগেনি। সে তো মেমসায়েবের সঙ্গে লখনউ যেতে চায়। মেমসায়েব চলে গেলে দুর্গা কি আর ওকে পড়তে পাঠাবে? বয়সে তরুণ হলেও মনটা ওর পুরনো ধাঁচের। নয়নমণির ভয় হয়েছে। ঘরে ফিরে আসার পর থেকে দুর্গার মতিগতি যেন বদলে গেছে। এমনিতে তো পিতৃশোকে বিহ্বল, তার উপর পান্নু বেশ কিছু দিন ধরে বলতে লেগেছে, 'ডাক্তার বলেছেন আমায় ডিব্রুগড় যেতে হবে নার্সিং-এ ট্রেনিং নেবার জন্যে। তখন তোমায় ঘরে এসে থাকতে হবে।' অবশ্য ধর্মঘট চলতে থাকলে কি হবে না হবে কিছু বলা যায় না। কোম্পানীর কোয়ার্টারে কি ধর্মঘটীরা চিরকাল থাকতে পাবে? এ ভয়টা ঢুকেছে সকলেরই মনে—এমন কি নয়নমণির বাবা প্রধানেরও মনে। সকলের চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মীমাংসার কোনো আশা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এই গণ্ডগোলের মধ্যে ও আর থাকতে চায় না। মেমসায়েবের বাংলোতে শান্তিতে থাকবার জায়গা আছে। তাছাড়া চ্যাটার্জি যেখানে থাকতেন, সেইখানে বসে লোকেরা কি যেন সব ভয়-লাগা কথা গোপনে আলোচনা করে থাকে। জোট বেঁধে ওরা সাংঘাতিক কিছু একটা হয়তো করতে চায়। মেমসায়েব বেরোলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে। বেরিয়ে নয়নমণিকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কি হল তোমার? কিছু কথা আছে নাকি?'

নয়নমণি বলল, 'বিশেষ কিছু নয়—কেবল একটি কথাই বলতে এসেছি।'

'কি ?'

'ওখানে আমি এক মুহূর্তও থাকতে চাই না।'

'কেন ? তোমাদের কি যেন শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ করতে হয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু কাজকর্ম হতে এখনো অনেক দেরি। কে জানে তার আগেই যদি আপনি চলে যান। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গেই লখনউ যাব। আপনি চলে গেলে পর হয়তো যাওয়াই হবে না। দুর্গার মন যেন কেমন বদলে গেছে। দুঃখ শোকের ঝোঁকে কিসব কথা আমায় বলেছে, বলে কিনা আমাদের ভালো করে ঘর গেরস্তালি পাততে হবে।'

'কেন ? আমি তো ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি।'

'দুর্গা বুঝেছেও। কিন্তু বুঝে কি হবে ? ঘরে ফিরে যাবার পর থেকে বাপ মা, নীতি নিয়ম—এইসব ছাড়া ওর মনে আর কিছু নেই। আগেকার দুর্গা আর নেই—এখন ও সনাতন রীতিতে নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল লোক।'

'কিন্তু সে তো এখনো তোমায় কিছু বলেনি ?'

'না, না, মেমসায়েব, আমার ভরসা নেই। ওর মনটা পুরণো ধাঁচের। অন্যেরা যদি বলে, নয়নমণিকে একা একা এতদূরে গান শেখবার জন্য পাঠিয়ো না, পাঠানো ঠিক হবে না, ওর মতিগতি বদলে যাবে। আর গান-বাজনা শেখার প্রতি আমাদের লোকের কোনো আগ্রহ নেই। বলবে, মেয়েদের বাইজী-নাচনী করে কি হবে ?'

মেমসায়েব বললেন, 'এসব তোমার মিছে ভয়। সত্যিই কি তোমাদের দেশের লোকেরা এমন ? বেশ তো, যেতে যখন চাইছো আমার সঙ্গেই যাবে তুমি। কিন্তু আমি তো চিরকাল তোমার দেখাশুনো করতে আসতে পারব না। দুর্গা তোমার স্বামী।'

নয়নমণি এসব বারণ শুনতে রাজী নয়। তার ভাবখানা এই যে, তার লখনউ যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো—কেবল সংগীত শিক্ষার জন্য নয়, এই সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে বেরোবার জন্যও ওর প্রবল ইচ্ছা। সেইজন্যই ও সন্তান কামনা করেনি, ঘর গেরস্তালি করাটাকেই সর্বস্ব বলে মেনে নিতে পারেনি। মেমসায়েব ওর মধ্যে এই বাতিকটুকু ঢুকিয়ে দিয়েছেন, প্রশস্ত পৃথিবীর দিকে তাই তার মন উধাও। একদিন সে মেমসায়েবের মতো উপযুক্তা হয়ে বাইরের জগত ঘুরে আসবে, তারপর সংসারের কথা ভাববে...

মেমসায়েব এবার একতলায় নেবে গেলেন। সেখান থেকে ডাকলেন, 'নয়নমণি!'

'কি মেমসায়েব ?'

'এদিকে এসো।'

নয়নমণি নেমে গেল। মেমসায়েব মোটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। নয়নমণি এলে পর তাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'নয়নমণি, মোটরের পিছনের সীটে বোসো। এখন তোমায় দুর্গার ওখানে রেখে যাব।'

নয়নমণি অবাক হয়ে মেমসায়েবের চোখের দিকে চেয়ে রইল। কি বলছেন মেমসায়েব? ওকে কেন এখানে থেকে পাঠিয়ে দিতে চাইছেন? সে মোটরে ওঠার জন্য কোনো আগ্রহ দেখাল না।

মেমসায়েব শুধোলেন, 'তুমি কি দুর্গাকে বলে এসেছো? মানে এখানে যে থাকবে—সে কথা?'

'না। দুর্গা তো শ্মশানে চলে গেছে।'

'কাজটা ভালো করোনি। দুর্গাকে বলে আসতে হবে, চলো।'

'ওকে বলে লাভ নেই। এখানে আপনার সামনে দাঁড়ালে যে দুর্গা, বাড়িতে সে দুর্গা অন্য মানুষ। সেখানে সে আমার স্বামী—প্রভু!'

মেমসায়েব হেসে বললেন, 'সে তো তোমায় ভালোবাসে। বাসে না কি?'

'ভালো কেন বাসবে না, মেমসায়েব? সেই জন্যেই তো বাইরে পাঠাতে এত ভয়। কেউ যেন আমায় হরণ করে নিয়ে যাবে।'

সরল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস ফ্লেমিং সস্নেহে হাসলেন। দুর্গার ভয়টা কত সামান্য ভয়, আর নয়নমণির সংসারটাও কত যৎসামান্য। ওদের এই সম্বন্ধের মধ্যে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত নেই। তবু নয়নমণি কিছু ভুল করেনি লখনউ যাবার জন্য বেরিয়ে আসায়। দুর্গা ওকে বাধা দেবে না বলেই ওঁর ধারণা। যদি বাধা দেয়, তাহলে এদের ঘর ভেঙে যাবে। লোকের ঘরভাঙা ওঁর পক্ষে উচিত হয় না, সেইজন্যই উনি চাননা যে দুর্গার সঙ্গে নয়নমণির মতভেদ ঘটে। এবার তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'চলো—তোমায় যেতেই হবে। আমি লখনউ থেকে চিঠি পেয়েছি, দুর্গার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি সব ঠিক করে দেব। চলো।'

এবার বাধ্য হয়ে নয়নমণি মোটরের ভিতর ঢুকল। মিসেস ফ্লেমিং দুর্গাদের বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।



মিসেস ফ্লেমিং গিয়ে দুর্গাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন। গাড়ি রাখতে গিয়ে দেখলেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। বেশ কিছু ধর্মঘটীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, স্টেশনে যাবার রাস্তার দিকে তাদের গোরু তাড়ানোর মতো করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মিসেস ফ্লেমিং নয়নমণিকে নামিয়ে দিলেন।

মেমসায়েবের কৌতূহল হল। এতগুলি লোককে গ্রেপ্তার করার কি অর্থ? তিনি ধারে কাছের কাউকে জিগ্যেস করে জানতে চাইলেন। কিন্তু তেমন কাউকে পেলেন না। নয়নমণিও একটু বিহ্বল হয়ে বলল, 'এই সমস্ত কারণেও এখানে থাকতে আমার ভয় হয় মেমসায়েব। সকলে বলাবলি করছে সবাইকে নাকি পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। কী যেন একটা ঘোষণা জারি করেছে...'

'কি ঘোষণা?'

ততক্ষণে কোথা থেকে পান্নু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। নয়নমণিকে দেখেই বলল,

'বৌদি শুনেছো, যুদ্ধ লেগেছে। সব ধর্মঘটীদের নাকি সহর থেকে তাড়িয়ে দেবে সরকার। শিলং-এর গভর্নর সায়েব কি একটা যেন ঘোষণা জারি করে বলেছেন এই শহরটাকে নাকি রক্ষা করতে হবে।'

'কিসের থেকে?' নয়নমণি জিগ্যেস করল।

'কি জানি কিসের থেকে। আইনের কথা আমি কি জানব? আর কাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—সে তো বুঝাই যাচ্ছে। ভারি ঠকবাজি করছে কিন্তু সায়েবরা। শোভাযাত্রা শ্মশানে পৌঁছবার পর থেকে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেছে।'

মিসেস ফ্লেমিং অন্য সব কথা বুঝতে পারলেন না। তবে যুদ্ধ লাগার কথাটা তাঁর মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করল। আজ দু'তিন দিন তিনি কাগজ পড়েন নি, রেডিয়ো শোনেন নি। আন্দাজ করলেন, খবরটা নিশ্চয় প্রচারিত হয়েছে গতকাল ভোর রাত্রে অথবা আজ সকাল বেলা, তা না হলে হিগিনস ও জিলাপসী খবরটা জানল না কেন? নিশ্চয় সত্যি হবে খবরটা। তা না হলে এমন করে ছড়িয়ে যেত না।

মিসেস ফ্লেমিং এবার নয়নমণিকে বললেন, 'তোমরা একবার সন্ধ্যের দিকে আমার ওখানে এসো। কথা আছে। যদি যুদ্ধ বেধে থাকে তাহলে আমার খুব শীঘ্রই চলে যেতে হতে পারে। এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শুরু হবে বলে আমি ভাবিনি।'

মিসেস ফ্লেমিং মোটর চালিয়ে ডিব্রুগড়ের দিকে চলে গেলেন।

পান্নু নয়নমণিকে উদ্দেশ করে বলল, 'এদের যুদ্ধ, আবার আমাদেরও যুদ্ধ, কিন্তু আমাদের যুদ্ধটা আরো যেন সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। সবাইকে গ্রেপ্তার করছে, শোনো নি?'

নয়নমণির মনে ভারি ভয়, সে বলল, 'কাল রাত থেকেই তো শুনছি গ্রেপ্তারের কথা। ভালো লাগছে না কিছু।'

পান্নু বলল, 'সেইজন্যেই বুঝি বাংলো চলে গিয়েছিলে? সেখানে কি কোনো শান্তি পেলে? হাজার হোক, সে তো অন্য লোকের বাড়ি।'

নয়নমণি বলল, 'আমি লখনউ যাব বলে বেরিয়েছি—ভাবছি, সেখানে গানবাজনা শিখে আসব। এখানে আর ভালো লাগছে না।'

'যেতে চাও তো যেয়ো। এইসব কথায় আমি কেন থাকি—তোমার আর দাদার কথা।'

নয়নমণি কিছু আর বলল না।

পান্নু বলে চলল, মেমসায়েব তোমায় অনেক সাহায্য করেছেন। খুব কম লোকেরই ভাগ্যে এরকম সহায়তা মেলে। আমরা গানবাজনা শেখবার সুযোগও পাইনি, জানিও না তার ঠিক কি রকম স্বাদ। তুমি শিখে এলে বাড়ি বসে শুনতে পাব। খুব ভালো হবে...।'

প্রথম প্রথম নয়নমণির মনে হয়েছিল পান্নু বুঝি ওকে ঠাট্টা করছে, কিন্তু পরে

বুঝল ঠাট্টা নয়, প্রকারান্তরে সে মনের দুঃখটাই প্রকাশ করতে চাইছে। প্রত্যেকেই চায় নিজের গুণাগুণ বিকাশ করতে, কিন্তু ক'জন পারে? নয়নমণি ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কপালটা না ভাঙলেই হল। অন্য লোকে অর্থ সাহায্য করবে, তা দিয়ে সে পড়াশুনো করবে, এরকম কপাল ক'জনের হয়? মেমসায়েবের খেয়ালখুশিতে এটা ঘটেছে, সন্দেহ নেই। এ খেয়াল কি চিরকাল টি'কে থাকবে?

দুজনে মুখোমুখি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে, কোথা থেকে যেন গিয়াসুদ্দীন এসে পড়লেন। মুখখানা শুকনো ও দাড়িতে আচ্ছন্ন। পান্নু জিগ্যেস করল, 'এসব যা শুনছি, সব সত্যি নাকি?'

'সত্যি।'

'এখন কোথায় বেরোলেন?'

'ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন গুলিচালনার তদন্ত করতে, তাঁর কাছে যাচ্ছি। লছমী আছে কি, তার সঙ্গে একটু দেখা হওয়া দরকার।'

'গিয়াসুদ্দীন সাহেব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইছিলেন, এমন সময় পান্নু কঠিন স্বরে জিগ্যেস করল, 'আপনারা তো বেশি বেশি বুঝতে পারেন, এই তদন্তের ফলে কিছু লাভ হবে কি? ওদিকে ধর্মঘটীদের গ্রেপ্তার করে করে স্টেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারো চাকরী থাকবে না, গিয়াসুদ্দীন সাহেব।'

গিয়াসুদ্দীন দাঁড়ালেন, তারপর পান্নুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখলেন। খুবই সাধারণ মেয়ে এই পান্নু, কিন্তু এত বড় বড় কথা বলার ক্ষমতা পেল কোথা থেকে? তাঁর নিজেরও ধারণা ধর্মঘট আস্তে আস্তে পতনের পথে চলেছে। সারা শহরটাকে গভর্ণর সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন। বিলাতে যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে এরকম ব্যবস্থা নেবার একমাত্র অর্থ হল, ধর্মঘট বন্ধ করা। ঘোষণা করার সঙ্গে ঢালাও গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে! য়ুনিয়নের নেতাদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন—মালা সিংকে ধরেছে, প্রধানকে ধরেছে। ইসমাইলকে তো আগেই ধরেছে। সে-ই ছাউনিগুলো পুড়িয়ে দিয়ে পুলিশকে মস্ত একটা সুযোগ দিয়ে দিল। গ্রেপ্তার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকার আছে শিলং-এ, কিন্তু গভর্ণরকে এক চুলও নড়াতে পারল না। ইতিমধ্যে ভারতীয় কংগ্রেস শ্রমিকদের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, বলেছেন কোম্পানী যদি শ্রমিকদের দাবী পূরণ না করে তাহলে সরকারের উচিত কোম্পানীর মাইনিং লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া। সেসব কিছুই তো হল না। এখন নাকি কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতবাসীকে জিগ্যেস না করেই গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করে দিলেন যে ভারত ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার যেন থাকবে গদী আঁকড়ে, ব্রিটেনের তাঁবেদার হয়ে। জাতির এই অবমাননার প্রতিবাদে, এসব সরকার পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন বলে মনস্থ করলেন।

কোনো আশা নেই ধর্মঘট সফল হবার।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আর যেন কোনো অর্থ নেই। সেইজন্যে গিয়াসুদ্দীন সাহেব একটা বিকল্প পথের সন্ধান করছেন।

পথটা যে কি তাও তিনি বুঝতে পারছেন। শ্রমিক য়ুনিয়নের দাবী বিচারে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন হবার পরেও কোম্পানী তা উপেক্ষা করল, তখন সরকার শ্রমিকদের সহায় হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর পক্ষই নিলেন সরকার—বিদেশী কোম্পানীর সমর্থক বিদেশী সরকার। সুতরাং বিদেশী সরকারকে না সরালে উপায় নেই। কংগ্রেস সেই কথাই বলছেন। দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন চলছে, হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক জেল খাটছে, সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করার অপরাধে। এই অসহযোগ হল একমাত্র পথ।

পান্নুও দেখছে গিয়াসুদ্দীন সাহেবের দিকে। কিন্তু তাঁর মনে কি তোলপাড় চলছে বুঝতে না পেরে পান্নু একটু দুঃখিত ও বিমূঢ়। গিয়াসুদ্দীন সাহেব বললেন, 'য়ুনিয়নের অধিকাংশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়েছেন। একমাত্র আমি বাইরে আছি। আমিই বা কদ্দিন বাইরে থাকব? হয়তো এই এনকোয়ারির কাজ শেষ হলেই আমাকেও ধরবে। খুবই ভাবনার কথা, বুঝলে পান্নু। বিদেশী সরকার যত দিন আছে, আমাদের কিছু হবে না।'

পান্নু হেসে বলল, 'এত শত ভেবে কি লাভ? রামলীলাতে যুদ্ধ দেখেছি—যুদ্ধে নামবার পর রাক্ষসও ভাবে না, হনুমানও ভাবে না, খালি যুদ্ধ করে যায়। আপনারাও যুদ্ধ করে চলেছেন, করুন।'

গিয়াসুদ্দীনের মনে হল যেন কোনো বিজ্ঞ লোকের উপদেশ শুনছেন তিনি। পান্নুর মুখ দিয়ে জাহানারা যেন কথা বলছে। এবার তিনি একটু হেসে যেন সহজ বোধ করলেন, বললেন, 'আমি এখন যাই, পান্নু।'

গিয়াসুদ্দীন সাহেব লছমীর বাড়ির দিকে চলে গেলেন। নয়নমণি এতক্ষণ ধরে দুজনের কথাবার্তা শুনছিল, এবার বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'তাহলে পাষণ্ডেরা বাবাকেও গ্রেপ্তার করেছে?'

এতক্ষণে নয়নমণি যেন বুঝতে পারল শ্রমিক নির্যাতন কি ভাবে চলছে। মেমসায়েবের সঙ্গে থাকতে আপনজনের দুঃখ বিপদের কথা সে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি। এবার পারল। যারা জেল খাটছে কিংবা গুলিতে মরেছে, তারা ওর আপনজন। কিন্তু এসব কেন? এতে কি লাভ হচ্ছে—তা ওর মাথায় আসে না।

পান্নুকে বলল, 'চাকরীর জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে লোকে বেকার হল। বেশি সুখ সুবিধা খুঁজতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরল—এসব যে কেন হচ্ছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, পান্নু।'

পান্নু বলল 'আমিও জানি না। কিন্তু ওই যে চ্যাটার্জি বলে লোকটি ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে বলতেন চাকরী ও সুখ সুবিধা চাইলেই হবে না, ক্ষমতা পেতে হবে হাতে—অর্থাৎ শ্রমিককে নাকি দেশের রাজা হতে হবে।'

'তা কি করে সম্ভব হয় ?'

'হবে না কেন ? চ্যাটার্জি বলতেন, রুশ দেশে নাকি সেইরকমই হয়েছে, সেখানে নাকি একক মালিক বলতে কেউ নেই।'

নয়নমণি বলল, 'এসব কথা তো কোথাও শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম। চ্যাটার্জির সঙ্গে তোর নাকি ভালোবাসা হয়েছিল—সত্যি নাকি ?'

পান্নুর মুখখানা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল চ্যাটার্জির বলা সেই পৌরুষের কথা। গিয়াসুদ্দীন সাহেবই যে একমাত্র পৌরুষের অবতার হতে পারেন, তা তিনি মেনে নেন নি। বলেছিলেন, না ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তাঁরও পৌরুষ আছে এবং সে শক্তি একদিন তিনি প্রদর্শন করতে সমর্থ হবেন। সেই পৌরুষ কেবল নিজের প্রতিষ্ঠা বা স্বার্থের জন্যে প্রয়োগ করলে চলবে না, সকলের স্বার্থে প্রয়োগ করতে হবে। যুদ্ধে যেমন সৈনিকেরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তেমনি শ্রমিকদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার হলে শ্রমিক কর্মীকে প্রাণ দিতে হতে পারে। সেইজন্যেই তিনি গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বাবা মরেছেন, কিন্তু এত সব কথা ভেবে তিনি মরতে যান নি। বরুয়াও মরেছেন, কিন্তু তেমন সচেতন ভাবে মৃত্যু বরণ করেন নি। আর বোধনের তো কথাও ওঠে না—সে মারা গেল অকারণে, অপঘাতে। চ্যাটার্জির ঘরখানা পান্নু তন্ন তন্ন করে দেখেছে ওঁর মৃত্যুর পর। কত যে বই আছে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি পান্নুর আকর্ষণ যেন বৃদ্ধি পেয়েছে, কেন তা বলা যায় না। সম্ভবত সত্যকার পৌরুষ দেখিয়ে তিনি যে তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন—সেইজন্য। চ্যাটার্জি বলতেন, তাঁর অনেক সঙ্গী পুলিশের গুলিতে মরেছে, তিনিও যদি তেমনি মরতে পারেন খুশি হবেন।

পান্নু বলল, ওসব কথা এখন বলে কি লাভ ? চলো যাই ওঁর ঘরটা একটু দেখে আসি। তুমি তো ইংরেজী জানো।'

নয়নমণি বলল, 'হ্যাঁ, কত জানি ইংরেজী! কেন লজ্জা দাও ? বেশ তো চলো, যাই দেখে আসি। আমারও দেখার ইচ্ছে আছে।'

দু'জনে গিয়ে চ্যাটার্জির ঘরে ঢুকল। বিছানাপত্র এমন ভাবে আছে যেন এইমাত্র মানুষটা ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে গেছে, ভালো করে জামাকাপড় পরতেও সময় পায়নি। আলনায় কোট-প্যান্ট অনাদরে পড়ে আছে। আয়নার ওপর একটা টুথব্রাশ। একটা বই পড়ে আছে মেঝের ওপর—বইখানা খোলা। আর দুই আলমারী ভর্তি ঠাসা বই। নয়নমণি কয়েকটা নাম বানান করে করে পড়ল: Das Kapital—Karl Marx; State and Revolution—Lenin; My Experiments with Truth—Mahatma Gandhi; Indian Struggle—Subhas Chandra Bose. বইগুলোর নাম পড়বার চেষ্টা করল নয়নমণি। কয়েকটা নামের মানে বুঝল, কয়েকটার বুঝল না। কিন্তু নয়নমণি মুগ্ধ হল—এত এত বই একজন লোক কি করে পড়তে পারে ? জ্ঞানের রাজ্যই আলাদা।

পান্নু জিগ্যেস্ করল, 'কিছু কি বুঝতে পারলে বৌদি ?'

'না। কেবল প্রসিদ্ধ নামগুলো ধরতে পারলাম। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু—এঁদের নাম তো সবাই জানে। আর মাকর্স, লেনিন—এঁদের নামও কোথাও যেন শুনেছি মনে হয়—হয়তো বাবার কাছেই চ্যাটার্জি এইসব নাম বলতেন।'

পান্নু বলল, 'তাঁর মুখে তো ও দুটো নাম সর্বক্ষণ লেগে থাকত। কিন্তু কি যে পড়তেন মানুষটা। রাত দিন পড়া আর পড়া, আর কিছু নয়। হ্যাঁ—ওঁরাই না কি লিখে গেছেন শ্রমিক-রাজের কথা।

নয়নমণি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কখনো যে মজুর রাজা হবে, এ আমি ভাবতে পারি না।'

পান্নু হাসতে লাগল, বলল, 'মানুষের নিজের মন যেমন, পৃথিবীটাকেও তেমনি দেখে। মজদুর রাজ যদি না হবে, তাহলে এখানে ধর্মঘট হল কেন ? ভয় দেখাল, মানুষ মারল—তবু তো মনটাকে একেবারে ভেঙে দিতে পারল না। মানুষের একটা যেমন ছোট মন আছে, তেমনি আছে এক বড়ো মন। সেই বড়ো মনটাই মানুষের আসল মন।'

নয়নমণি এবার কিছু কাগজ পেল, তাতে অনেক কিছু ইংরেজীতে লেখা। সেগুলি খুব যত্ন করে নয়নমণি একত্র গুছিয়ে রাখল। কিন্তু পড়তে পারল না। হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, মেমসায়েবকে বলে পড়িয়ে নিলে কেমন হয় ? ইংরেজীতে লেখা তো পড়তে পারবেন।'

পান্নু সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'পড়বেন মেমসায়েব ?'

'হ্যাঁ, আমায় খুব স্নেহ করেন তো।'

পান্নু অবাক হয়ে নয়নমণির দিকে তাকিয়ে রইল—'সায়েব-মেমরাও স্নেহ করতে জানে না কি ?'

নয়নমণি বলল, 'শুনতে যাবে ?'

পান্নু জবাব দিল, 'বেশ, যাবো।'

নয়নমণি বলল, 'সকলেই এখন সায়েব-মেমদের অবিশ্বাস করছে। ভাবখানা এমন যেন ওদের দয়ামায়া স্নেহ প্রেম বলতে কিছুই নেই। কেবল চামড়ার রঙটা আলাদা হলে কি হবে ? সকল মানুষের মধ্যে মানুষের গুণ থাকে। নাসিরুদ্দীন খানসামা মেমসায়েবের ওখানে যাবে না বলল, যেন মেমসায়েবের জন্য খানা রান্না করাটা পাপ। কালো হোক ধলা হোক—মানুষ মানুষই। সিং-জী তো কালো—সে কি কিছু কম খারাপ মানুষ ? ওর চেয়ে মেমসায়েব শতগুণে ভালো।'

পান্নু কোনো কথা না বলে ওর বৌদির কথাগুলো শুনে গেল, তারপর চ্যাটার্জির ঘরের অন্যান্য জিনিসের উপর আবার চোখ বুলাল। হঠাৎ বালিশের তলায় একটা শক্ত জিনিস দেখে তুলে নিল। নয়নমণির হাতে দিতে, সে বলল 'এটা ডায়েরী।'

পাতাগুলো উলটে পালটে দেখল কোথাও কোথাও দু'চার পাতা লেখা।

নয়নমণি পড়বার চেষ্টা করল। একটি পাতার নিচে লেখা অংশে ওর চোখ পড়ল। সেখানে লেখা আছে :

পান্নুর সঙ্গে আজ দেখা হল। ওকে আমার ভালো লাগে।
কিন্তু ভালো লাগাটা প্রকাশ করি না। করে লাভ নেই।
ও পরে জানতেও পারবে না ওকে আমার কত ভালো লাগে।
আমায় যদি ওর ভালো না লাগে, তাতে কি ? ভালো
ওর নিশ্চয়ই লাগে না। ওকে আমি আশীর্বাদ করছি ও যেন
সুখী হয়।

নয়নমণি কথাগুলো অতি কষ্টে নিজে পড়ার পর, পান্নুকে শোনাল।

পান্নুর মনে পড়ল সেই একটা রাতের কথা যেদিন চ্যাটার্জিকে এক থালা খাবার দিতে গিয়ে ও বাপের কাছে চেলাকাঠের মার খেয়েছিল। আর সেই কুষ্ঠরোগীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে গিয়াসুদ্দীন সাহেবকে ডেকে আনার কথাটাও মনে পড়ল। চ্যাটার্জি যে ওকে সত্যিই ভালোবাসত তাতে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বেঁচে থাকতে সেই ভালোলাগার জন্য একটু কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবকাশ হয়নি পান্নুর। মেয়েরা কি সহজে তাদের দ্বিধা লজ্জা অতিক্রম করতে পারে ? কিন্তু আজ মরণের পর পান্নু অনুতপ্ত চিত্তে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল—কিন্তু নীরবে, একটি কথাও না বলে।

সেই সময় দুর্গা এসে ঢুকল। খালি পা, খালি গা, কোমরে একটা কোরা ধুতি জড়ানো, গায়ে একটা চাদর। সদ্য শ্মশান থেকে ফিরেছে।

দুর্গা বলল, 'নয়নমণি, শুনেছে কি কি কাণ্ড ঘটেছে!'

'কি ?'

'শহরে গ্রেপ্তার। মালা সিং গ্রেপ্তার। ইসমাইল গ্রেপ্তার...'

'শুনেছি। আরো কিছু কি খবর আছে ?'

'হ্যাঁ। টাওলার বাইরে থেকে অনেক মজুর আনার ব্যবস্থা করেছে। হিগিনস সায়েব নাকি বাধা দিচ্ছেন কিন্তু তিনি আবার গেছেন শিলং-এ। কংগ্রেস সরকার এস. পি. কে নির্দেশ দিয়েছেন নেতাদের সকলকে জামিনে ছেড়ে দিতে। এন-কোয়ারি চলাকালে কাউকে গ্রেপ্তার করতে মানা করেছেন। শ্বশুরদের সবাইকে ছেড়ে দেবে বলে আশা হচ্ছে। কিন্তু টাওলার আবার মজুর এনে ফেলবার চেষ্টা চালাচ্ছে। অধিকাংশ ভলন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কে আর পাহারা দেবে ?

পান্নু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার ভারি ভাবনা হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা বুঝি দুর্ঘটনা ঘটবে।'

আটত্রিশ

সেদিন রাত্রে মেমসায়েব নয়নমণিদের বলে দিলেন পক্ষকালের মধ্যে তিনি শহর ছেড়ে চলে যাবেন। নয়নমণিও যাবে তাঁর সঙ্গে লখনউ। সেখানে তার সবরকম ব্যবস্থা করে দেবার পর বিলাত অভিমুখে রওনা হয়ে যাবেন। শহর ছেড়ে যাবার সময় দুর্গাকে গাড়িখানা দিয়ে যাবেন।

মেমসায়েব এমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বললেন যে, দুর্গার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে বলতে পারল না নয়নমণির লখনউ গিয়ে দরকার নেই। গাড়িখানা শস্তায় দিলেন বলে মেমসায়েবের কাছে সে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর নয়নমণির কৃতজ্ঞতা তো সীমাহীন। তার জীবন গড়ে তোলায় মেমসায়েব অনেক কিছু করেছেন, এখন শেষ বাধাটুকু মেমসায়েব নিজের হাতে ভেঙে দিতে চাইছেন।

দুর্গা তার বাবার ক্রিয়াকর্ম সেরে তার নিজের বক্তব্যটুকু পরিষ্কারভাবে নয়নমণিকে জানাল। সোজাসুজি বলল, বহুদিনের বিচ্ছেদ তার পক্ষে অসহনীয় হবে। তাছাড়া অন্যান্য অসুবিধা তো আছেই। নয়নমণি কিন্তু সেসব কথা গ্রাহ্যমাত্র করল না, বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের যাবার সবরকম আয়োজনে লেগে গেল। দুর্গা ক্ষুণ্ণ হল, মুখে কিছু বলল না।

ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সেই তদন্তের রিপোর্ট বেরোল। চারজন মানুষ যে কার অপরাধে মরল, মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট তা ঠাহর করতে পারলেন না। য়ুনিয়ন দাবী করল যে পুনরায় তদন্ত করা হোক। এবার শিলং থেকে একজন জজ সায়েবকে পাঠানো হল। তাঁর রিপোর্টও অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হল। তাতে তিনি বললেন, ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্তে অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। শ্রমিক পক্ষের সাক্ষ্য উচিত মতো নেওয়া হয়নি, ভালো করে অনুসন্ধানও করা হয়নি। কিন্তু জজ সায়েব তাঁর রায় দিলে কি হবে? মৃত শহীদদের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হল না। ওদিকে কোর্ট অব এনকোয়ারির পরামর্শ কোম্পানী গ্রহণ করল না বলে কংগ্রেস সরকার সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার দিলেন একটি কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠন করে।

য়ুনিয়নকেও কংগ্রেস সরকার অনুরোধ জানালেন কনসিলিয়েশন বোর্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁরা যেন শ্রমিকদের পুনরায় কাজে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন।

সরকারের এই অনুরোধ য়ুনিয়ন মেনে নিলেও টাওলার মেনে নিতে রাজী হল না। কোম্পানীর উত্তর যেদিন পাবার কথা, সেদিনই য়ুনিয়নের নেতারা নিজেদের কর্তব্য স্থির করার জন্য য়ুনিয়ন অফিসে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হলেন। প্রধান, মালা সিং ও ইসমাইল—এঁরাও জামিনে মুক্ত হয়ে আলোচনা সভায় যোগ দিলেন। সকলে যখন কথাটা বিবেচনা করছেন, এমন সময় কোম্পানীর পক্ষ থেকে টাওলারের একটি কড়া চিঠি এল। চিঠির সারমর্ম হল এই যে, যদি শ্রমিকেরা চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যে কাজে ফিরে না আসে, তাহলে কোম্পানী কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। যুদ্ধের সময় তেলের উৎপাদন বন্ধ রাখাটা ভারত রক্ষা বিরোধী কাজ বলে গণ্য করা হবে।

সেই চিঠি পেয়ে য়ুনিয়নের নেতারা বুঝলেন পোষমানা ভালো ছেলের মতো শ্রমিকেরা সুড় সুড় করে কাজে যোগ না দিলে, কোম্পানী ভারত রক্ষা আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেবে।

য়ুনিয়ন স্থির করলেন এভাবে বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না। একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে তাঁরা সকল ধর্মঘটীকে সমস্ত পরিস্থিতিটা ভালো করে জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বললেন, অনাহারে যদি মরতেও হয়, শ্রমিকেরা যেন নিজেদের দাবী পূরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

□

নির্দিষ্ট দিনে মেমসায়েব স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলেন জনতার জঙ্গল ভেদ করে এগোবার রাস্তা নেই। সারা প্ল্যাটফর্ম পুলিশ ও ধর্মঘটীতে ভরা। মেমসায়েব প্রথমে দুর্গা'র সন্ধান করলেন, দুর্গা ও নয়নমণির স্টেশনে আসার কথা। প্রথমে নিজের কামরায় জিনিসপত্র রেখে, মেমসায়েব প্ল্যাটফর্মের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন।

তবু দুর্গা নয়নমণির দেখা নেই। মেমসায়েব বিরক্ত হয়ে নিজের কামরায় ফিরে গেলেন, দেখলেন কামরার অন্য বার্থটায় জিলাপসী উঠছে।

জিলাপসী হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বলল, 'আপনার সঙ্গে যাবো বলে বেরিয়েছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'Home.'

'কেন ?'

'যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। সেনাবাহিনী থেকে ডাক এসেছে।'

মিসেস ফ্লেমিং চুপ করে রইলেন।

আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে ধর্মঘটী শ্রমিকদের একটা সভা বসেছে। সেখানে গিয়াসুদ্দীন সাহেব কি যেন বলছেন। গিয়াসুদ্দীন সাহেবের পর বক্তৃতা দিলেন প্রধান। তারপর মালা সিং। এইভাবে একজন একজন করে বেশ কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন। মিসেস ফ্লেমিং বুঝতে পারছেন না এই সব ধর্মঘটী শ্রমিকদের কেন আনা হয়েছে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে।

হঠাৎ জিলাপসী এসে দাঁড়াল মেমসায়েবের পাশে। মুখে একটা পাইপ। জিলাপসী বলল, 'কিছু বুঝতে পারছেন না—না ? Wholesale arrest. ছেলে মেয়ে বুড়োবুড়ী কেউ বাদ নেই।'

আশ্চর্য হয়ে মিসেস জিগ্যেস করলেন, 'কেন ?'

জিলাপসী হেসে বলল, 'যুদ্ধের সময় তেলের উৎপাদন বন্ধ করার পরিণাম।'

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'যুদ্ধ তো লেগেছে য়ুরোপে। এখানে প্রতিরক্ষা আইন চালু করতে হল কেন?'

জিলাপসী হাসতে লাগল। সভার দিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'ওরা টের পাচ্ছে।'

মিসেস ফ্লেমিং শ্লেষভরে বললেন, 'টের তো নিশ্চয় পাচ্ছে, কিন্তু কি টের পাচ্ছে জানেন? সাদা চামড়া লোকেরা যদ্দিন গদিতে বসে আছে, কালো চামড়া লোকেদের কোনো ন্যায়সংগত দাবীও পূরণ করবে না।'

জিলাপসীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

ধর্মঘটীদের মধ্যে তুমুল সোরগোল শুরু হল। পুলিশ ওদের হুকুম দিয়েছে রেলগাড়িতে উঠতে হবে– কিন্তু কেউ উঠবার জন্যে এগিয়ে এল না।

পুলিশ বিপদে পড়ল। একটা পুলিশ কর্ডনের মাঝখানে রাওলট সায়েবের মুখখানা দেখা গেল; ও. সি. মিশ্রের সঙ্গে কি যেন তিনি আলোচনা করছেন। স্টেশন মাস্টারকেও ডাকিয়ে এনেছেন। প্ল্যাটফর্মে ধর্মঘটীদের সংখ্যা হাজার দুই মতো। বোধহয় তাদের রেলগাড়িতে চড়িয়ে স্থানান্তর করার কথা হচ্ছে।

জিলাপসী বলল, 'রেল ছাড়তে দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে।'

মিসেস ফ্লেমিং কিছু বললেন না। চলে যাবার দিনও তাঁকে এরকম দৃশ্য দেখে যেতে হবে—এ তিনি ভাবতে পারেন নি। মিঃ হিগিনস শিলং-এ আছেন। তিনি শহরে থাকলে কি এরকমটা হতে পারত? শোনা যায়, তিনি নাকি কনসিলিয়েশন বোর্ড-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেবার সপক্ষে ছিলেন, সুতরাং তিনি থাকলে একটা কিছু মীমাংসা হয়তো হতে পারত।, আর তাই বা কী করে বলা যায়, হিগিনস দুর্বল চিত্ত, টাওলারের সামনে তিনি দু'কথা বলতেও পারেন না।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন টাওলার এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। একেবারে মার মূর্তি। এই দফায় এক দল মেয়েকে গ্রেপ্তার করে এনেছে পুলিশ শহর থেকে। কেউ বাকী নেই—লছমী, পান্নু, নয়নমণি আর বরুয়ার স্ত্রী—কোলে তার কচি ছেলেটি কাঁদছে—

টাওলার মেমসায়েবকে দেখে এগিয়ে এল বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

মিসেস ফ্লেমিং-এর সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলেপুড়ে গেল। ভদ্রতার খাতিরে টাওলারকে প্রতি সম্ভাষণ জানাবার সময় বললেন, 'এইসব লোকগুলোকে এভাবে তাড়িয়ে কি লাভ?'

টাওলার জবাব দিল না, উলটে আবহাওয়ার কথা তুলল। মিসেস ফ্লেমিং টাওলারের সঙ্গে আর একটি কথাও বললেন না। তিনি সোজা রাওলটের কাছে চলে গেলেন এবং রাগতভাবে বললেন, 'জানতে পারি কি দুর্গা, নয়নমণি, বরুয়ার স্ত্রী আর পান্নুকে কী কারণে গ্রেপ্তার করে তাড়িয়ে দিতে হচ্ছে?'

রাওলট থতমত খেয়ে বললেন, 'ও, আপনার বাংলোয় যারা কাজ করত, তাদের

কথা বলছেন বুঝি ? I am sorry. কিন্তু ওরা বোধহয় বেশ কিছুকাল আপনার চাকরীতে নেই।'

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'কেন থাকবে না ? ছুটিতে আছে।'

রাওলট মিশ্রকে বললেন ওই দুজনকে ওঁর কাছে এনে হাজির করতে।

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'মেয়েদের ছেড়ে দিন।'

রাওলট উত্তর দিলেন, 'না। সেভাবে তো ছেড়ে দিতে পারি না। মেয়েদের মেয়ে বলে রেহাই দেওয়া যাবে না। ধর্মঘটী পরিবার মাত্রকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

'কিন্তু বরুয়ার স্ত্রীর কি অপরাধ ? পান্নুই বা কি দোষ করল ?'

রাওলট একটু বিব্রত হলেন। হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন টাওলার। রাওলট যেমন বিশাল বপু—টাওলারও তেমনি। দুজনেই দৈত্যাকায়। রাওলট টাওলারকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি তো স্থানীয় লোকদের সবাইকে নামে জানি না।'

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'এঁর সঙ্গে কথা বলে কি লাভ ? গ্রেপ্তার তো করেছেন আপনি।'

টাওলার গম্ভীরভাবে বললেন, 'ধর্মঘটীদের সপরিবারে তাড়ানো হচ্ছে। পরিবারবর্গকে থাকতে দেওয়া সমীচীন হবে না বলেই এরকম করা হচ্ছে।'

মিসেস ফ্লেমিং বিরক্তিভরে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা কয়ে কোনো লাভ নেই।'

এই বলে তিনি ধর্মঘটীদের দিকে চলে গেলেন—বরুয়ার স্ত্রীর সন্ধানে।

বরুয়ার স্ত্রীর কাছে গিয়ে মেমসায়েব দেখলেন সুন্দরী যুবতী মেয়েটির টুকটুকে মুখখানা চোখের জলে ভাসছে। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি আকুল হয়ে কাঁদছেন। মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়।' তারপর তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নয়নমণি-দুর্গাকে খুঁজে বের করে, মিশ্র তাদের নিয়ে হাজির করল রাওলটের সামনে।

পান্নু মেমসায়েবের দিকে তাকিয়ে শ্লেষের সুরে বলল, 'এইরকম শুকনো আদর দেখিয়ে লাভ কি মেমসায়েব ? সেদিন তো আপনি চ্যাটার্জির লেখা থেকে আমাদের কিছু কিছু পড়ে শোনালেন। সেই লেখাতেও তিনি তো ঠিকই বলে গেছেন, ওপরতলার লোকের সঙ্গে নীচু তলার লোকের মিল হতে পারে না। নয়নমণিকে তো এত উৎসাহ দিলেন। এখন কি হল ? সকলের বিরুদ্ধেই ওয়ারেন্ট জারী করলেন রাওলট সায়েব। কাউকে বাদ দিলেন না। গিয়াসুদ্দীন সাহেব, মালা সিং, প্রধান, ইসমাইল, লছমী, আমি, বরুয়ার স্ত্রী, নয়নমণি কেউ আমরা বাদ পড়িনি। ওরা ঠিক করেছে, আমাদের ঝাড়েবংশে নির্মূল করে চষে ফেলবে।'

মেমসায়েব কিছু বললেন না। শিশুটির গালে একটা চুমু খেয়ে তাকে মায়ের

কোলে ফিরিয়ে দিয়ে, এবার তিনি পান্নুর দিকে ঘুরে বললেন, 'একটা কথা মনে রেখো পান্নু। এসব কাজ যারা করছে তারা সত্যিকার ইংরেজ নয়, তারা ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি নয়। ইংলণ্ডের লোকেরা তোমাদের দেশের মানুষেরই মতো। এরকম অত্যাচার অনাচার, তাদের ভালো লাগে না।'

এবার ইসমাইল ও নাসিরুদ্দীন এগিয়ে এল। ইসমাইল বলল, 'মেমসায়েব, তেলে আর জলে মিশ খায় না জানবেন।'

নাসিরুদ্দীন বলল, 'এতদিন সায়েবদের কাজ করেছি, কিন্তু সত্যিকার ভালো লোক খুব কমই দেখেছি ওদের মধ্যে। বড মানুষের ভালোবাসা আর সায়েবদের মুরগী পোষা—একই ব্যাপার।'

এবার কাছাকাছি যারা ছিল সবাই ঘিরে ধরল মেমসায়েবকে। যার মনে যা কিছু অভিযোগ ছিল, একে একে উদ্গীরণ করতে লাগল। এই সৎ ও ভদ্র ব্রিটিশ মহিলার সমস্ত হৃদয়টা এদের বাক্যবাণে যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। একমাত্র মিঃ ফ্লেমিং ছাড়া আর কেউ বুঝে উঠতে পারেনি ইতিহাসের চোখে টাওলারের মতো সায়েবরা কতখানি পাতকী। কালো আদমীদের এই বিষোদ্গারে একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বালির দুর্গ চুরমার হয়ে যাবে। সেজন্যে পূর্ব থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কিন্তু টাওলারের কাছে এসব বলা মানে অরণ্যে রোদন, বুঝবার বুদ্ধি তার নেই, শোনবার মতো কান নেই।

মেমসায়েব পাথরের প্রতিমার মতো নিঃশব্দে ধর্মঘটীদের গঞ্জনা শুনলেন। ক্রমে অভিযোগ অনুযোগ সব আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর মেমসায়েব গিয়াসুদ্দীন সাহেবের খোঁজ করলেন।

একটা কোণায় গিয়াসুদ্দীন সাহেব বসে ধূমপান করছিলেন। মেমসায়েব খোঁজ করছেন শুনে তিনি উঠে এলেন।

মেমসায়েব বললেন, 'একটি কথা বলবার জন্য ডাকলাম।'

'বলুন।'

'আপনারা যেমন ধর্মঘট করলেন, সেরকম ধর্মঘট খুব কমই দেখা যায়। আমাদের দেশেও হয়না এরকম। জয় হয়তো হয়নি, কিন্তু...।'

'কিন্তু কি? নিঃসংকোচে বলুন।'

'একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন এসব নির্যাতনের কোনো দরকার ছিল না। ভালো লোক যদি থাকত, এরকমটা হয়তো হত না...।'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'বুঝেছি আপনার কথাটা। কিন্তু আমিও একটা কথা বলতে চাই। এই ধর্মঘট অন্যায়ভাবে ভাঙা সম্ভব হত না—যদি আমাদের দেশে স্বাধীন সরকার থাকত। আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কি হবে? আমরা এই ইংরেজ সরকারকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাব।'

এমন সময় রাওলট ও টাওলার এসে উপস্থিত হলেন মিসেস ফ্লেমিঙের সামনে। মেমসায়েব ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

রাওলট অনুরোধ করলেন, 'আপনি এবার আপনার রেলকামরার কাছে চলুন। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'কি কথা ?'

রাওলট বললেন, 'ওই দু'জন ছেলে-মেয়ের বিষয়ে।'

মিসেস ফ্লেমিং নয়নমণিদের দিকে পা বাড়লেন।

অন্যান্য সময়ে মেমসায়েবকে দেখে নয়নমণি কী একটা বিমল আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়ত। কিন্তু আজ তার মুখখানা শুকনো। চোখে একটা অভিমান। ওর নিজেকে লাঞ্ছিত অপমানিত মনে হচ্ছে। দুর্গাকে, ওকে আর পান্নুকে গরু তাড়ানোর মতো করে ঘর থেকে স্টেশনে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। দুর্গাকে হয়তো পুলিশ দু-এক ঘা মারও দিয়ে থাকবে। পুলিশ লাইট ইনফেন্ট্রির সায়েবদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। নয়নমণি, পান্নু, বরুয়ার স্ত্রী—কেউই অপমানের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

মেমসায়েব নয়নমণিকে কি জিগ্যেস করবেন—কিছু আর মনে পড়ল না। তিনি রাওলটকে বললেন, 'এদের ছেড়ে দিয়েছেন কি ? একে আজ লখনউ নিয়ে যাবার কথা। আর একে আমার গাড়িটা দিয়েছি।'

রাওলট খুবই বিনীতভাবে বললেন, 'না, এদের ছেড়ে দিতে পারব না। আপনি যদি বলেন, পরে একে কখনো লখনউ পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি। গাড়িটাও আপাতত আমার জিম্মায় থাকবে।'

মিসেস ফ্লেমিঙের মুখখানা লজ্জায় অপমানে রাঙা হয়ে উঠল।

দুর্গা এবার বলল, 'মেমসায়েব, যা খেয়েছি তা-ই হজম করা শক্ত। আপনারা যা করেছেন, সে কখনো আমরা ভুলতে পারব না। এখন আপনি চলেই যান।'

দুর্গার কথার সুরটাই যেন বদলে গেছে।

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'একটা কথা ছিল। জানিনা, নয়নমণি কি বলবে...।'

নয়নমণি মাথাটা হেঁট করে বলল, 'যদি কপালে থাকে, যাব। আপনি আমায় নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। যান এবার তা হলে...।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নয়নমণির দু'চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

মেমসায়েব বললেন, 'নয়নমণি !'

'কি ?'

'শোনো। মন খারাপ কোরো না। মুক্তি পাবার পরেও যদি হয়—পড়তে যেয়ো।'

নয়নমণি আরো বেশি করে কাঁদতে লাগল।

দুর্গা ধমক দিয়ে বলল, 'কাঁদছো কেন ? এতদিনে বুঝতে পারছো তো সায়েবরা কি জাতের লোক...

লখনউ যাবার কথা দুর্গা একটিবারও তুলল না, এমন কি, গাড়িটার কথাও না। খুব দাগা পেয়েছে বেচারা।

রাওলট খানিকক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা শোনার পর বললেন, 'আমি একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় করে দেব।'

মিসেস ফ্লেমিং একটু হেসে চুপ করে গেলেন। নয়নমণির অবস্থা ভেবে তার খুবই দুঃখ হল। ওকে সাহস সঞ্চয় করতে হবে, তবেই যদি লখনউ যেতে পারে।

সব চেয়ে বড় আঘাত এই শেষ আঘাত। মেমসায়েব সে আঘাত পেলেন এ পর্যন্ত যাদের নিজের লোক বলে মনে করে এসেছেন, তাদের কাছ থেকে। এমন কি দুর্গার মনেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বর্ণবিদ্বেষ। ওদের উপকার করে ওদের মনে মেমসায়েব যে প্রীতির বীজ রোপণ করেছিলেন, তা থেকে চারা বেরোবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু এরা শিকড় শুদ্ধ কেটে দিয়েছে। আবার কখনো এ চারা গজাবে কিনা কে জানে!

নিরাশ হয়ে মেমসায়েব দুর্গাকে ডাকলেন, 'দুর্গা।'

'কি মেমসায়েব?'

'আমি চলে যাচ্ছি। তোমার জন্যে মোটরখানা রেখে গেলাম। রাওলট সায়েবের সঙ্গে আমি ব্যবস্থা করে যাব।'

দুর্গা বলল, 'কিন্তু টাকা তো দেওয়া হল না, মেমসায়েব।'

মেমসায়েব বললেন, 'টাকার কথা তোমায় ভাবতে হবে না, দুর্গা। আমার টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা আমি তোমায় দিয়েই গেলাম। গাড়ি চালিয়ে নিজে নিজে উপার্জন করে খাওয়া পরার খরচ তুলতে পারবে। কেবল একটা কথা...।'

অবাক হয়ে দুর্গা তাকিয়ে রইল মেমসায়েবের দিকে।

মেমসায়েব বললেন, 'নয়নমণিকে লখনউ না পাঠিয়ে বসে থেকো না যেন...' এই বলে মেমসায়েব আস্তে আস্তে ওখান থেকে সরে গিয়ে নিজের কামরায় উঠলেন।

জিলাপসী তখনো নিজের জায়গায় বসে পাইপ টেনে চলেছেন। তিনি এখন থেকেই যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছেন। সারা জীবন ধরে সে এই একটি স্বপ্নই দেখে এসেছে—রোমান্স ও এডভেঞ্চার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গিয়েছিল জার্মান সীমান্ত পর্যন্ত। একবার ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করার সময় একটা গুলি লেগেছিল ওর বুকে। বুকখানা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন। কেমন করে বাঁচল, সেও এক অভাবনীয় ব্যাপার। ওর বুকপকেটে ছিল একটা শক্ত মলাটের ডায়েরী আর একখানা পকেট বুক সিরিজের বই। বাঁচলেন সেই কারণে। সেই যুদ্ধে মানুষ মেরে হঠাৎ ওর মতিগতির পরিবর্তন ঘটল। ওদের দেশ স্কটল্যাণ্ডে। বাড়ির অন্য তিনজনই ছিল যোদ্ধা—বাপ, দাদা আর কাকা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনজনেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ হারাল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না বলে ওর শূন্য ঘরে ফিরে আসতে মন সরল না। বিদেশে চাকরী নিয়ে চলে গেলেন। কিছুদিন ছিল রেঙ্গুনের তেল কোম্পানীতে। কোম্পানী ডিগবয়ের সঙ্গে একত্রযুক্ত হবার পর চলে এসেছিলেন এই শহরে। বিয়ে থা করতে চাননি। তাই মুক্তভাবে যৌনজীবন যাপন করতে শুরু করলেন। সেইভাবে কাটল কিছুদিন। আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে লাগল। ওইরকম

জীবনে কোনো তৃপ্তি আর যেন পাচ্ছিলেন না। নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগছিল, অকারণ বিষাদে মন যেন ছেয়ে থাকত। তখন আবার মনে পড়ত যুদ্ধের কথা।

জিলাপসী অনুভব করলেন এডভেঞ্চার ওর দরকার।

বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন। ট্রেঞ্চে লাফিয়ে পড়ে মারবেন, মরবেন, মরণের সম্মুখীন হয়ে আবার নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। সেই রকম জীবনই ওর কাম্য—মুহূর্তে মুহূর্তে সে জীবনে নূতন নূতন উত্তেজনা।

এই ডিগবয় শহরে এতদিন পরে, গত দু'মাস ধরে যা একটু উত্তেজনার স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। সেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছিল গুলি চালনার দিন। গুলিতে মানুষ মরল, তাতে ওর কোনো আক্ষেপ নেই। উত্তেজনাই ওর কাম্য—উত্তেজনা না থাকলে বাঁচবেন কেমন করে ?

এই শেষ দু'মাসের কথা বাদ দিলে, যে কয়েকটা দিন (কয়েকটা রাত বললেই ঠিক হয়) জিলাপসী তার এখানকার জীবনে তবু একটু উত্তেজনা লাভ করেছিলেন—তা নারীসঙ্গ থেকে। এক রাতের কড়ারে কিংবা মাস-বন্দোবস্ত করে এইসব নর্মসঙ্গিনী সে জুটিয়ে আনত। কিন্তু মাণিকের উত্তেজনা কেটে যায়, বিরক্তি আসে, তিক্ততা আসে, নিত্য নূতনের স্বাদ নিতে বাসনা হয়। তারপর এমন হল যখন যা পান, তাই গ্রহণ করেন, না পেলেও কিছু এসে যায় না। জীবনে ওর কোনো বন্ধন নেই, দায়িত্ব নেই, কোনো অনুতাপও নেই। ঈশ্বরের ভয়ও মুছে গেল ওর অন্তর থেকে।

রেলকামরার জানালা দিয়ে মিসেস ফ্লেমিঙের কাণ্ডকারখানা দেখেও ভারি যেন আমোদ পাচ্ছিলেন। প্রীতি, বদান্যতা—এইসব হৃদয়বত্তার যেন অভিনয় করছিলেন মিসেস ফ্লেমিং। এখানে এসেছিলেন প্রবন্ধ লিখতে—সেও একটা শখ—একটা এডভেঞ্চার। জিলাপসীর এডভেঞ্চারের সঙ্গে যদিচ তার কোনো মিল নেই—সেটা যে এডভেঞ্চার ছাড়া আর কিছু নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম এডভেঞ্চার করতে পারে এক শুধু ইংরেজ মেয়েরাই।

মিসেস ফ্লেমিং বিষণ্ণ মনে ঢুকলেন কামরায়, তারপর হাতব্যাগ থেকে একখানা খাতা বের করলেন—চ্যাটার্জির খাতা। লেখাগুলো তাঁর ভালো লাগছিল পড়তে।

I live for others. Therefore I do not want to possess anything. Not even the woman I happen to love, I shall have to live for them—the workers, for their emancipation from the thraldom of Capital.

My nation shall arrive out of this great calamity that has befallen her. It shall again be herself in power, prosperity and cultural greatness.

Sufferings there must be for the individual ; for in his sacrifice lies the greatest glory of being man. Suffering purifies the soul,

strengthens the moral character of the nation also. It makes the nation invincible.

It is the soul power combined with striking power that will drive the oppressors out of our national frontier. It will come today or tomorrow.

জিলাপসী জিগ্যেস করলেন, 'কি পড়ছেন ?'

'একজন মৃত ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা। এই মৃত ব্যক্তিটি ছিলেন একজন দেশভক্ত শ্রমিক ধর্মঘটী—যাকে তোমরা গুলি করে মেরেছো।'

জিলাপসী হাসতে লাগলেন, বললেন, 'আমার এডভেঞ্চার ভালোলাগে। মানুষ মারতে ভালোলাগে, মরতেও ভালোলাগে আবার সম্ভোগ করতেও ভালোলাগে।'

মিসেস ফ্লেমিং বইটা রেখে দিয়ে বললেন, 'পশুর ফিলসফি!'

জিলাপসী বললেন, 'হ্যাঁ, পশুই তো! কোথায়, মানুষ হবার সুবিধা কি কোথাও আছে? কেন যুবক বয়সে দেশ আমায় ফ্রন্টে পাঠাল? মরবার জন্যেই তো পাঠিয়েছিল। আবার চলেছি মরতে।'

জিলাপসী পাইপখানা নামিয়ে আবার বলে চললেন, 'স্নেহ প্রীতি দিয়ে কি করলেন আপনি? এখানেই তো তার শেষ হয়ে গেল!'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'বলছিলাম কি দুর্গাকে মোটর দিলেন, নয়নমণিকে পড়বার সুবিধা করে দিলেন, তারফলে কি হল? ওরা কি উপকারী বলে আপনাকে মেনে নেবে? ওদের চোখে আমরা সবাই অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ প্রভু, আর কিছু না।'

মিসেস ফ্লেমিং বিরক্তিভরে বলে উঠলেন, 'Shut up!'



রেল ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই।

ধর্মঘটীরা রেলকামরায় না ঢুকে রেল লাইনের সামনে বসে গেল। একজন নয়, দু'জন নয়, দু' হাজার লোক।

ওদের মনে আর ভয় সংশয় লেশমাত্র নেই। একটা প্রতিরোধের ভাব জেগে উঠেছে মনে। কারো নেতৃত্বের অপেক্ষায় তারা আর বসে থাকবে না। আর বসে গেছে কারা? লছমী, পান্নু, বরুয়ার স্ত্রী—কোলে তার শিশু।

নেতারা নিরুপায় অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছেন।

ইসমাইল দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক নিস্পন্দ। কি করবে এখন সে? পুলিশ ধর্মঘটীদের টানাটানি করছে। তারা উঠবে না।

রাওলট সায়েব চার পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছতে লেগেছেন। তিনিও নিরুপায়।

টাওলার তার কাছেই দাঁড়িয়ে। সেও নিরুপায়।

খানিকক্ষণ বাদে টাওলার হাঁক দিলেন, 'রাওলট।'

'Yes !'

'Use force.'

□

'Use force' কথাটা সোনার সঙ্গে নেতারা যেন সবাই সচেতন হয়ে উঠলেন। গিয়াসুদ্দীন এগিয়ে এলেন মালা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। আর এল প্রধান, ইসমাইল। গিয়াসুদ্দীন বললেন খুব শক্তভাবে, 'পারবেন না, শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। শক্তি প্রয়োগ করবার কে তোমরা ? এ দেশ আমাদের দেশ, এখানে তোমাদের কোনো অধিকার নেই। সরে যাও, চলে যাও।'

মালা সিং এসে একেবারে টাওলারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে তখন আগুন জ্বলছে। প্রধান গিয়ে দাঁড়ালেন রাওলটের সামনে। ইসমাইল চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলির ভয় দেখাচ্ছিস ? মার তো দেখি গুলি ! কত গুলি আছে তোদের—মার দেখি !'

ইসমাইল টাওলারের সামনে দাঁড়িয়ে, শার্টের বোতাম খুলে বুকখানা পেতে দিল।

টাওলারের চোখে একটা বিস্ময় ও উত্তেজনা ফুটে উঠল। সে নির্বিকারভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ এসে টাওলার ও রাওলটের চারিদিকে কর্ডন রচনা করল।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলল।

রাওলট একটা সিগারেট বের করে গিয়াসুদ্দীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, একটা সিগারেট খান। আমরা শক্তি প্রয়োগ করব না। কিন্তু আপনারা রেল যেতে বাধা দেবেন না। সেটা গুরুতর অপরাধ।'

গিয়াসুদ্দীন সিগারেটটা নিতে হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় ইসমাইল চেঁচিয়ে বলল, 'এইসব মিতালি চলবে না, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। ওদের ছলনায় ভুলবেন না।'

গিয়াসুদ্দীন ওর কথা গ্রাহ্য করলেন না, বললেন, 'তোমার মগজটা একটু ঠাণ্ডা করো। মাথা গরম করলে কাজ হয় না।' তিনি সিগারেটটা নিয়ে বললেন, 'রাওলট সায়েব, আমরা রেল চলতে দেব, কিন্তু আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কি ?' রাওলট জিগ্যেস করলেন।

'আমাদের জোর করে রেল গাড়িতে তুলতে যাবেন না।'

'Agreed.'

রাওলট নিজে গিয়াসুদ্দীনের সিগারেট জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর মিশ্রকে বললেন, 'রেল লাইন আর প্ল্যাটফর্ম থেকে পুলিশ ফোর্স সরিয়ে নাও।'

মিশ্র সেলাম ঠুকে তাড়াতাড়ি পুলিশদের সরে যাবার অর্ডার দিল। পনের মিনিটের মধ্যে পুলিশ ফোর্স সরে গেল।

রাওলট বললেন, 'এবার বাকি কাজটা আপনাদের করতে হবে, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। আমি এখানে আর থাকব না।'

এই বলে রাওলট আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের কোঠায় ঢুকলেন। স্টেশন মাস্টারকে বললেন, 'ধর্মঘটীরা রেললাইন থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত রেল চালানো ঠিক হবে না।' স্টেশন মাস্টারও সেই কথাই ভাবছিলেন, সুতরাং সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করতে গিয়ে কোনো বিঘ্ন হল না।

পুলিশ সরে যেতে, টাওলারের মুখখানা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। রাওলট যে তাঁকে একা ফেলে এভাবে চলে যাবেন—সে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যেন ঠিক কাজ করল না। এবার টাওলার কোনো কথা না বলে চুপি চুপি সরে পড়ল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও অপেক্ষা করল না। একেবারে বাইরে এসে মোটরে স্টার্ট দিল। ধর্মঘটীদের সামনে সে ঘোরতর অপদস্থ হল। ইংরেজ ইংরেজের অবমাননা করল, কালো মজুরদের চোখের সামনে। চরম মুহূর্তে রাওলটের মনটা দপ করে নিবে গেল—সে শক্তি প্রয়োগ করতে পারল না।

এই অপমানের আঘাতটা টাওলারের পক্ষে অসহ্য মনে হল। কিন্তু পুলিশ পারল না বলে কি টাওলার ক্ষান্ত হবে? কিছুতেই নয়। কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টাওলার জানে ধর্মঘটের আসল উদ্দেশ্য কেবল কোম্পানীর কাছ থেকে দাবী আদায় করা নয়, নিহিত উদ্দেশ্য হল মজুরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। কোম্পানীর মত স্পষ্ট—শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য এত টাকা খরচ করার মতো কোম্পানীর সংগতি নেই। একসঙ্গে এত খরচ বহন করতে পারে না কোম্পানী। আর গিয়াসুদ্দীনের কথা থেকে তো স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে—আসল লড়াইটা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের।'

টাওলার মোটর ছুটিয়ে দিল বাংলোর দিকে।

□

ধর্মঘটীরা যখন দেখল পুলিশ চলে গেছে, ওদের উত্তেজনা কমে গেল। নেতারা সবাইকে প্ল্যাটফর্মে উঠে আসতে বলার পর ওরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে প্ল্যাটফর্মে জড়ো হল।

এবার আলোচনা শুরু হল—অতঃপর কি করা উচিত হবে?

গিয়াসুদ্দীন, মালা সিং ও প্রধান আবার গেলেন রাওলটের কাছে, জিগ্যেস করলেন ধর্মঘটীদের উপর বহিষ্কারের আদেশ তখনো বলবৎ আছে কিনা। রাওলট জানালেন অবশ্যই আছে। থাকবে না কেন? এ-আদেশ তাঁর নয়, আদেশ এসেছে খোদ শিলং থেকে। কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে, গভর্ণর বাহাদুর তা গ্রহণ করেছেন। এখন গভর্ণরই সর্বেসর্বা। তাঁর আদেশ অমান্য করার অধিকার রাওলটের নেই।

শহরের ভিতরে এখন আর কেউ ঢুকতে পারবে না। শহর থেকে কে কোথায় যাচ্ছে—সে তাদের নিজেদের ব্যাপার।

কথা শেষ হতেই রেলগাড়ি বাঁশি বাজিয়ে রওনা হয়ে গেল।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'কিন্তু আমরা এখান থেকে যাব না। এই শহরটা আমাদের শহর। এখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবার অধিকার কারো নেই।'

রাওলট হেসে বললেন, 'সেটা হল আপনাদের নিজেদের কথা। পুলিশ এখানে আছে কেবল শান্তি রক্ষার জন্য।'

গিয়াসুদ্দীনেরা বেরিয়ে গেলেন।

কিছু করার উপায় নেই। গিয়াসুদ্দীন সাহেব নিজেও সেই কথা জানেন। স্টেশনের বাইরে পা দিলেই, শহরে ঢুকবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। শহর যে তাঁদের—সে কথা ঠিক; কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। আপাতত শহরটা কোম্পানীর।

রেলখানা চলতে চলতে কিছুক্ষণ পরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে গেল। এবার ধর্মঘটীদের কথাগুলো বেশ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

নেতাদের দেবার মতো আর কোনো উপদেশ নির্দেশ নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। ধর্মঘটীরা হাহুতাশ করছে। আর কোনো উপায় নেই। প্ল্যাটফর্মে অনন্তকাল বসে থাকলেও, কেউ ওরা শহরে ঢুকতে আর পারবে না।

গিয়াসুদ্দীন মাটির ওপর বসে পড়লেন। মুখে আর কথা সরছে না। ইসমাইলের দপদপানিও নিভে যাবার মতো।

কেবল বরুয়ার শিশুপুত্রের কান্নার শব্দটা প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। নিরাশ্রয় নিঃসহায় শিশু কাঁদছে। এ যেন শিশুর ক্রন্দন নয়—নিরাশ্রয় নিঃসহায় সমস্ত ধর্মঘটী শ্রমিকদের কান্না।

গিয়াসুদ্দীন একটা সিগারেট ধরালেন।

ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল পান্নু। জিগ্যেস করল, 'কি ভাবছেন?'

গিয়াসুদ্দীন পান্নুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন কি করা যাবে বুঝতে পারছি না। মাথা যেন আর চলছে না। চ্যাটার্জি মরে গেল, বরুয়া মরে গেল, চণ্ডীও মরে গেল। ভালোই করেছে ওরা। বেঁচে থাকাটা ভারি শক্ত হয়ে পড়েছে। এখানেই অনন্তকাল ধরে বসে থাকব।'

পান্নু হাসল। তারপর বলল, 'চ্যাটার্জি একটা কথা বলতেন।'

'কি কথা?'

'মানুষের কাজের কথা। মানুষ কতটুকুই বা করতে পারে। কেবল অন্য লোকের উপকারের জন্য একটু আধটু কাজ করতে পারে। বসে থেকে কি হবে? চাকরী ছেড়ে আবার কাজে কর্মে লেগে যেতে হবে।'

'কিরকম কাজ?'

'শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠার কাজ। তা যদ্দিন না হয়, সর্বদা এইরকম চলবে।'

তার মধ্যে সিগারেটের খোঁজে নাসিরুদ্দীন এসে গিয়াসুদ্দীনের পাশে বসল। তারপরে এলেন প্রধান, প্রধানের পরে ইসমাইল। এটা যেন সিগারেট খাবারই সময়। গিয়াসুদ্দীন-প্যাকেটটা বের করে সবাইকে এক একটা সিগারেট দিলেন, দেশলাই জ্বালিয়ে দিলেন, সবাইকে বললেন বসতে।

বরুয়ার শিশুটি খেতে না পেয়ে চেঁচাচ্ছে। মালা সিং স্টেশন মাস্টারকে বলে সামনের দোকান থেকে বিস্কুট আনিয়ে দিলেন। শিশু শান্ত হল। তারপর মালা সিং-ও এসে বসলেন গিয়াসুদ্দীন সাহেবের কাছে।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'এখানে কিছুক্ষণ বসতে হবে। হ্যাঁ, পান্নু কি বলছে শুনুন। চ্যাটার্জির কথা বলছে। চ্যাটার্জি না কি বলত, চাকরী গেছে তো গেছে, এবার পাঁচজনের ভালোর জন্যে কাজ করতে হবে—তার মানে শ্রমিকরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সম্ভবত এখানে বেশি দিন থাকা আমাদের চলবে না। কিন্তু আমাদের কাজ হোক—এই কাজ। শহরের বাইরে আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু বসে থাকলে চলবে না, কাজ করে যেতে হবে যাতে আমাদের শহরে আমরা ফিরে আসতে পারি। আমাদের পরাজয় হতে পারে না...'

কেউ এবার একটাও কথা বলল না। সিগারেট মুখে যাদের, তারা চিন্তামগ্নভাবে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। পান্নু একটু ঢোক গিলে বলল, 'কেউ পরিষ্কার করে কিছু আমাদের বলতে পারেনি। কেবল চ্যাটার্জি জেনেছিলেন কি করতে হবে।'

'কি জেনেছিল চ্যাটার্জিবাবু?' নাসিরুদ্দীন জিগ্যেস করল।

'জেনেছিলেন মরতে হবে।'

নাসিরুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ। সকলেই কি তাঁর মতো মৃত্যু বরণ করে নিতে পারে, পান্নু? চণ্ডী পারল। বরুয়া পারল। সবাই মরতে যাবে কেন? মরার কথা চলবে না।'

হঠাৎ ইসমাইল বলে উঠল, 'মরার কথা চলবে না। এখানেই থাকতে হবে আমদের। বহিরাগত মজুর যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, সেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

প্রধান হঠাৎ বলে বসলেন, 'বসে বসে কিছু কাজ হবে না, ইসমাইল। সকলকেই হাতে কুকরী নিতে হবে।'

মালা সিং-ও বললেন, 'মরতে যদি হয়ই তা লড়াই করে মরাই ভালো। মেয়েরা সব এখানে থাকুন কিংবা ওঁদের সবাইকে আমরা তিনসুকিয়া পাঠিয়ে দি। তারপর আমরা কর্ডন ভেঙে ঢুকে পড়ব শহরে। এরকম হতাশ হয়ে বসে থাকলে কিছুই হবে না।'

প্রধান আর মালা সিং-এর কথা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা।

লছমী এতক্ষণ ধরে চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে উঠে এসে বলল,

আপনারা এতজন পুরুষ এখানে একত্র বসে শেষ পর্যন্ত বুঝি এইসব আলোচনা করছেন। এতগুলো বন্দুকের সামনে, কৃপাণ আর কুকরী কয়খানা নাচিয়ে আপনারা কার মাথাটা কাটবেন ? আপনাদের সকলের শাড়ী পরাই ভালো।'

প্রধানের রাগ হল। তিনি বললেন, 'মুখ সামলে, লছমী। কথার কোনো বাঁধন নেই।'

মালা সিং-এরও রাগ হয়েছে, কিন্তু তিনি চুপ করেই রইলেন।

লছমী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'একজন তো ফালতু মজুরদের ছাউনীতে আগুন লাগিয়ে যা করবার করেছিলেন। ফলে হল কি ?'

ইসমাইল বলল, 'লছমী, তোমার এভাবে বলাটা উচিত হয়নি। এতজন বয়স্ক লোকের সামনে মুখ সামলে কথা বলা উচিত। দুষ্ট লোকগুলোকে আমরা খেদিয়ে দিলাম, তাতে খারাপটা হল কি ?'

লছমী এবার জ্বলে পুড়ে উঠল, বলল, 'ওরা এমনিও যেত অমনিও যেত। ওদের বুঝি আর হৃদয় নেই ? আগুন না দিলেও চলত। আগুন দেওয়াতেই কোম্পানী অছিলা পেয়ে গেল। মেয়েমানুষ হতে পারি, কিন্তু আমাদের মাথা কোনো কোনো সময় ভালোই কাজ করে। এখন কৃপাণ কুকরী বের করলে ওদের আরো বেশি করে অছিলা দেওয়া হবে—আর কিছুই হবে না। শিকারে গিয়ে সায়েবরা যেমন করে হরিণ মারে, তেমনি গুলি করে সবাইকে সাবাড় করে দেবে। আর পান্নু চ্যাটার্জির কথা বলছিল। চ্যাটার্জি কখনো এভাবে মরতে বলেছিল কি ? আমি তো জানি, তিনি বলেন নি। অস্ত্র :য়ে তিনিও তো একদিন মারতে বেরিয়েছিলেন। তাতে কিছু হল না বলেই তো তিনি শহরে এসে য়ুনিয়ন গঠন করলেন। য়ুনিয়নকে কি করে মারবেন আপনারা ? আপনারা না থাকলেও য়ুনিয়ন থাকবে। চ্যাটার্জি সেই কথাটাই বলে গেছেন। কেউ বুঝল না তাঁর কথা। য়ুনিয়ন এখনো আছে, মরেনি, য়ুনিয়নকে বাঁচিয়ে রাখুন আপনারা।'

লছমীর এই মূর্তি আগে কেউ দেখেনি। ওর কথার মধ্যে খুব যে বড়ো যুক্তি ছিল, কেউ তা অস্বীকার করতে পারল না। গিয়াসুদ্দীন এবার হেসে বললেন, 'বোস্ বোস্ লছমী। ঠিক বলেছিস। য়ুনিয়নকে বাঁচাতে হবে।'

অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন স্বামীজী। তাঁর শান্ত সৌম্য হাস্যময় মুখখানা দেখে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি নিশ্চয় কিছু খবর এনেছেন।

স্বামীজী বললেন, 'নাসিরুদ্দীন।'

'বলুন স্বামীজী।'

'খুব একটা দুঃখের খবর আছে ?'

'বলুন, কেমন দুঃখের কথা।'

সকলের মন উৎকণ্ঠিত। স্বামীজী বললেন, 'সমস্ত ঘটনা শুনে জেবউন্নিসা মনে খুব আঘাত পায়। তার মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার আমায় ডেকে খবরটা দিয়েছেন।'

নাসিরুদ্দীনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে বলল, 'তাকে কে এসব খবর দিতে গেল ?'

স্বামীজী বললেন, 'তোমার অদর্শনে ওর মনে সন্দেহ হয়। তারপর হাসপাতালের নার্স ওকে বলে। শুনে ও বলল, 'আমায় কে আর দেখবে তাহলে ?' তারপর থেকে ওর হার্টের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চলে গেল। দুশ্চিন্তা করে কি আর হবে ? ডাক্তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে সব ব্যবস্থা করছেন। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ওর বিছানার তলায় একটা পাশ বুক পাওয়া গেছে। পাশ বুকের টাকাটা বরুয়ার স্ত্রীকে দিয়ে গেছে। নাসিরুদ্দীন সে কথা জানে কি না জানি না।'

নাসিরুদ্দীন কোনো রকমে শোক সংবরণ করে বলল, 'জানি। আহা চলে গেল, আমার জন্যে একটু অপেক্ষাও করল না।'

স্বামীজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কে কার অপেক্ষা রাখে বলো।'

নাসিরুদ্দীন ছোট ছেলের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারপর স্বামীজী যখন দেখলেন নাসিরুদ্দীনের কান্না একটু কমেছে, বললেন, 'আরো একটা খারাপ খবর আছে।'

গিয়াসুদ্দীন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আবার কি ?'

'টাওলার সায়েবকে হাসপাতালে দেখে এলাম। হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।

টাওলারের হার্ট এ্যাটাক ! খবরটা দুঃখের না সুখের, কেউ যেন তা ধরতে পারল না। কিছুক্ষণ সবাই চুপ।

গিয়াসুদ্দীন আবার জিগ্যেস করলেন, 'হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক...।'

'হ্যাঁ, হঠাৎই বটে। ডাক্তার বললেন স্টেশন থেকে তিনি অফিস গিয়েছিলেন। মনের অবস্থা খারাপ ছিল, প্রেসারও বেড়েছিল। তারপর একটা টেলিগ্রাম এল— যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। যুদ্ধের ব্যাপারে খুব ভয়, তাই ঢলে পড়ল। আহমেদ সাহেব খবর পেয়ে ফোন করলেন ডাক্তারকে।'

ইসমাইল চীৎকার করে উঠল, 'বেশ হয়েছে। এক শো গরু মারলে বাঘের মরণ হবে না ?'

স্বামীজী তিরস্কার করে বললেন, 'ইসমাইল এভাবে কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি। লোকের ব্যাধিবিপদ হলে সেটা দুঃখেরই খবর।'

এই বলে তিনি বরুয়ার স্ত্রীর হাতে পাশ বুকটা দিতে গেলেন। বরুয়ার স্ত্রী দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীর পায়ে সষ্টাঙ্গে প্রণিবানত করে বললেন, 'পাশ বুক নিয়ে কি হবে আমার স্বামীজী ? আমি তো সব খুইয়েছি। পাপিনী আমি, কিছুই পেলাম না।'

স্বামীজী আশীর্বাদ করে বললেন, 'এখনো অনেক কিছু রয়ে গেছে তোমার।

ভগবান এই দেবশিশু দিয়েছেন আর একজন জীবনদুঃখিনী তার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দিয়ে গেছে তোমার জন্য। এমন ঐশ্বর্য ক'জনে পায়? শোক কোরো না, ওঠো।'

□

রাওলট দুর্গা আর নয়নমণিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁরা চিন্তিতভাবে ষ্টেশন-মাষ্টারের কামরায় গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল দু'জন। এবার ওরাও এসে বৈঠকে বসল।

পান্নু জিগ্যেস করল, 'কি বললেন সায়েব?'

নমনমণি বলল, 'কি আর বলবেন? আমার আর দুর্গার নাম লিখে নিলেন। দুর্গাকে বললেন, মোটরটা ওর জিম্মায় থাকবে, যখনই চাইবে, পাবে। আর আমার লখনউ যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। মেমসায়েবের সঙ্গে যেতে দিতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন নাকি ওঁর মাথাটা সুস্থির ছিল না।'

পান্নু বলল, 'তাহলে দুঃখ কোরো না, বৌদি। সেই গানটা গাও—বড় মিষ্টি লাগে শুনতে—সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা...।'

নয়নমণি বলল, 'না, এখন পারব না গাইতে। এত শোকের মধ্যে কি গান হয়?'

'শোকদুঃখ তো চিরকাল থাকবেই। তাই বলে গান গাইবে না?'

'না গাইব না এখন।'

দুর্গা এবার মাটির উপর থেবড়ে বসল। নয়নমণি পান্নুর সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকাল আকাশের দিকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। লোকদের কোনোপ্রকারে চেনা যাচ্ছে এখনো। মেমসায়েবের কথা মনে পড়ল নয়নমণির। মা-বাবাও ওকে অত ভালোবাসেন নি। এখন হয়তো কতদূর চলে গেছেন। কয়েকদিন পরে বোম্বাই—তারপরে লণ্ডন। তারপর?...আবার কখনো কি দেখা হবে ওঁর সঙ্গে? দেশ যদি দূরের হয়, মানুষও কি দূরে সরে যায়?'

স্বামীজী আবার গেলেন গিয়াসুদ্দীনের কাছে, বললেন, 'এবার আমি তাহলে চলি, গিয়াসুদ্দীন সাহেব। আপনাদের সাধনা বিফলে যাবে না, বুঝেছেন? সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য এখন অস্তগামী। য়ুরোপ থেকে তার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। এই যুদ্ধেই...।'

তারপর স্বামীজী হাসতে লাগলেন। নমস্কার করে তিনি যে রাস্তায় এসেছিলেন সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলেন।

উনচল্লিশ

নির্মল আকাশ। কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই।

স্টেশনের একপ্রান্তে একটা বেঞ্চে বসে গিয়াসুদ্দীন তখনো ভাবছেন ধর্মঘটীদের কোথায় পাঠানো হবে। কে জানে কে কোথায় যাবে।

বরুয়ার শিশুপুত্র এতক্ষণে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

এবার ধীরে ধীরে পা ফেলে পান্না এসে দাঁড়াল গিয়াসুদ্দীনের কাছে। বলল, 'দেখেছেন, আজ নতুন জীবনের প্রতিবাদ?'

'হ্যাঁ।'

'কি করবেন কিছু কি ভেবেছেন?'

গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'না। করবার কী-ই বা আছে?'

পান্না হাসল, বলল, 'না আমি জিগ্যেস করলাম আপনি কি করবেন।'

'আমি? এখানেই কিছুদিন থাকব। ধর্মঘটীরা যত দিন আছে।'

'তারপর?'

'চলে যাব।'

'কোথায়?'

গিয়াসুদ্দীন চুপ করে রইলেন।

'কোথায় যাবেন—কিছু বললেন না তো?

'কাছেই বাবার কেনা কিছু ধানজমি আছে। ভাবছি চাষবাস করব।'

'দেশের বাড়িতে ফিরে যাবেন না?'

'নাঃ। ঘর সংসার কোথায়? ধর্ম ত্যাগ করেছি যে?'

পান্না খুশি হল, বলল, 'যদি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই—রাখবেন আমাকে?'

এবার গিয়াসুদ্দীনের মুখে কথা সরল না।

অনেকক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ। দু'জনেই প্রতিপদের চাঁদ দেখছে। আজ যেন নূতন করে দেখছে। শহরের বাইরে আরো একটা বিস্তীর্ণ আকাশ আছে, সেই আকাশের চাঁদ। চাঁদ দেখে গিয়াসুদ্দীনের মনে হল যেন কোনো রূপসীর কটিতট। পান্নার মনে হল এই চাঁদ যেন চন্দ্রমৌলি শিবের মতো বরের মাথার উপরকার অর্ধচন্দ্র।

দু'জনেরই মনে পড়ল জাহানারার কথা। গিয়াসুদ্দীন বললেন, 'জাহানারা বলেছিল...।'

'কি বলেছিলেন?'

'তোমার মধ্যে আমি তাকে খুঁজে পাব।'

'আমি বুঝি জাহানারা বৌদির মতো দেখতে?' পান্নার মুখে হাসি।

গিয়াসুদ্দীন পান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, তার থেকে তুমি অনেক সুন্দর। তার সঙ্গে তোমার রূপের তুলনা হয় না। কিন্তু তুমি, তুমি কি আমায় ভালোবাসতে পারবে?'

পান্না হেসে বলল, 'আর কাউকে ভালোবাসি বলে বুঝি সন্দেহ হয়'?'

গিয়াসুদ্দীন হাসতে লাগলেন, বললেন, 'হয় বৈকি, নইলে মিছে কথা বলা হয়। চ্যাটার্জি, ইসমাইল... !' আবার হাসতে লাগলেন গিয়াসুদ্দীন।

পান্না মুখ টিপে হেসে বলল, 'কতদিন কেটে গেল, নিজের মন নিজেই বুঝতে পারিনি।'

'এখন পারছো বুঝি ?'

'জাহানারা বৌদি চলে যাবার পর থেকেই বুঝেছি।'

গিয়াসুদ্দীন হঠাৎ বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল। পান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি বলছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে নিশ্চিন্ত থাকো, তোমায় আমি গ্রহণ করলাম। প্রতিপদের চাঁদ আমার সাক্ষী।'

পান্না হাসল, কিছু বলল না।

এমন সময়ে নয়নমণি চীৎকার করে ডাকল, 'পান্না, তোরা দু'জন চলে আয়। চা তৈরি।'

স্টেশন মাস্টার চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কোথা থেকে কেমন করে ব্যবস্থা হল, এরা কিছু জানে না। তিনসুকিয়া থেকে বিস্কুট এসেছে। অতগুলি লোককে চা-বিস্কুট খাওয়ানো তো চারটিখানি কথা নয়।

ওরা দু'জন আনন্দে ভরপুর হয়ে চা খেতে এগিয়ে গেল। এখন কারো মুখে আর উত্তেজনা নেই। সকলেই বুঝতে পেরেছে কি করতে হবে। এখন শুধু চা খাওয়া।

পান্না গিয়ে বিস্কুট বিলি করতে লাগল। প্রচুর বিস্কুট এনেছিল দোকানী। চায়ের ব্যবস্থা করেছিল প্ল্যাটফর্মের কাছেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি কড়াইয়ে জল গরম হচ্ছিল। লছমী, নয়নমণি, বরুয়ার স্ত্রী ও অন্য মেয়েরা গরম জল নিয়ে চা তৈরি করার কাজে লেগেছিল। পুরুষেরা মাটির গেলাসে করে সেই চা বিতরণ করছিল।

সকলেরই খিদে পেয়েছিল, কিন্তু খিদে পেলে কি হবে ? খাবার জিনিস যৎসামান্য। তাই খেয়েই সকলকে সন্তুষ্ট হতে হল। দুর্যোগে এর চেয়ে বেশি কি আর পাবে ?

ইসমাইল স্টেশনের বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল। প্রধান আর মালা সিং একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে পেশেন্স খেলছিলেন। ধর্মঘটীদের কেউ কেউ মগ্ন ছিল টোয়েন্টি-নাইন খেলায়। কেউ বলছিল সুখদুঃখের কথা, পরস্পরের মধ্যে।

নাসিরুদ্দীন একটা জায়গায় হাঁটু গেড়ে আপন মনে নামাজ পড়ছিল। তা না হলে শোকে শান্তি পাবে কেমন করে ?



চা খাবার পর সবাই যখন শোবার উদ্যোগ করতে লেগেছে খোলা আকাশের

তলায়, সকলে লক্ষ্য করল প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদকে—যেন কালো মেয়ের গলার মালায় দুলছে অর্ধচন্দ্রাকার একটি লকেট।

নয়নমণি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে। তখন ওর মেমসায়েবের কথাও মনে পড়ল না। দুর্গা কাছেই সটান শুয়ে, তাকে বলল, 'দুর্গা, নতুন দিন আরম্ভ হয়েছে।'

'কি ?'

নয়নমণি বলল, 'এই আমাদের নতুন জীবন।'

দুর্গা বিষন্ন মনে বলল, 'কত দূরে চলে যাবে তুমি। কি জানি কি হবে।'

'কত আর দূর ? বচ্ছেটচ্ছে তো আসবই। তা ছাড়া সেখানে...

'সেখানে মানে ?'

দুর্গা অস্বস্তি বোধ করল।

নয়নমণি বলল, 'তুমি মোটর চালিয়ে টাকা রোজগার করতে পারবে। আর আমি যখন আসব...।'

'তখন কি আর হবে তুমি—লখনউ-এর বাইজী।'

দুর্গার মনের ক্ষুদ্রতা ও বিদ্বেষ এখনো দূর হয়নি। নয়নমণি তা নিয়ে একটুও চিন্তিত হল না, বলল, 'কি হই, তা পরে দেখে নিয়ো।'

দুর্গা বলল, 'আমার কেমন যেন ভয় হয়। এখান থেকে একা একা যাবে। সেখানে একলা থাকবে। কিছু একটা হলে কি করবে ?'

নয়নমণি নিজেও জানে না। কিন্তু একলা থাকলেই বা কি, কেউ তো ওকে খেয়ে ফেলবে না। এবার একটু শক্ত হয়ে নয়নমণি বলল, 'কেন এসব ভয় করছো ?' দিনকাল বদলাচ্ছে, নতুন দিন শুরু হয়েছে। আমরা যদি পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি, কেন তা মন্দ হতে যাবে ? মনটাকে ছোট করলে মন ছোটো হয়ে যায়। একটু শক্ত করো মনকে।'

নয়নমণির কণ্ঠস্বরে যেন একটা কঠোর আদেশের সুর। দুর্গার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু রাগ করে কি হবে ? নয়নমণি দিনকে দিন স্বাধীনচেতা হয়ে উঠছে। মেমসায়েব ওকে এক নতুন আদর্শে উন্নীত করে গেছেন। দুর্গা কিছু আর না বলে কাত হয়ে শুয়ে থাকল, চাঁদটা দেখতেও ওর যেন সাহস হল না।

নয়নমণির চোখে ঘুম নেই। সে পান্নুর সন্ধানে উঠে গেল। কিন্তু পান্নু কোথাও তো নেই। নয়নমণির ইচ্ছা হল চীৎকার করে পান্নুকে ডাকে, কিন্তু তা আর করল না। ক্রমে ক্রমে সে দেখতে পেল অদূরে একটা বেঞ্চে বসে পান্নু ও গিয়াসুদ্দীন কি যেন গভীর আলাপে মগ্ন। নয়নমণি সেখান থেকে ফিরে এল।

তারপর খোঁজ করল লছমীর। লছমী ইসমাইলের কাছে শুয়ে আছে। খুব ক্লান্ত।

কেবল বরুয়ার স্ত্রী এখনো জেগে। বারান্দার এক কোণায় শিশুটিকে শুইয়ে এক-মনে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

নয়নমণি কাছে গিয়ে বলল, 'চাঁদটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—না ?'

বরুয়ার স্ত্রী বললেন, 'এসো, এই বারান্দাতেই বোসো।'

নয়নমণি বসল, বরুয়ার স্ত্রীও বসলেন তার কাছে। তারপর বললেন, 'সেদিন ছিল বিহু—জানো তো? বাড়ির জানলা দিয়ে বিহু নাচ দেখছিলাম। তারপর দেখি অতর্কিতে লোকেরা বিহুর নাচগান থামিয়ে, অশথ গাছটার দিকে ছুটে চলে গেল। তার খানিকক্ষণ পরেই কৃষ্ণপক্ষের শুরু, চাঁদ ছিল না আকাশে। আজ অনেকদিন পরে যেন শুক্ল পক্ষের চাঁদ দেখলাম। দেখে মন খারাপ লাগছে। একটা গান গাও—জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন যখন, তখন যে গানটা গেয়েছিলে।'

এবার নয়নমণি অনুরোধ রক্ষা না করে পারল না। খোলা গলায় সে নিজের মনে গাইতে লাগল, 'সারে জঁাহাসে আচ্ছা হিন্দোস্তঁা হামারা।' গানটা শুনতে শুনতে বরুয়াকে মনে পড়ল ওঁর স্ত্রীর। বরুয়াও এই গানটা গাইতেন, অবশ্য এমন ভালোভাবে নয়। গানের দ্রুত ও বিলম্বিত লয় যতই কানে আসতে লাগল, ততই বরুয়ার স্মৃতিতে তাঁর মন যেন মধুর হয়ে উঠল। বড়ো করুণ বড়ো মধুর এই স্মৃতি। অকারণে মৃত্যু একটি যে পবিত্র আত্মা ছিনেয়ে নিয়ে গেছে—তারই স্মারণিকী। অন্যদের চোখের আড়ালে বরুয়ার স্ত্রী তাঁর চোখের জল মুছে ফেললেন।

ধীরে ধীরে গানের সুর গভীর অনুরণন তুলল সকল ধর্মঘটীর অন্তরে। তারা বুঝতে পারছে না যেন কোথায় তারা শুয়ে আছে—মাটির উপরে, না নিজেদের ঘরে। চোখ বুজে সকলেই গান শুনতে লাগল। এমন কি পান্নু ও গিয়াসুদ্দীনও তাদের প্রেমালাপ বন্ধ করে শুনতে লাগল নয়নমণির সুরেলা কণ্ঠের সংগীত।

প্রধান আর কিছুতেই বসে থাকতে পারলেন না। মালা সিং-এর পাশ থেকে উঠে এসে তিনি একেবারে নয়নমণির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গান শেষ হলে পর প্রধান ডাকলেন, 'নয়নমণি!'

'আমি শুনেছি তুই নাকি গান শিখতে যাবি লখনউ। যা তুই, আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভালো হবে। যা।'

নয়নমণি অভিভূত হয়ে পড়ল। প্রধানের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ আমি চাই না।'

প্রধান বলল, 'কেবল দেখিস, সামলে চলিস।'

কথা শেষ হবার পর প্রধান ফিরে গেল মালা সিং-এর সঙ্গে পেশেন্স দেখতে। হঠাৎ বরুয়ার স্ত্রীর মনে পড়ল ওর নিজের বাবার কথা। নয়নমণিকে বলল, 'কাল বাবার একটা চিঠি পেয়েছি। শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো যাচ্ছে না। আবার নাকি আন্দোলন হবার সম্ভাবনা। আবার হয়তো জেল যেতে হবে—কে জানে। লিখেছেন, এবারকার আন্দোলন হবে খুবই জোরদার আন্দোলন।'

বৃটিশ ভারতের পটভূমিতে সর্বকালের সর্বদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক দলিল স্বরূপ এই অসমীয়া উপন্যাস—'প্রতিপদ'। কুলি মজুরদের জাত-পাত নেই, ধর্ম-অধর্ম বলেও কিছু নেই। ডিম্বেশ্বর হিন্দু থেকে মুসলমান হ'য়ে যায়, কিন্তু এমন এক ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া নেই এই সমাজটাতে। নতুন গিয়াসুদ্দীন একইভাবে মানুষের শ্রদ্ধা পায়, তার নেতৃত্ব শেষদিনটি অবধি সবাই মেনেও নেয়। এই নেতৃত্বের আন্দোলনের শেষ মৃত্যু, অত্যাচার, দারিদ্র্য জেনেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৃথিবীর এই কল্যাণময়ী শ্রেণীটা এগিয়ে চলে। ঐশ্বর্য বলতে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি আর প্রেম। আর কিছু না।

একটি রিফাইনারীর শ্রমিকদের নিয়ে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের এক মহান উপন্যাস এই 'প্রতিপদ'। খ্যাতনামা অনুবাদক ক্ষিতীশ রায় মূল থেকে উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন শ্রীভট্টাচার্যের ষ্টাইল এবং মনন [illegible] মনে রেখে।



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া